ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে প্রত্যক্ষণ ও অনুমান : একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

জি. এম. তারিকুল ইসলাম

পিএইচ.ডি. নিবন্ধন নং- ৪৯/২০১৯-২০২০

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০

সংস্কৃত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০

জুন ২০২২

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. অসীম সরকার

(তত্ত্বাবধায়ক)

অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০

ড.এম. মতিউর রহমান

(যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক)

অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ***ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে প্রত্যক্ষণ ও অনুমান : একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণ*** শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। এই অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত যথাযথভাবে উল্লিখিত হয়েছে। আমি এই গবেষণাকর্মটি ইতঃপূর্বে কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য পেশ করিনি। এটি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের জন্য পেশ করলাম।

(জি. এম. তারিকুল ইসলাম)
পিএইচ.ডি. গবেষক
নিবন্ধন নং- ৪৯/২০১৯ - ২০২০
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

জনাব জি. এম. তারিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১১০০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত *ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে প্রত্যক্ষণ ও অনুমান : একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণ* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি :

১. অভিসন্দর্ভটি আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনা অনুযায়ী লিখিত ;

২. এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণা কর্ম ;

৩. অভিসন্দর্ভটি তথ্যবহুল, বিশ্লেষণাত্মক, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমাদের জানা মতে, ইতোঃপূর্বে উল্লিখিত শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের জন্য কোনো গবেষণা অভিসন্দর্ভ লিখিত হয়নি।

৪. গবেষক অত্র অভিসন্দর্ভে যেসব গ্রন্থ, জার্নাল বা পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছেন তা প্রতিটি অধ্যায় শেষে তথ্যনির্দেশে উল্লেখ করেছেন।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য মানসম্পন্ন বলে আমরা মনে করি। এই অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আমরা আদ্যন্ত দেখেছি। পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশে আমরা গবেষণাকর্মটি পরীক্ষকদের বিবেচনার্থে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. অসীম সরকার)
অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
তত্ত্বাবধায়ক

(ড. এম. মতিউর রহমান)
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমার তত্ত্বাবধায়কদ্বয় যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. অসীম সরকার এবং দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. এম. মতিউর রহমানের নিকট আমি একান্তভাবে কৃতজ্ঞ এবং ঋণী। তাঁদের পরামর্শ, দিকনির্দেশনা এবং আন্তরিক সহযোগিতার ফলে আমার পক্ষে এই অভিসন্দর্ভ রচনা করা সম্ভব হয়েছে। আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বধায়কদ্বয় ব্যতীত এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে যাঁরা আমাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ, দিকনির্দেশনা এবং সহযোগিতা প্রদান করেছেন আমি তাঁদের নিকটও বিশেষভাবে ঋণী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামটি তিন বছর মেয়াদি। অভিসন্দর্ভ রচনা করে জমাদানের পূর্বে আমাকে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সামনে দুটি সেমিনার প্রদান করতে হয়েছে। বিভাগীয় চেয়ারম্যান, বিভাগীয় সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, কর্মকর্তা, কর্মচারি আমাকে এ কাজে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমি সংস্কৃত বিভাগের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান, সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারির প্রতি বিনম্র চিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে আমার সহধর্মিণী মোছা: জান্নাতুন ফেরদৌস নিজ কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব পালন, সাংসারিক ব্যস্ততা এবং সন্তানদের দেখাশুনা করার কাজ অক্লান্তভাবে সামলিয়ে আমাকে বিশেষভাবে সুযোগ করে দিয়েছেন। এই অভিসন্দর্ভটি রচনার জন্য তার সহযোগিতা, উৎসাহ বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তার প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা।

এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহকারী অধ্যাপক, দর্শন, জনাব মো. রফিকুল ইসলাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের চেয়ারমান অধ্যাপক ড. মো. তৌহিদুল হাসান, তেজগাঁও কলেজের দর্শন বিভাগের প্রভাষক সজীব কুমার বসু, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিষয়ের প্রভাষক আশিক বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক টুম্পা রাণী দে বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

পিএইচ.ডি. কোর্সে গবেষণা করার সুযোগ প্রদান করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এবং আমার বর্তমান কর্মস্থল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত বিভাগ সেমিনার, দর্শন বিভাগের দেবস্মৃতি পাঠাগার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় সেমিনার কর্তৃপক্ষের কাছে।

পরিশেষে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সযত্নে কম্পোজ করার জন্য মো. সাইফুল ইসলাম এবং যত্নসহকারে প্রুফ দেখার কাজে সহযোগিতা করার জন্য সুমন বিশ্বাসকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জি. এম. তারিকুল ইসলাম
পিএইচ.ডি. গবেষক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীতে মানুষের আগমন ঘটার পর থেকেই মানুষ প্রতিনিয়ত অজানা-অচেনা বিষয়কে অতিক্রম করে চলছে। আর এই ধারাবাহিকতা আজও চলমান। মানুষের অনুসন্ধিৎসু ও জিজ্ঞাসু কর্মকাণ্ড তাকে পৃথিবীর বুকে অনন্য হিসেবে পরিচিত করেছে। মূলত মানুষের চিন্তা এবং জ্ঞান অন্বেষা তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করেছে। মানুষ তার নিজস্ব চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীতে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং অর্থনীতিতে মানুষ আজ ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে। আর এর পেছনে রয়েছে মানুষের জ্ঞানগত অর্জিত বিষয়কে কাজে লাগানো। মানুষ তার গবেষণালব্ধ অর্জিত জ্ঞান দিয়েই আজকের অবস্থানে এসেছে। মানুষ তার প্রয়োজনে পড়ালেখার আবিষ্কার করেছে। কালের পরিক্রমায় এই পড়ালেখা একাডেমিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পৃথিবীতে একাডেমিক পড়ালেখার সূত্রপাত ঘটে গ্রিস দেশে। গ্রিস দেশেই বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক সক্রেটিসের খ্যাতিমান শিষ্য আরেক প্রখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর 'একাডেমি' এবং প্লেটোর শিষ্য সাঁড়া জাগানো দার্শনিক এরিস্টটলের 'লাইসিয়াম' নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে মূলত শিক্ষা বলতে দর্শনচর্চা করা হতো। জ্ঞানোর্জনের একাডেমিক স্পৃহা আমরা সেখানে প্রথম দেখতে পাই। এরপর কালক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দর্শনচর্চার প্রসার ঘটতে থাকে যা আজ পর্যন্ত চলমান রয়েছে। তাই বলা যায়, শিক্ষার সূচনালগ্নেই দর্শনশাস্ত্রের মূল বা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিলো জ্ঞানের অন্বেষণ বা জ্ঞানচর্চা। কেননা অন্যান্য সকল বিষয়ের ভিত্তিমূলে রয়েছে মানুষের জ্ঞানগত চিন্তার ফসল। জ্ঞানের অন্বেষণ, অনুশীলন এবং এর প্রয়োগ ব্যতীত মানবজীবন স্থবির এবং নিরর্থক হয়ে পড়বে। তাই মানবজীবনে জ্ঞানচর্চার কোনো বিকল্প নেই। আর সেজন্য মানুষকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এই জ্ঞানের পথ ধরে অগ্রসর হতে হয়। আর পৃথিবীতে দর্শনই একমাত্র মৌলিক বিষয় যেখানে এই জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানের স্বরূপ, সংজ্ঞা, প্রকৃতি, প্রকারভেদ, জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া, প্রকৃত জ্ঞান আদৌ অর্জন করা সম্ভব কি না, জ্ঞানের উৎসসমূহই বা কী? জ্ঞানের প্রয়োগ সম্ভব কি না প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে দর্শনশাস্ত্রে এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করতে গিয়ে 'জ্ঞানবিদ্যা' নামক আলাদা শাখার জন্ম হয়েছে। এই জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা যেমন প্রাচ্য দর্শনেও দেখা যায়, তেমনি পাশ্চাত্য দর্শনেও পরিলক্ষিত হয়, তবে প্রাচ্য দর্শনের বিশেষ করে ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার বিস্তৃতি এবং ব্যাপকতা উল্লেখ করার মতো। এই ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে জীবন ও জগৎকেন্দ্রিক উপস্থাপিত সমস্যাসমূহকে কেন্দ্র করে উদ্ভব

ঘটেছে এই জ্ঞানতত্ত্বের। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব মূলত জীবনকেন্দ্রিক। এখানে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় দর্শনের আস্তিক এবং নাস্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত নয়টি স্কুলের প্রায় সকল দার্শনিক জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে কথা বলেছেন। তাই ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের সার্বিক দিক বিশ্লেষণপূর্বক একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের ওপর গবেষণা অতীব জরুরি। তবে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের পরিসর বেশ ব্যাপক যা একটি অভিসন্দর্ভ বা গবেষণা কর্মে দেখানো সম্ভব নয়। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি বা উৎসসমূহ। ভারতীয় জ্ঞানের উৎসের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উৎসসমূহ হল : প্রত্যক্ষণ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। তবে এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক উৎস হিসেবে স্বীকৃত প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান। এই প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানকে ভারতীয় দর্শনের প্রায় সকল সম্প্রদায় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে চার্বাক সম্প্রদায় এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম তাঁরা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষণকে প্রথম এবং একমাত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই ভারতীয় জ্ঞানের উৎসের আলোচনায় আমরা দেখি যে- অন্যান্য যে সকল উৎস বা প্রমাণ রয়েছে তা কোনো না কোনোভাবে প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। তাই আলোচ্য অভিসন্দর্ভে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানের বিচারমূলক বিশ্লেষণ নিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা *ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে প্রত্যক্ষণ ও অনুমান : একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণ* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি বর্তমানকালের প্রেক্ষাপটে রাখতে পারে কার্যকরী এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা। তাছাড়া এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে কোনো ধরনের সুচিন্তিত প্রস্তাবনা সমৃদ্ধ মৌলিক কোনো গবেষণা কাজ হয়নি। উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে বর্তমান অভিসন্দর্ভটি রচনা করা হয়েছে। *ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান : একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণ* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি মোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা বিন্যস্ত করা হয়েছে। ভূমিকাতে অভিসন্দর্ভ রচনার মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

'ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে মানুষের জীবনে জ্ঞান ও চিন্তার প্রয়োজনীয়তার লক্ষ্যে জ্ঞান ও জ্ঞানতত্ত্বের বিস্তারিত বিশ্লেষণ অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞানের উপাদান, জ্ঞান প্রসঙ্গে ধারণা, জ্ঞানের সাথে জানার সম্পর্ক, জ্ঞানের সাথে বিশ্বাসের সম্পর্ক, জ্ঞানতত্ত্ব কী, জ্ঞানের উৎস ও পদ্ধতি, জ্ঞানের উৎস হিসেবে বুদ্ধিবাদ, জ্ঞানের উৎস হিসেবে অভিজ্ঞতাবাদ, জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিচারবাদ, জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বজ্ঞাবাদ, জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রাধিকারবাদ, জ্ঞানের সমস্যা হিসেবে সংশয়বাদ, জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমস্যা হিসেবে অজ্ঞেয়বাদ, জ্ঞানের সম্ভাব্যতা প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, 'ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব' শীর্ষক আলোচনায় জ্ঞান, ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানের স্বরূপ, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন উৎস : প্রত্যক্ষণ, অনুমান, অনুমানের প্রকারভেদ, শব্দ বা আপ্তবাক্য, লৌকিক ও বৈদিক শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি প্রভৃতি বিষয় সহজ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

'ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে প্রত্যক্ষণ' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে প্রত্যক্ষণ, সাংখ্য দর্শনে প্রত্যক্ষণ, সাংখ্যমতে প্রত্যক্ষণের শ্রেণিবিভাগ, যোগ দর্শনে প্রত্যক্ষণ, ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষণ, ন্যায়মতে প্রত্যক্ষণের শ্রেণিবিভাগ : লৌকিক প্রত্যক্ষণ, বাহ্য ও আন্তর প্রত্যক্ষণ, নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ, সবিকল্প প্রত্যক্ষণ, প্রত্যভিজ্ঞা, অলৌকিক প্রত্যক্ষণ, সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষণ, জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষণ, যোগজ প্রত্যক্ষণ, বৈশেষিক দর্শনে প্রত্যক্ষণ, মীমাংসা দর্শনে প্রত্যক্ষণ এবং এর অভ্যন্তরে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ, সবিকল্প প্রত্যক্ষণ, বেদান্ত দর্শনে প্রত্যক্ষণ এবং এর অভ্যন্তরে নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষণ, ইন্দ্রিয়জ এবং অ-ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষণ, প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে রামানুজের মত, চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষণ, জৈন দর্শনে প্রত্যক্ষণ, বৌদ্ধ দর্শনে প্রত্যক্ষণ এবং এর অভ্যন্তরেও প্রত্যক্ষণের শ্রেণিবিভাগ হিসেবে ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ, মনোবিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ, আত্মসংবেদন প্রত্যক্ষণ, যোগীজ্ঞান প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং বিচারমূলকভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে, 'ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে অনুমান', শীর্ষক আলোচনায় অনুমান, সাংখ্য দর্শনে অনুমান, যোগ দর্শনে অনুমান, ন্যায় দর্শনে অনুমান, ন্যায়মতে অনুমানের প্রকারভেদ এবং এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে স্বার্থানুমান, পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান, কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বৈশেষিক দর্শনের অনুমানেও স্বার্থানুমান, পরার্থানুমান, পূর্ববৎ অনুমান, শেষবৎ অনুমান, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান, কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান, মীমাংসা দর্শনের অনুমানে প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ এবং সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান, বেদান্ত দর্শনে শংকরের চিন্তায় অনুমান, চার্বাক দর্শনে অনুমান, জৈন দর্শনে ও বৌদ্ধ দর্শনে অনুমান ও এর প্রকারভেদ : স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং স্বচ্ছভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ' শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে, প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের স্বরূপ ব্যাখ্যাপূর্বক এদের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক বিষয়সমূহের মধ্যে তুলনামূলক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরে এদের মধ্যে সমন্বয় ও প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বকে একটি বিচারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়ে, 'অনুমান ও প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মতের তুলনামূলক আলোচনা' শীর্ষক আলোচনায় জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মতের সাদৃশ্যগত ও বৈসাদৃশ্যগত বিষয়সমূহের মধ্যে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখানোর পাশাপাশি এ অধ্যায়ে ভারতীয় সমকালীন চিন্তাবিদ বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতের সাথে পাশ্চাত্য দার্শনিক জন লক, বিশপ বার্কলি, ডেভিড হিউম, উইলিয়াম জেমসের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার একটি বিশ্লেষণধর্মী তুলনামূলক সমীক্ষা দেখানো হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে, 'সমকালীন প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের প্রাসঙ্গিতা ও উপযোগিতা' শীর্ষক আলোচনায় বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আর্থসামাজিক দিক বিশ্লেষণ করে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা নির্ণয় করে মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ওপর তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অষ্টম অর্থাৎ সর্বশেষ অধ্যায়, উপসংহারে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহের সামগ্রিক আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত নির্যাস, অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন সমালোচনা ও মন্তব্য তুলে ধরে নিজস্ব চিন্তা ও মতামত যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শন ও জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন রচনাবলি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক আলোচনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান অভিসন্দর্ভে ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক এবং সংশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া বিচারমূলক, সমালোচনামূলক ও সমন্বয়মূলক পদ্ধতিকেও এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর এই ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার এবং বিবেচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনার ক্ষেত্রে মুখ্য ও গৌণ গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নের ভিত্তিতে বিষয়বস্তুর নির্যাস বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে কোনো কোনো অধ্যায়ের আলোচনার পরিধি ক্ষেত্রবিশেষ বিস্তৃত হয়েছে, আবার কোনো কোনো অধ্যায়ের আলোচনা সংক্ষিপ্ত হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রতিটি অধ্যায় শেষে তথ্যনির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সর্বশেষে গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

ঘোষণাপত্র ..... ক

প্রত্যয়ণপত্র ..... খ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার..... গ

সারসংক্ষেপ..... ঘ – ছ

প্রথম অধ্যায়

জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য..... ১ – ৭১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব..... ৭২ – ৯৭

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে প্রত্যক্ষণ..... ৯৮ – ১৪৪

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে অনুমান..... ১৪৫ – ১৭৮

পঞ্চম অধ্যায়

প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ..... ১৭৯ – ১৯৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনুমান ও প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মতের তুলনামূলক আলোচনা..... ১৯৪ – ২১৯

সপ্তম অধ্যায়

সমকালীন প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা.....২২০ – ২২৭

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার..... ২২৮ – ২৩৭

গ্রন্থপঞ্জি ..... ২৩৮ - ২৪২

প্রথম অধ্যায়

জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

প্রথম অধ্যায়
জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

মানুষের মুক্ত, স্বাধীন ও যৌক্তিক চিন্তাকে আমরা দর্শন বলে থাকি। মানবমনের অন্যতম কৌতূহল হলো জগৎ ও জীবনকে জানতে চাওয়া। আর এই জানতে চাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হলো যৌক্তিক পদ্ধতিতে জ্ঞান ও চিন্তার অন্বেষণ। জ্ঞানের বিষয়টি তাই মানবজীবনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। জীবন ও জগতের মৌলিক ও জটিল সমস্যাসমূহকে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য করে তোলাই জ্ঞানের কাজ। দর্শনের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই যে, দর্শন সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত জগদ্‌বিখ্যাত দার্শনিকগণ তাঁদের দার্শনিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অগ্রাধিকার দিয়েছেন সত্যানুসন্ধানকে। অর্থাৎ সত্য কী? সত্য অন্বেষণের পথ ও পদ্ধতি কী? আর এই সত্যোপলব্ধির অপর নাম হচ্ছে জ্ঞান। এই জ্ঞানের আলোচনা ব্যতীত দর্শন আলোচনা প্রায় অসম্ভব। তাই বলা যায় জ্ঞানের আলোচনা দর্শনকে পূর্ণতা দান করেছে। ফলে দর্শনের এক অনিবার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে জ্ঞানের আলোচনা। বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব উপভোগ করছে তার জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষমতার কারণে। পৃথিবীতে বিরাজমান প্রাণিকুলের মধ্যে মানুষ নিজেকে অনন্য সাধারণ বা শ্রেষ্ঠ হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে তার চিন্তার কারণে। পৃথিবীতে আর কোনো প্রাণী মানুষের মতো করে চিন্তা করতে পারে না। আর এই চিন্তার অপর নামই হচ্ছে জ্ঞান। মানুষ তার চিন্তাশক্তির বলে যখন পড়ালেখার আবিষ্কার করে সেই থেকে সে তার চিন্তার স্বাক্ষর পৃথিবীর বুকে রাখতে শুরু করে। চিন্তাজগতে মানুষের কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কিত পথের অনুসন্ধানকে দর্শন নামে অভিহিত করা হয়। দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম কাজ হলো জ্ঞানানুসন্ধান। মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের মূলে কাজ করে এই জ্ঞান। এই জ্ঞানের সৌধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি, প্রগতি, সার্থকতা এবং সফলতা। জ্ঞানের সুফল হিসেবে মানুষ আজ বিশ্বের বুকে তার শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে যা দৈহিকভাবে বহুগুণ শক্তিশালী অন্যকোনো প্রাণী পারেনি। তাই জ্ঞান এবং জ্ঞানচর্চার ইতিহাসকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে মানুষের আগ্রহ এবং কৌতূহল। আর দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞান, জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস, উৎস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে।

চিন্তাসম্পন্ন জীব বলে মানুষের পক্ষে প্রাণীর মতো জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। সে সুন্দর করে বাঁচতে গিয়ে সম্মুখীন হয় নানা সমস্যা এবং প্রশ্নের। আর এসব সমস্যা এবং প্রশ্নের সমাধানের জন্য সে জ্ঞানের পথে পা বাড়ায়।

দর্শনশাস্ত্রে জীবন জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটনে সম্মুখপানে ছুটে চলে। সমগ্র জীবনবোধের পরিপূর্ণ রূপায়ণে জ্ঞানের পরিপক্ব আলোচনা আবশ্যক। তাই মানবসভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি বিভিন্ন সভ্যতার বিকাশ এবং উৎকর্ষ সাধনে মানুষ তার সাধনালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে গেছে। সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল প্রমুখ দার্শনিক জ্ঞানের স্বরূপ এবং উৎস সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, "প্রতীচ্যের জ্ঞানতাপস সক্রেটিস ও তাঁর সুযোগ্য ভাবশিষ্য প্লেটো থেকে শুরু করে সমকালীন যুগের প্রায় সব দার্শনিকই 'ফিলসফি' অর্থে এই জ্ঞানপ্রীতি বা জ্ঞানানুরাগকেই নির্দেশ করেছেন।"[১]

দর্শনশাস্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ এবং তার জ্ঞান অন্বেষণ প্রচেষ্টা যা দ্বারা সে সমাজ, রাষ্ট্র, জাতীয় এবং বৈশ্বিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। তবে মনুষ্যসমাজে দার্শনিক, নীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক প্রমুখ তাঁদের জ্ঞান সাধনার প্রচেষ্টার দ্বারা জীবন এবং জগৎকেন্দ্রিক বিভিন্ন সমস্যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে প্রকৃত দার্শনিকরা দর্শনের জ্ঞানচর্চা এবং মুক্তবুদ্ধির আলোকে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের সন্ধান দিতে চেষ্টা করে থাকেন। দর্শনের ছাত্র হিসেবে আমরা জানি, জগৎ-জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন, সংশয়-সন্দেহ প্রকাশ, অনুমান, অনুসন্ধান এবং যাচাইকরণ প্রভৃতি বিষয় জ্ঞানানুসন্ধানের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

আমাদের নতুন চিন্তার পথকে উন্মোচিত করার ক্ষেত্রে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে নিরপেক্ষ, তীক্ষ্ণ ও উদ্ভাবনী প্রশ্ন, বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক সক্রেটিস প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বলেছিলেন, প্রশ্নহীন জীবন অর্থহীন, প্রশ্নহীন জীবনের কোনো আবশ্যিকতা নেই।[২]

সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে মানুষকে তার দক্ষতা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে হয়েছে। আর এই দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন এবং এর প্রয়োগ করতে গিয়ে মানুষকে জ্ঞানচর্চা করতে হয়েছে। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে যোগ্য, দক্ষ, যুক্তিবাদী এবং মানবিকবোধ সম্পন্ন হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত মৌলিক জিজ্ঞাসা এবং অনুসন্ধান নিয়ে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে দর্শনের যাত্রা শুরু হলেও মূলত এর পেছনে কাজ করে তৎকালীন দার্শনিকগণের জ্ঞান পিপাসা। আর দর্শনই হলো জ্ঞান অন্বেষণের পথ। আর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, সব জ্ঞানের ভিত্তি এবং যাত্রাবিন্দু হচ্ছে দর্শনশাস্ত্র। এই দর্শনশাস্ত্রে আমরা সঠিক এবং অর্থপূর্ণ চিন্তার সমন্বয় দেখতে পাই। মানুষ স্বাভাবিকভাবে সবকিছু জানতে চায়। এই জানার এবং বোঝার বিষয়টি মানবজাতির অভ্যন্তরে বিদ্যমান একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যুগপরিক্রমায় মানবজাতি এই জানার পথ ধরে হেটেছে। এই

জানার আকাঙ্ক্ষা থেকে মানুষের জ্ঞানচর্চা শুরু। জ্ঞানচর্চার মূলে রয়েছে মানুষের জানার আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করে তাকে সুন্দর জীবনের উদ্দেশ্যে ধাবিত করা। যেমনটি বলেছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেল। তিনি বলেছিলেন, "The good life is one inspired by love and guided by knowledge."[৩] অর্থাৎ রাসেল জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাতে বলেছেন। তাই মানুষের জ্ঞানের জগৎ স্বাভাবিকভাবেই কালপরিক্রমায় সম্প্রসারিত হয়ে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সাথে যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ তার অর্জিত জ্ঞানকে মানবকল্যাণের পথে ব্যবহার করা শুরু করেছে। তাই এখন আর বলা যায় না যে শুধু জ্ঞানচর্চার জন্য জ্ঞান; বরং বলতে হয় মানবকল্যাণের জন্য জ্ঞান, মানুষের জন্য জ্ঞান। তাই স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে জ্ঞান কী, জ্ঞানের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাস, উৎস প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এবং পর্যালোচনা। তাই এখন পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপে এগুলোর আলোচনা, পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো :

জ্ঞান ও জ্ঞানের উপাদান

জ্ঞানের বিষয়টি মানবজীবনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এটি আলোচনার মাধ্যম হলো দর্শনশাস্ত্র। জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে সমাজের অভ্যন্তরে মানুষের পরিশ্রম এবং চিন্তার ফসল হিসেবে। খুবই সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা চলে জ্ঞান এখানে সামাজিক বিষয় হিসেবে গণ্য। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে যে সকল সমস্যা পরিলক্ষিত হতো তার পর্যবেক্ষণ থেকে ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত সমাধানলব্ধ তত্ত্বকে জ্ঞান হিসেবে অভিহিত করা হতো।[৪] সামাজিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করে পরবর্তীকালে তা শুদ্ধরূপ পরিগ্রহ করে আরও উচ্চতর অনুশীলনের মাধ্যমে।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা যায়, মানবমস্তিষ্ক মূলত ক্রিয়া করে বহিঃপ্রভাবজনিত কারণে। আর এর ফলে উদ্রেক ঘটে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি, বিচার-বিশ্লেষণ, এবং যৌক্তিক প্রয়োগগত দিকের।

এখন জ্ঞান কী? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি, মানবমনের এক প্রকার সুশৃঙ্খল ধারণা হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞান বাস্তব জগতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ তৈরি করে থাকে। জ্ঞান হলো বিষয়ের উপলব্ধি বা প্রকাশ। আর জ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশ করা। অর্থাৎ জ্ঞান তার সম্মুখের যাবতীয় বস্তুকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে। এক কথায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে যে সম্বন্ধ আমরা দেখতে পাই তাকে জ্ঞান বলে। জ্ঞান কী, তা সংক্ষেপে খুব সুন্দর এবং স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে ভি. আফানসিবের *Marxist Philosophy* গ্রন্থে।

তিনি বলেন,

> "*Knowledge* is the active, purposive reflection of the objective world and its laws in man's mind. The source of knowledge is the outside world around man. It acts on man and arouses in him relevant sensations, ideas and concepts."[৫]

মানুষের জ্ঞান হতে হলে বস্তু প্রয়োজন। কেননা বস্তু এবং ব্যক্তির সম্মিলনে জ্ঞান অর্জিত হয়। ব্যক্তি যখন বস্তুর জ্ঞান অর্জন করেন তখন তিনি জ্ঞাতা আর তিনি যে বস্তুর জ্ঞান পেয়ে থাকেন সেই বস্তুই জ্ঞেয় বস্তু। সুতরাং আমরা সহজ কথায় বলতে পারি জ্ঞান হলো জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যকার একপ্রকার সম্বন্ধ বিশেষ। এখানে জ্ঞান এবং বস্তুর মাঝে কোনো প্রকার দূরত্ব থাকে না, এদের যোগাযোগ হয় সরাসরি।[৬]

জ্ঞান শব্দটির বৃহৎ এবং সংকীর্ণ অর্থের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। ভারতীয় দার্শনিকগণ জ্ঞান শব্দটি অত্যন্ত বৃহৎ অর্থে গ্রহণ করলেও পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞান শব্দটি সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।[৭] জ্ঞান সম্পর্কে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জী প্রণীত *The Nyaya Theory of Knowledge* গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে এভাবে "Knowledge, as an attribute of the self, is always directed to objects. It always refers beyond itself, i.e. to objects outside of and different from itself. Knowledge is never self-manifested."[৮]

ভারতীয় দর্শনের ন্যায় দার্শনিকগণ মনে করেন, যা বিষয়কে প্রকাশ করে, যার আত্ম-সমবেত বিশেষ গুণ রয়েছে। বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক দিক রয়েছে তাই জ্ঞান হিসেবে পরিচিত। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধারণত চারটি উপাদান পরিলক্ষিত হয়। যথা : ১) মানবমনে অবস্থিত এক প্রকার সুশৃঙ্খল ধারণা, ২) মানবমনের বাইরে অবস্থিত বস্তুসমূহ, ৩) মানবমনের ধারণা ও বস্তুর মধ্যকার সঙ্গতি এবং ৪) মানবমনের মধ্যে অবস্থিত সেই সঙ্গতি সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস।

উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করা যায়, যেমন কোনো ব্যক্তি যদি বলে একটা টেবিল সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে, তাহলে বুঝতে হবে ঐ ব্যক্তির মনে টেবিলটির গঠন, আকৃতি, ওজন, রং ইত্যাদি সম্পর্কে কতকগুলো ধারণা আছে। আর অনেকগুলো গুণবিশিষ্ট ঐ বস্তুটি (যাকে আমরা টেবিল বলছি) বাস্তবে এই জগতে অস্তিত্বশীল আছে। তাছাড়া বাস্তবে অস্তিত্বশীল টেবিল নামক বস্তুটির গুণগুলোর এবং ঐ ব্যক্তির মনোজগতে বিরাজমান ধারণাগুলোর মধ্যে একটি সঙ্গতি রয়েছে।

শুধু তাই নয়, ধারণা ও বস্তুর মধ্যকার সঙ্গতির সত্যতা সম্পর্কে ঐ ব্যক্তির মনের মধ্যে একটি বিশ্বাস আছে। উল্লিখিত উপাদানগুলোর মধ্যে যে- কোনো একটি যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে জ্ঞান সম্ভব হবে না।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, জ্ঞান হলো কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি কিংবা প্রকাশ। জ্ঞানের উদ্দেশ্য এবং কাজ হলো কোনো বিষয় আমাদের সামনে প্রকাশ করা, স্পষ্ট করা। ঠিক আলো যেমন তার চারপাশের সকল অজ্ঞতা দূর করে আমাদের সম্মুখের যাবতীয় বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করে থাকে। তবে বর্তমান সময়ে জ্ঞান বলতে কোনো বিষয় সম্পর্কে তত্ত্বগত এবং প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক অনুশীলনকে বোঝায়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবদুল মতীনের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন,"দর্শনে আমরা সন্ধান করি জ্ঞান, এবং যে কোনো জ্ঞানানুসন্ধানের থাকে বা থাকতে পারে দুটি লক্ষ্য : কোনো সুনির্ধারিত বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান এবং মানব কল্যাণের জন্য সে-জ্ঞানের প্রয়োগ। লক্ষ্যটা যখন কেবল জ্ঞানের জন্য জ্ঞান তখন সে সাধনা নিছক তত্ত্বীয় (Theoratic); কিন্তু তার চরম লক্ষ্যটা যখন মানব কল্যাণ তখন সে সাধনা ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক (Practical)।"[৯]

জ্ঞান বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য তিনটি গুণ বা শর্ত থাকতে হবে। যথা :

(১) অবশ্যই সত্য হতে হবে,

(২) বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে এবং

(৩) সমর্থনযোগ্য হতে হবে।[১০]

জ্ঞান হতে গেলে উপর্যুক্ত শর্তাবলি পূরণ হতে হবে অন্যথায় জ্ঞান হবে না। কেননা এ তিন শর্তের সমষ্টিই হচ্ছে জ্ঞানের পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত। আরও সহজ করে বললে বলতে হয়, এ তিনটি শর্তের যখন সংযোগ ঘটে তখনই জ্ঞান হয়।

জ্ঞান প্রসঙ্গে ধারণা

আবার অন্য মত অনুযায়ী, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ধারণা হলো আবশ্যকীয় শর্ত। ধারণা ছাড়া কোনো জ্ঞান অসম্ভব। আমাদের ধারণা কোনো না কোনো শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়ে থাকে, আর জ্ঞান ব্যক্ত হয়ে থাকে বাক্যের মাধ্যমে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করা যায়, আমাদের যদি "মানুষ" এবং "মরণশীল" সম্পর্কে কোনো ধরনের ধারণা নাই থাকে তবে "মানুষ যে মরণশীল" এই জ্ঞান পাওয়া অসম্ভব হবে। এখানে "মানুষ" শব্দটি মানুষ সম্পর্কে এবং "মরণশীল" শব্দটি "মরণশীলতা" সম্পর্কে আমাদের ধারণা প্রদান করে। আর এই দুটি শব্দ সংযোজকের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে "মানুষ হয়

মরণশীল" বাক্যটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমাদের জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে থাকে। এই ধারণাই মানুষকে যথার্থ জ্ঞান পেতে সাহায্য করে। বস্তুর যথার্থ সংজ্ঞা দেওয়ার ক্ষেত্রে ধারণার প্রয়োজন। ধারণার মাধ্যমে কোনো বিশেষ বস্তুকে আমরা অন্য বস্তু থেকে পৃথক করে থাকি। শুধু তাই নয়, ধারণার দ্বারা ধারণাকে সঠিকভাবে প্রয়োগও করা হয়ে থাকে।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ধারণা সম্পর্কে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম। হিউম মনে করেন ইন্দ্রিয়জ এবং ধারণা থেকেই মানুষের সমস্ত জ্ঞান অর্জিত হয়। হিউমের *A Treatise of Human Nature* গ্রন্থের প্রথম পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে এবং *An Enquiry Concerning Human Understanding* গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জ্ঞানের আলোচনায় উল্লিখিত ইন্দ্রিয়জ এবং ধারণা বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়।

উল্লিখিত প্রথম গ্রন্থে হিউম প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনায় মানবমনের প্রত্যক্ষণগুলোর দুটি সুস্পষ্ট রূপ প্রদান করেছেন। এর একটি হলো ইন্দ্রিয়ছাপ এবং অন্যটি হলো ধারণা।[১১] এই ইন্দ্রিয়ছাপ এবং ধারণাকে হিউম জ্ঞানের একমাত্র উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ধারণা এবং ইন্দ্রিয়ছাপের বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, "মনে প্রথম আগত সংবেদন, অতিরাগ এবং প্রচণ্ড আবেগকে হিউম ইন্দ্রিয়ছাপ নামে অভিহিত করেন।... পরবর্তীতে ইন্দ্রিয়ছাপগুলোর অনুপস্থিতিতে সে যখন এগুলোকে নিয়ে চিন্তা করে তখন স্মৃতি বা কল্পনা দ্বারা অতীতে দেখা ইন্দ্রিয়ছাপগুলোর যে প্রতিরূপ তার মনে সৃষ্টি হয় তাই হল ধারণা। অর্থাৎ ধারণা ইন্দ্রিয়ছাপ থেকে স্মৃতির ও কল্পনার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়।"[১২] অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ছাপ হচ্ছে ধারণার পূর্ববর্তী অবস্থান। তবে ধারণা তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ছাপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হিউমের মত উল্লেখ করা যায়, "Of this impression there is a copy taken by the mind, which remains after the impression___-_; and this we call and idea."[১৩]

ইন্দ্রিয়ছাপ মানবমনে যতটুকু স্থায়ী ছাপ ফেলে তা থেকেই তৈরি হয় ধারণা। ইন্দ্রিয়ছাপই আমাদের মনে ধারণা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এদিক থেকে বিচার করলে ধারণাকে ইন্দ্রিয়ছাপের প্রতিরূপ বলতে হয়। হিউমের ভাষায়, "The one seem to be in a manner the reflexion of the other; so that all the perceptions of the mind are double, and appear both as impressions and ideas."[১৪] তবে ইন্দ্রিয়ছাপ ধারণার চেয়ে বেশি সজীব এবং শক্তিশালী। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ছাপ ধারণার তুলনায় বেশি স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল। আর ধারণার আনেকখানি নিষ্প্রভ ও অস্বচ্ছ যাতে স্পষ্টতা নেই।[১৫] তাই সার্বিক বিচারে বলা যায় সকল ধারণাই ইন্দ্রিয়ছাপের

প্রতিবিম্ব। এই আলোচনায় আমরা উৎপত্তিগত দিক থেকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে বলতে পারি ধারণা সব সময় ইন্দ্রিয়ছাপের পরে আসে। অর্থাৎ ধারণা কখনোই ইন্দ্রিয়ছাপের আগে উৎপন্ন হয় না। তাই ইন্দ্রিয়ছাপকে আমরা ধারণার কারণ হিসেবে অভিহিত করতে পারি। এ প্রসঙ্গে হিউমের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়, "…. this priority of the impressions is an equal proof, that our impressions are the causes of our ideas, not our ideas of our impressions."[১৬] এখানে ইন্দ্রিয়ছাপকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে থাকি। অন্যদিকে মানবমনে ধারণা অনুভূত হয় চিন্তায়।

তাই আমরা বলতে পারি, ধারণা এবং ইন্দ্রিয়ছাপের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। উৎপত্তিগত দিক থেকে একটির সাথে অপরটির সংযোগ পরিলক্ষিত হয়। একটি অন্যটিকে প্রভাবিত করে এবং একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই আমরা বলতে পরি ধারণা গঠন করতে গেলে ইন্দ্রিয়ছাপ লাগবে, ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়া ধারণা গঠন করা অসম্ভব ব্যাপার।

তবে হিউমের বক্তব্যের বেশকিছু সমালোচনাও পরিলক্ষিত হয়। গিলবার্ট রাইল তাঁর *The Concept of Mind* গ্রন্থে হিউমের ইন্দ্রিয়ছাপ এবং ধারণার মধ্যকার পার্থক্য স্বীকার করে নিলেও হিউম তাদের মধ্যে যে কার্যকারণ সম্পর্কের কথা বলেছেন তা তিনি স্বীকার করেননি। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর *History of Western Philosophy* গ্রন্থে হিউমের অভিমতের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে বলেছেন যে হিউমের মতবাদে অস্পষ্টতা রয়েছে। তাছাড়া হিউম ইন্দ্রিয়ছাপ এবং ধারণার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই সম্পর্ককে আবশ্যিক সম্পর্ক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে কার্যকারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই আবশ্যিকতাকে অস্বীকার করেন। ফলে এখানে আমরা হিউমের চিন্তায় স্ববিরোধিতা লক্ষ করি। আবার হিউমের মত মেনে নিলে অধিবিদ্যা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তার কোনো ইন্দ্রিয়ছাপ নেই। আমরা ইন্দ্রিয়ছাপ ছাড়া ঈশ্বরের ধারণা করে থাকি। এখানে হিউমের চিন্তা মূলত অকার্যকর।

এখন 'জানা' এবং 'বিশ্বাস করা' শব্দদ্বয়ের সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

জ্ঞানের সাথে 'জানা'র সম্পর্ক (জ্ঞান ও জানা)

'জানা' শব্দটি আমাদের সবার কাছে বেশ পরিচিত। আমরা দৈনন্দিন জীবনে শব্দটি প্রায় ব্যবহার করে থাকি। তবে এই 'জানা' শব্দটির সংজ্ঞা প্রদান করা বেশ কঠিন। দার্শনিকদের মধ্যে এই শব্দটির সংজ্ঞা এবং প্রয়োগ নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। জানা শব্দটির সংজ্ঞায়ন প্রসঙ্গে অধ্যাপক মো. অবদুর রশীদের

বক্তব্য উল্লেখযোগ্য, তিনি বলেন. " 'জানা' হল এমন এক মানসিক অবস্থা যা সত্যকে নির্দেশ করে। শব্দটিকে আমরা সেইসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকি যেসব ক্ষেত্রে 'জানা'র বিষয়বস্তুর সত্যতার ব্যাপারে আমরা নিজেদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বা অঙ্গীকারবদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকি।"[১৭]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞার বিশ্লেষণ থেকে আমরা বলতে পারি 'জানা' শব্দটির সাথে সত্যতার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান এবং সত্যতা জানার ক্ষেত্রে আবশ্যিক শর্ত হিসেবে কাজ করে। এই জানা শব্দটির দ্বারা সবসময় সদর্থক এবং অস্তিত্বশীল কোনো কিছুকে নির্দেশ করে থাকে। সমকালীন দার্শনিক আর. এম. চিজম এই 'জানা' শব্দটিকে সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ প্রতীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেন। তিনি এই জানা প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে, "আমরা কেবলমাত্র স্বউপস্থাপিত মানসিক অবস্থায় প্রাপ্ত সত্যকেই জানতে পারি। কারণ এ জাতীয় সত্য নিজেই নিজের সত্যতার দাবিদার। এ স্বউপস্থাপিত মানসিক অবস্থা প্রতিভাত হওয়া, প্রতীয়মান হওয়া, মনে করা ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়।"[১৮] তবে শেষতক চিজমের জানা প্রসঙ্গের পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় এখানে জ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার নির্দিষ্ট কোনো সমাধান আমরা পাই না। এই জানা শব্দটি সবসময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তিনটি ভিন্ন অর্থে এর ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। সাধারণত জানা শব্দটির তিনটি প্রায়োগিক অর্থ আমরা পাই। এখন এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. পরিচিতি অর্থে জানা (Knowledge as Acquaintance)

জানা বলতে অনেক সময় আমরা পরিচয়কে নির্দেশ করে থাকি। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিষ্কার করা যায় : যদি প্রশ্ন করা হয়– তুমি কি তুহিনকে জান? এখানে প্রকৃতপক্ষে তুহিনের সাথে পরিচয় আছে কিনা তা জানতে চাওয়া হচ্ছে। এখানে আমাদের কোনো বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে জ্ঞান হয় তাই একে বস্তুজ্ঞান বলা যেতে পারে। তবে এখানে জানার বিষয়টি অনেক রকম হতে পারে। ব্যক্তি, বস্তু, গল্প, কবিতা, এমনকি আবেগ, অনুভূতি প্রভৃতি মানসিক অবস্থাও সম্পর্কিত হতে পারে।[১৯]

২. সামর্থ্য অর্থে জানা (Knowledge as Ability)

অনেক সময় জানা শব্দটি সামর্থ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায় : যদি বলা হয়– তুমি কি গাড়ি চালাতে জান? তুমি কি ফুটবল খেলতে জান? তুমি কি গাছে উঠতে জান? এখানে মূলত গাড়ী চালানো রূপ কাজ, ফুটবল খেলা রূপ কাজ এবং গাছে উঠা রূপ কাজ জানা আছে কিনা তা জানতে চাওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ এই কাজগুলো করার সামর্থ্য ব্যক্তির আছে কিনা তা জানতে

চাওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ এখানে কোনো কাজ করতে পারা বা কাজটি করার ক্ষমতা আছে কিনা তা জানতে চাওয়া হচ্ছে। একে কর্মজ্ঞানও বলা হয়ে থাকে।

৩. বাক্য অর্থে জানা (Knowledge in the Prepositional Sense)

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা জানা বলতে একটি বাক্যকে জানার বিষয়টিকে নির্দেশ করে থাকি, বুঝিয়ে থাকি। যেমন- আমি জানি যে, আমার গাড়িটি নীল রঙের। এখানে মূলত 'আমার গাড়িটি নীল রঙের' একটি বাক্য এবং এই বাক্যটিকে জানা অর্থে প্রয়োগ হচ্ছে, বোঝানো হচ্ছে। এখানে জানা বলতে বাক্যকে বোঝানো হয়ে থাকে, অন্য কিছু নয়। আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য দার্শনিকরা মূলত জানা বিষয়টির ক্ষেত্রে বাক্য জানাকেই বুঝিয়েছেন। জানা শব্দটির এই তিন ধরনের প্রয়োগ এবং নির্দেশনা থেকে আমরা বলতে পারি জানার যে তিন ধরনের অর্থ রয়েছে তা একেবারে সম্পর্কহীন কোনো বিষয় নয়। তবে জানা বিষয়টির তৃতীয় অর্থ অর্থাৎ 'বাক্য অর্থে জানাকে' সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কেননা বাক্য অর্থে জানা যখন বলা হয় তখন কোনো বাক্যকে সত্য বলে জানা হয়। এই বিষয়টিকে অন্য দু'প্রকার জানার আবশিক শর্ত হিসেবেও অভিহিত করা হয়। সুতরাং 'জানা' ক্রিয়াটি দ্বারা সবসময় কোনো না কোনো কিছুকে জানা হয় তবে সেটা বস্তু, ব্যক্তি কিংবা ঘটনা হতে পারে।

প্রফেসর জন হসপার্স এ জে এয়ারকে অনুসরণ করে এই তৃতীয় প্রকার জ্ঞানের তিনটি প্রধান শর্তের কথা বলেছেন। এই শর্তগুলো হলো : (১) সত্যতার শর্ত, (২) নিশ্চয়তা বা বিশ্বাসের শর্ত এবং (৩) নিশ্চিত হওয়ার দাবি সম্পর্কেও সচেতন হওয়ার শর্ত অর্থাৎ বিশ্বাসের স্বপক্ষে তথ্য-প্রমাণ হাজির করা যাতে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ব্যক্তি নিরপেক্ষ সত্যে পরিণত হয়।[২০] এখানে প্রথম দুটি শর্ত আবশ্যিক এবং তৃতীয় শর্তটি পর্যাপ্ত। এখন এগুলোর বিশ্লেষণ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

প্রথমত, আমাদের জ্ঞান হতে গেলে জানা বিষয়টি অর্থাৎ আমরা যা জানাচ্ছি তা সত্য হওয়া উচিৎ, কেননা জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথমেই এটি প্রয়োজন। আর এটিকে আমরা জ্ঞানের বিষয়গত শর্ত হিসেবে অভিহিত করতে পারি। এখানে 'জ্ঞান' ক্রিয়াটি শুধুমাত্র মনোগত কোনো বিষয় নয়। জ্ঞান এখানে বিষয় দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই শর্তটি আবশ্যিক কিন্তু পর্যাপ্ত নয়।[২১]

দ্বিতীয়ত, এখানে জ্ঞানের দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে নিশ্চয়তা বা বিশ্বাস। একে জ্ঞানের বিষয়গত শর্ত (Subjective Condition) বলা হয়ে থাকে। এই দ্বিতীয় শর্তের ক্ষেত্রে নিশ্চিত বিশ্বাসের মনোভাব থাকতে হবে। 'জানা'র অভ্যন্তরে বিশ্বাস বা নিশ্চয়তার শর্তটি নিহিত রয়েছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এটিও আবশ্যিক শর্ত।[২২]

তৃতীয়ত, জ্ঞানের তৃতীয় শর্তটি ক্ষেত্রে নিশ্চিত বিশ্বাসের পক্ষে অকাট্য দালিলিক প্রমাণ হাজির করতে হয় যাতে জানার দাবী সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। আর জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই তৃতীয় শর্তটি হলো পর্যাপ্ত শর্ত।[২৩]

প্রফেসর হসপার্স এই 'জানা'- কে আবার দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা : সবল অর্থে 'জানা' এবং দুর্বল অর্থে 'জানা'। তবে তিনি মনে করেন সংশয়বাদীরা পূর্ণাঙ্গ প্রমাণের ক্ষেত্রে সবল অর্থে জানাকে গ্রহণ করেছেন। হসপার্সের মতে, কোনো ব্যক্তি তার বিশ্বাসের পক্ষে কিছু সংখ্যক তথ্য যুক্তিও প্রমাণকে পর্যাপ্ত মনে করেন এবং দাবি করেন যে সে জানে তাহলে সেটি হবে দুর্বল অর্থে জানা। আর যদি তার বিশ্বাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করে চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থাপন করে যদি বলেন, আমি জানি তাহলে তা হবে সবল অর্থে জানা।[২৪]

পরিশেষে বলা যায় সকর্মক ক্রিয়া হিসেবে 'জানা' শব্দটি তার কর্মকে পরিচালিত করে থাকে। এর ফলে আমরা আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে জানাকে এমন সব ক্রিয়ার সাথে একত্রিত করে থাকি যাতে করে ঐসব ক্রিয়া নিজেদেরকে সকর্মক ক্রিয়া হিসেবে নিজেদের পরিচালিত করে থাকে।[২৫] আর এই জানার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির কাছে অবশ্যই প্রমাণ যেমন থাকতে হবে, তেমনি সেই প্রমাণ সঠিক হতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রমাণের সম্পর্ক সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে অর্থাৎ নিশ্চয়তা থাকতে হবে।[২৬]

জ্ঞানের ক্ষেত্রে 'বিশ্বাস'র রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। তাই এখন জ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্পর্ক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

জ্ঞানের সাথে 'বিশ্বাস'র সম্পর্ক (জ্ঞান ও বিশ্বাস)

বিশ্বাস করা শব্দটি আমরা সাধারণত সেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকি যেখানে সত্য বা মিথ্যার যাচাই প্রশ্নে আমরা নিশ্চিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকি না। বিশ্বাসের প্রকৃতি প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবদুর রশীদের বক্তব্য আমরা উল্লেখ করতে পারি, তিনি মনে করেন, " 'বিশ্বাস করা' এর দ্বারা ব্যক্ত কোনো বচন এমন নিরাপদ যে- কোনো কিছু প্রমাণ সাপেক্ষে সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক, সেই নির্দিষ্ট জিনিসটি সম্পর্কে আমার বিশ্বাস, বিশ্বাস হিসেবেই থেকে যায়। কারণ বিশ্বাসের বিষয়বস্তু সত্যমিথ্যার সাথে সম্পৃক্ত নয়। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা প্রশ্নে আমাদের অবস্থান মাঝামাঝি।"[২৭] প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস কোনো কিছুর সত্য হওয়ার ইঙ্গিত প্রদান করে। অর্থাৎ "It is clear enough that

knowledge can not be identical with belief."[২৮] তবে বিশ্বাস অনেক সময় মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে পারে। আর তখন বিশ্বাস করা ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করা যায় না।

এই বিশ্বাস শব্দটি 'বিশ্বাস ক্রিয়া', 'বিশ্বাস করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই বিশ্বাস করা বলতে প্রকৃতপক্ষে কোনো কাজে বিশ্বাস করা, কোনো বস্তু কিংবা কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে বিশ্বাস করাকে বুঝিয়ে থাকে। D.W. Hamlyn এই বিশ্বাস প্রসঙ্গে বলেন, "…belief as a state of mind. In the sense of "belief" so far considered, it is a state of mind concerned with proposition."[২৯] দার্শনিক প্লেটোর মতে, জ্ঞান এবং বিশ্বাস এমন এক মানসিক বৃত্তি যা অন্য কোনো বৃত্তি দ্বারা এদেরকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। প্লেটোর বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে জ্ঞান ও বিশ্বাস পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ জ্ঞান ও বিশ্বাস মোটামুটিভাবে একজাতীয় বিষয়। তবে জ্ঞান এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে শ্রেণিগত পার্থক্য দেখানো যায় না। চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা দেখি বিশ্বাস থেকে জ্ঞানের দিকে যাত্রা শুরু হয়। বিশ্বাস যদি প্রমাণ করা যায় তখন সেটা জ্ঞানে পরিণত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে এখানে আরো উল্লেখ করা যায় যে, "...কোন কিছুকেই জানা যায় না- যতক্ষণ না তাকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে এবং বিশ্বাস এর সাঙ্গে 'বিশ্বাসের বিষয়বস্তুর' পার্থক্যও আছে। এই পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতাও জ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যকীয় দিক।"[৩০]

জ্ঞানতত্ত্বে বিশ্বাস শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বস্তুর প্রতি যদি আমাদের কোনো বিশ্বাস না থাকে, তাহলে ঐ বস্তুর সত্যতা সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ থেকেই যায়। ফলে বস্তুটি যুক্তিহীন হয় এবং তার সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না। তবে আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি, বিশ্বাস করা মানে সত্য হিসেবে গ্রহণ করা। এখানে যে- কোনো বুদ্ধিসম্মত বিষয়কে সত্য বলে গ্রহণ করাকে বোঝায়। প্রখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি মনে করেন জ্ঞান হচ্ছে যাচাইকৃত সত্য বিশ্বাস। তবে সক্রেটিস এও মনে করেন এই জ্ঞানকে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে বুদ্ধি এবং যুক্তির ওপর।[৩১]

অধ্যাপক আবদুল মতীন তার *An Outline of Philosophy* গ্রন্থে জ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "The Word 'Knowledge' may roughly be said to mean the state of having a belief supported by adquate evidence."[৩২] তবে তিনি এও বলেন, "জ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাস যুক্ত থাকলে সেটি হবে নিম্নস্তরের জ্ঞান এবং জ্ঞানের সঙ্গে অনিবার্যতাযুক্ত থাকলে হবে সর্বোচ্চস্তরের জ্ঞান।"[৩৩]

জ্ঞান ও বিশ্বাস নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিষয়ের অধ্যাপক রডারিক এম. চিজম তাঁর *Theory of Knowledge* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে জ্ঞান প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর মত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "জ্ঞান বলতে বিশ্বাস বা বিশ্বাস করার যৌক্তিকতাকে বোঝায়। অন্য কথায় জ্ঞানের উপাদান বিশ্বাস হলেও জ্ঞানকে পাকাপোক্ত করতে হলে সেই বিশ্বাসকে যুক্তিযুক্ত করতে হয়।"[৩৪] তবে বিশ্বাসের যৌক্তিকতার ক্ষেত্রে চিজম প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রতীতির কথা উল্লেখ করেছেন। পরোক্ষ প্রতীতি বিশ্লেষণে তিনি বলেন যে, পরোক্ষ প্রতীতি যে সকল বচন নিয়ে গঠিত হয় সেগুলোর যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য অন্য কোনো ধরনের বচনের সহযোগিতা দরকার হয় না।[৩৫]

পরোক্ষ প্রতীতির উদাহরণ হলো : বাহ্যবস্তু, অন্য ব্যক্তি এবং অতীত সম্পর্কিত উক্তিসমূহ। তবে এই পরোক্ষ প্রতীতি জ্ঞান পাওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে প্রত্যক্ষ প্রতীতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বচনের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য অন্য কোনো বচনের ওপর নির্ভর করতে হয় না। এখানে বচন নিজেই নিজের প্রমাণ উপস্থাপন করে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রতীতির ক্ষেত্রে যৌক্তিক ভিত্তি বচনসমূহের মধ্যে নিহিত থাকে। ফলে পরোক্ষ প্রতীতির মতো নতুন ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন এখানে হতে হয় না। তাই চিজম মনে করেন এই প্রত্যক্ষ প্রতীতির ক্ষেত্রে জ্ঞান সমস্যার জটিলতা কম বরং সহজ সমাধান পওয়া যায়। প্রত্যক্ষ প্রতীতির ক্ষেত্রে জ্ঞাতা, মন ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্য কোনো ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাই সত্যকে এখানে কোনো রকমের বাধাবিঘ্ন ছাড়া জানা সম্ভব।[৩৬]

এখন জ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে মানসিক বৃত্তি সম্পর্কীয় বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। জ্ঞান এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমরা এদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পাই এ. ডি. উযলীর *Theory of Knowledge* গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে। তিনি এ সম্পর্কে বলেন,

> জ্ঞান এবং বিশ্বাস হলো মানসিক বৃত্তি (Mental faculties), প্রত্যেকটি বৃত্তিই স্বয়ংজাত (Sui generis), আর তাই এদের একটিকে অপরটির মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, যেমনটি ভালোবাসার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা যায় না বন্ধুত্বকে। এগুলো বাস্তবিক পক্ষেই সমজাতীয়, যেমন- ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব সমজাতীয়, এবং এগুলো এদের যে কোনোটার চেয়ে অনেক বেশি পরস্পরের মতো, যেমন সন্দেহ বা ভালোবাসা বা আকাঙ্ক্ষা।[৩৭]

এই অধ্যায়ের আলোচনায় উযলী আরো দেখিয়েছেন যে, জ্ঞান এবং বিশ্বাস এই দৃষ্টিকোণ থেকে পরস্পরের অনুরূপ। জানা বা বিশ্বাসকৃত বিষয়সমূহ এখানে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিসূচক উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।[৩৮] তবে তিনি জ্ঞান এবং বিশ্বাসকে ক্রিয়া কিংবা অবস্থা (activities or states) হিসেবে নয়, এক ধরনের প্রবণতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই জ্ঞান এবং বিশ্বাসের

আলোচনায় উযলী প্রবণতাসূচক প্রকৃতির ওপর নির্ভর এবং গুরুত্ব প্রদান করাকে সঠিক বলে অভিহিত করেছেন। তবে তিনি জ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্যকে স্বীকার করেছেন। কারণ জ্ঞনের ক্ষেত্রে নিশ্চিয়তা প্রদান করা সম্ভব হলেও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য নয়। তবে এই জ্ঞান এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই বিষয়বস্তু (Objects) থাকতে পারে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে এদেরকে পৃথক করা যায় না।[৩৯] আবশ্যিক এবং আপেক্ষিক এই উভয় প্রকার সত্যের ক্ষেত্রেই একই বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে বিশ্বাস এবং জ্ঞান পাওয়া যেতে পারে। যুক্তিসম্মত বিশ্বাস যখন বৃদ্ধি পায় তখন সেটা জ্ঞানে পরিণত হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে প্রামাণিক বিষয় উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে থাকে। উযলী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পাঁচটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন যা তিনি তাঁর *Theory of Knowledge* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই পাঁচটি বিষয় এখন উযলীর উল্লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ থেকে হুবহু উল্লেখ করা হলো :

১. "যে প্রমাণ চূড়ান্ত নয়, তার উপর ভিত্তি করে নিশ্চিত হওয়া এবং সঠিক হওয়া।
২. যে প্রমাণ চূড়ান্ত নয়, তার উপর ভিত্তি করে নিশ্চিত হওয়া এবং ভ্রান্ত হওয়া।
৩. যে প্রমাণ চূড়ান্ত নয়, তার উপর ভিত্তি করে অনিশ্চিত হওয়া এবং সঠিক হওয়া।
৪. যে প্রমাণ চূড়ান্ত নয়, তার উপর ভিত্তি করে অনিশ্চিত হওয়া এবং ভ্রান্ত হওয়া।
৫. যে প্রমাণ চূড়ান্ত, তার উপর ভিত্তি করে অনিশ্চিত হওয়া এবং সঠিক হওয়া।"[৪০]

উল্লিখিত পাঁচটি বিষয় বিশ্বাস এবং জ্ঞানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে জ্ঞানকে বিশ্বাস থেকে শ্রেণিগতভাবে পার্থক্যযুক্ত বিশ্লেষণে না গিয়ে সংযত বিশ্বাস হিসেবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেখানো হয়েছে। বিশ্বাসের চূড়ান্ত পর্যায়ে এখানে প্রমাণও থাকে।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউমও জ্ঞান এবং বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর *An Enquiry Concerning Human Understanding* গ্রন্থে জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'কল্পনা ও বিশ্বাস' অধ্যায়ে বিশ্বাস সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন। হিউম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মূলত বস্তুস্থিতি এবং প্রকৃত সত্তায় বিশ্বাস করাকে বুঝিয়েছেন।[৪১] তাঁর মতে এই সত্তা এবং বস্তুস্থিতি সংক্রান্ত সকল ধরনের বিশ্বাসের উৎসমূলে রয়েছে স্মৃতি বা অনুভব প্রদত্ত বিষয় যা এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর অভ্যাসবশত সংযোজন ঘটিয়ে থাকে। মানুষের অভ্যাস নির্ভর প্রত্যাশা বিশ্বাস তৈরি হতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে হিউম বিশ্বাস করাকে এক প্রকার সহজাত বৃত্তি বা প্রবণতা হিসেবে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে হিউমের নিজস্ব মন্তব্য প্রাণিধানযোগ্য, "বাহ্যবস্তুর মধ্যে যে সম্বন্ধ, প্রকৃতই যে বস্তুস্থিতি,

আমাদের চিন্তাধারাও যে তা অনুসরণ করে চলে, তার মূলে আছে প্রকৃতি প্রোথিত একটা সহজ বৃত্তি বা প্রবণতা। এ বৃত্তিরই অপর নাম বিশ্বাস।"[৪২]

তবে হিউম একথাও বলেছেন যে, বিশ্বাসের মূলে যুক্তি এবং বুদ্ধির প্রণোদনা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে অনেক বিশ্বাস আছে যেগুলো যুক্তি, বিচার কিংবা বুদ্ধির কোনো ধার ধারেনা। এই ধরনের বিশ্বাসকে হিউম স্বাভাবিক বিশ্বাস বলে অভিহিত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন আমরা বাহ্যজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি তখন তাকে স্বাভাবিক বিশ্বাস বলে। হিউমের বক্তব্যের সাথে উযলীর বক্তব্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়, উযলী বলেন, "...জ্ঞান এবং বিশ্বাস কোনো ক্রিয়া বা অবস্থা (activites or states) নয়, বরং এগুলো হচ্ছে প্রবণতা,..."[৪৩]

বিশ্বাস করা বা মনে করার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু সত্য কিংবা মিথ্যা, যাই প্রমাণিত হোক না কেন এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা চলে না, কেননা এক্ষেত্রে ব্যক্তি সত্য সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা-নিরপেক্ষ থাকে। জানা বিষয়বস্তুকে নিশ্চিতভাবে সত্য ও অভ্রান্ত হতে হবে। তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ যদি আমাদের হাতে না থাকে তবে 'জানা' শব্দটির প্রয়োগ অপপ্রয়োগে পর্যবসিত হবে। তাই এসকল ক্ষেত্রে 'জানা' শব্দটির পরিবর্তে 'বিশ্বাস করা', 'মনে করা' বা 'অনুমান করা' শব্দসমূহ ব্যবহার করাই উত্তম।

সবশেষে বলা যায় জ্ঞান এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দু'ধরনের অভীক্ষা পরিলক্ষিত হয়। প্রথম অভীক্ষাটি আমরা যা জানি বা বিশ্বাস করি তার সাথে সংযুক্ত। এক্ষেত্রে এটা যখন মিথ্যা হবে তখন তা হবে বিশ্বাস। আর যখন সত্য হবে তখন অভীক্ষাটি জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে বিরোধপূর্ণ অবস্থায় থেকে যাবে।

দ্বিতীয় অভীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত। যদি ঐ ব্যক্তি অনিশ্চিত হয় বা পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়া নিশ্চিত হয় তখন সেটি অবশ্যই বিশ্বাসের পর্যায়ভুক্ত হবে। কিন্তু ব্যক্তি যদি চূড়ান্ত প্রমাণের আলোকে নিশ্চয়তা পায় তাহলে সেটি হবে জ্ঞান।[৪৪]

তাই জ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্পর্ক এবং অবস্থান সম্পর্কে একথা বললে যুক্তিযুক্ত হবে যে,

> জ্ঞান ও বিশ্বাসকে তাই নিছক মানসিক অবস্থা হিসেবে মনে করা ভুল হবে। এগুলো অংশত মানসিক অবস্থা (অথবা, বলা যায়, প্রবণতা), কিন্তু এদের মধ্যকার পার্থক্যটি অমানসিক হতে পারে, কেন না এদের বিষয়বস্তু সত্য বা মিথ্যা হয়, অথবা অংশত মানসিক এবং অংশত অমানসিক হতে পারে, কেন না জ্ঞাতা ব্যক্তির মনোভাব চূড়ান্ত বা অচূড়ান্ত প্রমাণের ভিত্তিতে গড়ে উঠে।[৪৫]

এখন আমরা আলোচনা করবো জ্ঞানতত্ত্ব ও তার ইতিহাস সম্পর্কে

জ্ঞানতত্ত্ব

দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো আমাদের চিন্তার জগতের উৎকর্ষতা সাধন করা। আর এই উৎকর্ষ সাধনের অন্যতম প্রধান কাজটি সাধিত হয় দর্শনের জ্ঞানবিদ্যা শাখায়। এই জ্ঞানবিদ্যা বা জ্ঞানতত্ত্ব জ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি সংশ্লিষ্ট দর্শনের অন্যতম শাখা। দর্শনের মূল কাজ জ্ঞান ও সত্যের অন্বেষণ। দর্শনের আলোচ্য বিষয়কে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. অধিবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics); ২. জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) ও ৩. মূলবিদ্যা (Axiology)। দেশ, কাল, কার্যকারণ তত্ত্ব, জড়, প্রাণ, মন ও স্রষ্টার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে অধিবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা। মূল্যবিষয়ক বচনের স্বরূপ, সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের স্বরূপ অবধারণ করা মূল্যবিদ্যার কাজ। আর দর্শনের যে বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি জ্ঞান, জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞানের বিষয়বস্তু, জ্ঞানের সীমা, পরিসীমা, জ্ঞানের বৈধতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত ও ব্যাপকভাবে আলোচনা করে তাকে জ্ঞানতত্ত্ব বলে। স্কটিশ দার্শনিক জেমস ফ্রেডরিক ফেরিয়ার (J.F.Ferrier) তাঁর *Institutes of Metaphysics* (1854) গ্রন্থে 'Epistemology' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।[৪৬] এই 'Epistemology' শব্দটির বাংলা রূপ জ্ঞানতত্ত্ব বা জ্ঞানবিদ্যা। এই শব্দটির স্পষ্টীকরণ প্রসঙ্গে আরও বলা যায়,

> "Epistemology, the philosophical study of the nature, origin, and limts of human knowledge. The term is derived from the Greek *episteme* ("*Knowledge*") and logos ("*reason*") and accordingly the field is sometimes reffered to as the theory of knowledge."[৪৭]

এই জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞানের প্রকৃতির দার্শনিক বিশ্লেষণ করা হয়। পাশাপাশি এখানে সত্য, বিশ্বাস এবং যাচাইকরণ ধারণার সাথে জ্ঞানের স্বরূপের সম্পর্ক নির্ণীত হয়।[৪৮]

পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব বা জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার সূত্রপাত দেখা যায় প্রাচীন গ্রিসের সোফিস্টদের চিন্তায়।[৪৯] সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তবে আধুনিককালে পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনার ব্যাপকতা ও গভীরতা লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪), বিশপ বার্কলি (১৬৮৫-১৭৫৩) ও ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬), জার্মান দার্শনিক কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) ও ফিখটের ১৭৬২-১৮১৪) আলোচনায় দর্শনের ভিত্তি ও প্রাণকেন্দ্র হিসেবে স্থান পায় জ্ঞানতত্ত্ব। তাঁদের আলোচনায় দর্শন ও জ্ঞানতত্ত্ব হলো অভিন্ন বিষয়।

ইমেরিটাস প্রফেসর George Thomas White Patrick এই জ্ঞানতত্ত্ব প্রসঙ্গে বলেন, ..."Theory of knowledge" has been construed as that branch of philosophy which deals with problems concerning the origin, nature, validity, limits, and conditions of knowledge."[৫০] এই আলোচনা করতে গিয়ে তিনি জ্ঞানতত্ত্বের সমস্যার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন-(1) Sources of knowledge এবং (2) Problems as to the validity of knowledge.[৫১]

Patrick এও মনে করেন জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় এই দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Herold H. Titus ও তাঁর *Living Issues in Philosophy* গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে তিনটি মৌলিক প্রশ্ন এবং সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা : (1) Origin of knowledge, (2) Appearance and reality of knowledge এবং (3) The tests of truth.[৫২] টাইটাস জ্ঞানের উৎস, প্রকৃত জ্ঞান কীভাবে পাওয়া যাবে, জ্ঞানের বৈধতা সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে উল্লিখিত তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন যা জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রে জরুরি বিষয়।

এই জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় আমরা দেখি এখানে মানবজ্ঞানের স্বরূপ, ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি, উৎপত্তি, অবস্থান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।[৫৩] এই জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ এবং প্রকৃতি প্রসঙ্গে ইমেরিটাস অধ্যাপক আবদুল মতীন বলেন, "স্পষ্টতই, আংশিকভাবে বিবরণমূলক হলেও জ্ঞানবিদ্যা মূলত একটি আদর্শমূলক বিদ্যা, যার কাজ হচ্ছে নিছক লৌকিক ধারণা বা অন্ধবিশ্বাস থেকে যথার্থ জ্ঞানকে পৃথক করার মানদণ্ড নিরূপণ করা।"[৫৪]

জ্ঞানতত্ত্বের প্রকরণ এবং জ্ঞান অন্বেষণকারী হিসেবে আমাদের কাজ কী? সে সম্পর্কে এলান গোল্ডম্যানের মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি তাঁর 'Epistemology' প্রবন্ধে বলেন,

> Epistemology is concerned with the nature, scope and structure of knowledge. As epistemologists, we want to know first what knowledge is, and we want our analysis of the concept to guide us in determining the scope of knowledge, in deciding how much knowledge we have. In determining the scope of knowledge, the epistemologist will attempt to answer sceptical challenges to the sources that are usually assumed to produce knowledge, sources such as perception, memory, testimony of others, and various kinds of reasoning.[৫৫]

এই জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় মূলত জিজ্ঞাসা থাকে আমাদের ধারণাসমূহের উৎস কী, সত্যের মানদণ্ডই বা কীভাবে নিরূপিত হয়ে থাকে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা এবং পরিসীমা কীভাবে জানা এবং বোঝা যায় প্রভৃতি।[৫৬] মানবজ্ঞান কী প্রকারে অর্জন হয়, এই জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে কিনা প্রভৃতি বিষয়ও এখানে আলোচিত হয়।[৫৭] এই জ্ঞানতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গে অধ্যাপক যদুনাথ সিনহা বলেন,

> "It enquires into the origin of knowledge and the condition of its validity. It enquires into the nature of knowledge. It answers the question wheather knowledge represents the reality or facts, or wheather it consists in judgements which do not correspond to facts."[৫৮]

অর্থাৎ জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রকৃতি, উপাদান, পূর্বশত, পরিধি প্রভৃতি বিষয়সমূহের আলোচনা আবশ্যক। এছাড়া জ্ঞান হতে গেলে কী কী উপকরণ দরকার? মানুষ কতটুকুই বা জানতে পারে? অতিন্দ্রিয় বিষয়সমূহ জানা সম্ভব কী না? যথার্থ জ্ঞান কী? এই যথার্থ জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব কী না? এই যথার্থ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কী কী শর্ত কাজ করে?– এ জাতীয় মৌলিক প্রশ্নই জ্ঞানতত্ত্বের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের চিন্তার বিষয়াবলির ক্ষেত্রে প্রকৃত উৎস কী, চিন্তার বিষয়সমূহ বাস্তব বিষয় বা ঘটনার সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ– তার সমাধান আমরা এখানে অন্বেষণ করি। তাই মানবচিন্তা বা সভ্যতার উন্মেষ এবং গঠনের ক্ষেত্রে এই জ্ঞানতত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া যথার্থ দর্শনচর্চার প্রধান এবং একমাত্র প্রবেশ দ্বার হিসেবে এই জ্ঞানতত্ত্বকে বিবেচনা করা হয়। আর আধুনিক দর্শনচিন্তা এই জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা ছাড়া সম্ভব নয়। এখানে জ্ঞানতত্ত্বই দার্শনিক আলোচনার মুখ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যথার্থ দর্শনচর্চার প্রধান এবং একমাত্র প্রবেশ দ্বার হিসেবে জ্ঞানতত্ত্বকে বিবেচনা করা হয়।

জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাস

নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, অনুধাবন এবং বিন্যাসের ক্ষেত্রে জ্ঞানবিদ্যার রয়েছে ধারাবাহিক ইতিহাস। জ্ঞানের জগতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে আমরা বিচ্ছিন্নতা, বিরোধ এবং যে অসামঞ্জস্যতা লক্ষ করি তার একটি যৌক্তিক সমন্বয় এবং সামঞ্জস্যের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় দার্শনিক চিন্তনে তথা জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায়। মানবজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা সুদীর্ঘ ইতিহাস দেখতে পাই। মানুষ তার নিজস্ব পরিবেশিক পরিমণ্ডল এবং বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে জ্ঞানচর্চা করে জন্ম দিয়েছে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার। আর এই জ্ঞানের

ইতিহাস অন্বেষণ করলে দেখা যায় দর্শনই জ্ঞানের ইতিহাসে প্রথম তার পদযাত্রা শুরু করে। তাই একথা অকপটে বলা চলে মানুষের জ্ঞানচর্চার ইতিহাস শুরু হয় দর্শনশাস্ত্র দিয়ে। মানুষ মূলত তার স্বাচ্ছন্দ্যবোধ জীবনব্যবস্থা সচল রাখতে সচেষ্ট হয় তার ভালো জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য। আর এজন্য তাকে ভাবতে হয়েছে, চিন্তা করতে হয়েছে অর্থাৎ জ্ঞানচর্চা শুরু করতে হয়েছে।

দর্শনের ইতিহাস অন্বেষণ করলে আমরা দেখি যে, সেই প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি যুগে আমরা কমবেশি জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা দেখতে পাই। পাশ্চাত্য, দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের তুলনায় আধুনিক যুগে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা পরিপক্বতা লাভ করেছে। প্রাচীন যুগের দার্শনিকগণ মূলত বিশ্বতত্ত্বের আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এমনকি জ্ঞানতত্ত্ব বা জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় তাঁরা কোনো আগ্রহ দেখাননি। জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত লক্ষ করা যায় প্রাচীন গ্রিসের সোফিস্টদের চিন্তন। জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্নের সূত্রপাত মূলত তাঁদের আলোচনায় দেখা যায়।

যদিও খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পাশ্চাত্য দর্শনের জনক থেলিসের হাত ধরে দর্শনের যাত্রা শুরু হলেও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় প্রায় একশত বছর পরে অর্থাৎ সোফিস্টদের সময়। তাঁরাই জ্ঞানের উৎপত্তি, সম্ভাবনা, সন্দেহ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সোফিস্টদের চিন্তন প্রসঙ্গে প্রফেসর থিলির মন্তব্য উল্লেখ করা যায়, তিনি বলেন,"The Sophists' attention was directed to the problem of knowledge by the diversity of opinions found among the Greek nature philosophers;..."[৫৯]

সোফিস্টরাই প্রথম জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। সোফিস্টরাই প্রথম আমাদের প্রাপ্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিরপেক্ষতা এবং আমাদের মনের ধারণার পরিমাণগত প্রশ্ন উত্থাপন করেন।[৬০] এই সোফিস্টরা সমগ্র গ্রিসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে বেড়াতেন এবং ছাত্রদেরকে তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাষণ দ্বারা আকৃষ্ট করেন, বিনিময়ে তারা বড়ো ধরনের সম্মানী বা পারিতোষিক গ্রহণ করতেন। আর এখানে মহামতি সক্রেটিসের সাথে তাঁদের মূল পার্থক্য। সক্রেটিস জ্ঞান বিতরণের জন্য কখনো অর্থ গ্রহণ করতেন না।[৬১]

পূর্ববর্তী দার্শনিকদের আলোচনাকে বাদ দিয়ে, সোফিস্ট সম্প্রদায় মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যাসমূহ বিশেষ করে মানবজ্ঞান এবং মানব-আচরণ সম্পর্কিত আলোচনায় আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এই সোফিস্টরা প্রত্যক্ষণকেই জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। জ্ঞানের সম্ভবনার ক্ষেত্রে তারা

সংশয় প্রকাশ করেছেন। সোফিস্ট সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা দার্শনিক প্রোটাগোরাসও (আনুমানিক ৪৮০-৪১০ খ্রিষ্টপূর্ব) জ্ঞানের উৎপত্তির ক্ষেত্রে সংবেদনকে গ্রহণ করেছেন এবং এ সম্পর্কিত তাঁর প্রখ্যাত উক্তি "Man is the measure of all things,..."[৬২] প্রোটাগোরাস এই উক্তির মধ্যে সত্যতার ক্ষেত্রে সর্বজনীনতাকে অস্বীকার করে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রোটাগোরাস পরবর্তী সোফিস্ট জর্জিয়াসও (আনুমানিক ৪৮৩-৩৭৫ খ্রিষ্টপূর্ব) জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি তাঁর *On Nature or Nonexistent* গ্রন্থে তিনটি নঞর্থক উক্তির মধ্যে দিয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার শুরু করেছিলেন। তাঁর এই তিনটি উক্তি ছিল এরকম, "...অস্তিত্বশীল বলে কিছু নাই, এ ধরনের কিছু থেকে থাকলেও তাকে জানা যায় না এবং জানা গেলেও এর জ্ঞান অন্যের মধ্যে সংক্রমণ করা যায় না।"[৬৩] জর্জিয়াসের এ সংক্রান্ত মতের কারণে সোফিস্টদের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতকে নঞর্থক ও সংশয়বাদী বলা হয়ে থাকে। মানুষের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত করে তাঁরা দার্শনিক আলোচনার মোড় ঘুরিয়েছিলেন– আর এখানেই তাঁদের বিশেষ কৃতিত্ব।

জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসে আমরা দেখি যে, সোফিস্টদের আন্দোলন এবং আলোচনার কারণে সক্রেটিস যুগের সূচনা হয়। সোফিস্টরা জ্ঞানের সম্ভবনার ক্ষেত্রে সংশয়বাদী ছিলেন। মহামতি সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্ব) সোফিস্টদের সংশয়বাদী আক্রমণ থেকে জ্ঞানের সম্ভবনার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা প্রদানে তৎপর হয়ে উঠলেন।

সোফিস্টদের চিন্তায় জ্ঞান ছিল ব্যক্তি নির্ভর অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণই জ্ঞানের উৎস। সক্রেটিস সোফিস্টদের এই মতের বিরোধিতা করেছেন। কেননা তিনি মনে করেন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞান ব্যক্তি নির্ভর, ভ্রান্তিযুক্ত এবং নিশ্চয়তাহীন। তাছাড়া এই জ্ঞান সব সময়ের জন্য বিশেষ জ্ঞান, সার্বিক জ্ঞান নয়।[৬৪] সক্রেটিস জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাকেই প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সক্রেটিস জ্ঞান এবং প্রজ্ঞাকে এক করে দেখেছেন এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে সার্বিক এবং সর্বজনীন মানদণ্ড প্রণয়নের চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ জ্ঞান বলতে তিনি কোনো ব্যক্তি বিশেষের ইন্দ্রিয় বা সংবেদনের খেয়াল-খুশিমতো কোনো বিষয়কে গ্রহণ করতে নারাজ। সক্রেটিসের কাছে জ্ঞান হলো বস্তুর সাধারণ সত্যতা যা ব্যক্তি বিশেষের ইন্দ্রিয় বা সংবেদনকে অতিক্রম করে শাশ্বত এক সার্বিক ধারণা তৈরি করে। আর এই ধারণাকে আমরা সবাই বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে থাকি।

সক্রেটিস তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির অবতারণা করেন। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সদর্থক দিকের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন শব্দ কিংবা প্রত্যয়ের সংজ্ঞা প্রদানের প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে সফল হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাশিদা আখতার খানমের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন,

"সক্রেটিসের জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় সংজ্ঞার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সংজ্ঞার মাধ্যমে কোনো কিছু সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান পাওয়া সম্ভব বলে তিনি দাবি করেন। কোনো বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা বলতে তিনি বস্তুটির মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কীয় জ্ঞানকে নির্দেশ করেছেন।"[৬৫]

সোফিস্টদের জ্ঞানের ব্যক্তিসাপেক্ষতাকে সক্রেটিস ব্যক্তিনিরপেক্ষতায় রূপ দেন। সক্রেটিস মনে করতেন আত্মজ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আত্মজ্ঞানই হলো মানুষের সামাজিক এবং নৈতিক জীবনের জন্য একান্ত আবশ্যক। নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে সক্রেটিস তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা শুরু করেছিলেন। তাই তো তাঁর মন্তব্য ছিল এরূপ, "... 'virtue is knowledge.'"[৬৬] তাছাড়া তিনি যে সার্বিক এবং সর্বজনীন জ্ঞানের কথা বলেছেন তা প্রত্যয় নির্ভর, যুক্তিসম্মত এবং বিচারবুদ্ধিসম্মত। দর্শনের ইতিহাসে তাই আমরা দেখি যে সক্রেটিসের জ্ঞান জিজ্ঞাসা এবং সত্য অন্বেষণের মূলে ছিল এক বাস্তব নৈতিক প্রেরণা। তিনি জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় চেয়েছিলেন। সক্রেটিস জ্ঞানচর্চার জন্য নয়, ন্যায়-নীতি সম্পন্ন যথার্থ জীবনযাপন প্রণালির জন্য জ্ঞানের অন্বেষণ করেছেন। এ দিক থেকে তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব প্রায়োগিকও বটে।

প্রাচীন যুগের ইতিহাসে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় প্লেটোর নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। প্লেটো তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *Theatetus* এবং *The Republic* এ জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্লেটোর এই *Theatetus* গ্রন্থটি প্রাচীনকালে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রে এক অনন্য দালিলিক প্রমাণ। কেননা এই গ্রন্থে প্লেটো সক্রেটিসের মুখ দিয়ে প্রশ্ন করছেন : জ্ঞান কী?[৬৭] প্লেটো এখানে জ্ঞান ও সত্যের অন্বেষণে প্রথমে জ্ঞান ও সত্য কি জিনিস বা বিষয় নয় তা দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। জ্ঞান যে প্রত্যক্ষণ নয়-এটার খণ্ডন নিয়ে তিনি *Theatetus* গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে জ্ঞানের স্বরূপ এবং জ্ঞানের সাথে অভিমত এবং আত্মগত প্রত্যক্ষণের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্লেটো মনে করেন জ্ঞান হলো স্থায়ী এবং পরিবর্তনহীন সার্বিক ধারণা। প্রত্যয় বা সামান্য ধারণার সাহায্য নিয়ে বুদ্ধিই সত্যতাকে আবিষ্কার করে। প্লেটো মনে করেন ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আমাদের যে বৃত্তি আছে সেটাই হলো বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা যার সাহায্য আমরা সামান্যের বা নিত্য সত্তার জ্ঞান লাভ করে থাকি। প্লেটো মনে করেন বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার সাহায্যে আমরা সত্য বা যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারি। আর যথার্থ জ্ঞান অকাট্য বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। আর এটি সবসময় অস্তিত্বশীল বস্তুকে নির্দেশ করে। আর যার কোনো অস্তিত্ব নেই সেখানে জ্ঞানের প্রশ্ন ওঠা নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে প্লেটোর অভিমত এরূপ, "Knowledge is the correspondence of thought and reality, or being ; knowledge must have an object. If the concept is to have any value as knowledge,..."[৬৮]

প্লেটো তাঁর *Theatetus* গ্রন্থে জ্ঞান সম্পর্কিত যে আলোচনা করেছেন তা ছিল মূলত নঞর্থক আলোচনা। এই আলোচনার মাধ্যমে তিনি সোফিস্টদের অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ খণ্ডন করে নিজস্ব মতবাদ প্রদান করার চেষ্টা করেন। তবে তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *The Republic*-এ জ্ঞান সম্পর্কে সদর্থক আলোচনা করেছেন।[৬৯] তবে এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে প্লেটো তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় নঞর্থক মতবাদ প্রদানের আগে সদর্থক মতবাদ প্রদান করেছিলেন। জ্ঞানের স্বরূপ, প্রকৃতি এবং নিশ্চয়তা সম্পর্কে জেনে তিনি সোফিস্টদের মতবাদের সমালোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন।[৭০]

প্লেটোর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল সব ভ্রান্ত এবং অসত্য মতবাদকে খণ্ডন করে সামনে অগ্রসর হওয়া। আর এই খণ্ডনের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। প্লেটো নঞর্থক দিকের সাহায্যে তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের অর্থাৎ সোফিস্ট এবং সক্রেটিসের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার সমালোচনা করেছেন। অন্যতম সোফিস্ট দার্শনিক প্রেটাগোরাসের 'ব্যক্তিই সবকিছুর নির্দেশক'-এ মত স্বীকার করে নিলে ব্যক্তি বিশেষের জ্ঞানকে সত্যের মানদণ্ড হিসেবে স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু ব্যক্তির চিন্তা সবসময়ের জন্য সঠিক নাও হতে পারে। তাছাড়া এটা ভবিষ্যতের জন্যও কার্যকরী নাও হতে পারে।

আর সদর্থক দিকের সাহায্যে প্লেটো জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। সদর্থক আলোচনায় তিনি জ্ঞানকে চিরন্তন এবং শাশ্বত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে জ্ঞান হবে সংশয়মুক্ত, অকাট্য এবং নিশ্চিত, ঠিক গণিতের মতো। তাঁর বিশ্বাস ছিল মানুষ গণিতের মতো নিশ্চিত এবং সর্বজনস্বীকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারে। তিনি আরও মনে করেন জ্ঞান সবসময় অস্তিত্বশীল বস্তুকে নির্দেশ করে থাকে। তিনি যথার্থ এবং অযথার্থ জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করে অনন্ত প্রত্যয়ের জ্ঞান চেয়েছেন। আর এই জ্ঞান পাওয়া যায় বিশুদ্ধ বুদ্ধির মাধ্যমে।

জগদ্‌বিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটলও জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এরিস্টটল তাঁর গুরু প্লেটোর সামান্যবাদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি। তিনি মূলত বিশেষের ওপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। বিশেষের গুণ বৈশিষ্ট্য অন্বেষণ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এরিস্টটল এই বিশেষকে সত্য হিসেবে মেনে নিয়ে ছিলেন। এই বিশেষ থেকে তিনি আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে সঠিকে পৌঁছান।

এরিস্টটলের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় প্লেটোর প্রভাব ছিল বেশ। প্লেটো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিবাদ এবং ভাববাদের দোষ-ত্রুটি শুধরিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব মতকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছেন। প্লেটোর মতো তিনিও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সার্বিককে গ্রহণ করেছেন। তবে এরিস্টটলের মতে আমরা বিশেষের মধ্য

দিয়ে এই সার্বিককে জেনে থাকি। অর্থাৎ এরিস্টটলের সার্বিক বিশেষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।[৭১] এরিস্টটল মনে করেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকেই আমাদেরকে সার্বিকের ধারণা পেতে হবে। কেননা তাঁর মতে অভিজ্ঞতার জগতের মধ্যেই সার্বিকের জগৎ অন্তস্থিত। এখানে গুরু প্লেটোর সাথে এরিস্টটলের মতের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেননা প্লেটো অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে ধারণাকে গ্রহণ করলেও এরিস্টটল সার্বিকের জন্য অভিজ্ঞতার জগৎকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন।[৭২]

এরিস্টটল তিনটি উপায়ে নিশ্চিত জ্ঞান বা জ্ঞানের নিশ্চয়তার কথা বলেছেন। যথা :

প্রথমত, এরিস্টটল মনে করেন জাগতিক বস্তুসমূহ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হলেও এর কিছু গুণ বা ধর্ম অপরিবর্তিত থেকে যায় সেক্ষেত্রে দ্রব্যের আকৃতি হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু দ্রব্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ তিনি বলতে চান কোনো পরিবর্তনের আগে বা পরে ঐ দ্রব্যের দ্রব্যত্ব একই রকম থাকে। তাই তিনি মনে করেন আমাদের ইন্দ্রিয়-চেতনার জগতেও বস্তু পরিবর্তিত হলেও এর মধ্যে স্থায়িত্ব লক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয়ত, তিনি মনে করেন মানব ইন্দ্রিয় যথার্থভাবে জাগতিক বিষয়াবলি প্রত্যক্ষণ করে। তবে কখনো কখনো বস্তুর গতি এবং আকার ইত্যাদি প্রত্যক্ষণ করার ক্ষেত্রে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ প্রতারিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে বার বার প্রত্যক্ষণ করে এই ভ্রান্তি দূর করা সম্ভব বলে তিনি অভিমত দেন।

তৃতীয়ত, জ্ঞানের নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞানের পর এরিস্টটল বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞানের কথা বলেছেন। কেননা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরের কোনো ধারণা থেকে আমরা এই জ্ঞান পাই না। এই জ্ঞান আমরা পেয়ে থাকি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রিয়ার ফলে।

এরিস্টটল তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় তত্ত্বগত বিজ্ঞান এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের কথা বলেছেন। এরিস্টটল মনে করেন তত্ত্বগত বিজ্ঞানের জ্ঞান নিশ্চিতভাবে মানুষের কামনা-বাসনা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পৃক্ত। এই তত্ত্বগত বিজ্ঞানের উক্তি সব সময় সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এরিস্টটলের মতে এই বিজ্ঞানের জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা এবং স্বপ্রমাণিত নিয়মসমূহ মানা হয়। এরিস্টটল তত্ত্বগত বিজ্ঞানের নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব বলে মনে করেন।[৭৩]

আর ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে এরিস্টটল মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় হিসেবে অভিহিত করেন। আজকের দিনের জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্য ব্যবহারিক বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত বিষয়। এরিস্টটলই যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হিসেবে জ্ঞানের এ সকল বিষয়কে ব্যবহারিক

বিজ্ঞান হিসেবে মর্যাদা প্রদান করেন।[৭৪] তিনি মনে করেন বস্তুর জ্ঞান পেতে হলে বস্তুটির কারণ, নিয়ম প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে। কেননা জ্ঞান পেতে হলে বস্তুর মধ্যকার আবশ্যিক গুণাবলিকে জানতে হবে, জানতে হবে একটি বিশেষ বস্তুর সাথে অন্য বস্তুর সম্পর্ক। এরিস্টটলের জ্ঞানতাত্ত্বিক চিন্তাকে সংক্ষেপে বলা যায়, "এরিস্টটল প্লেটোর দ্বারা নির্দেশিত জ্ঞানের সীমাকে ধারণার জগৎ থেকে বিশেষ বস্তুর জগতে নিয়ে আসেন এবং জ্ঞানের জন্য বিশেষ বস্তুর ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতাকে আবশ্যিক বলে ঘোষণা করেন। বিশেষ বস্তুর অন্তস্যূত সারসত্তা বা বিভেদক লক্ষণ থেকেই বিশেষ বস্তুর আকারকে পাওয়া যায়। এই আকার যে আদি কারণ থেকে নিঃসৃত হয় সেই আদি কারণই হলো এই বিশেষ বস্তুর মূল নীতিমালা এবং এই মূল নীতিমালার জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান।"[৭৫]

প্রাচীন যুগের দর্শনে দার্শনিকগণ মুক্ত মন নিয়ে স্বাধীন যৌক্তিক চিন্তা নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁদের চিন্তায় আমরা অভিজ্ঞতাবাদ, বুদ্ধিবাদ এবং সংশয়বাদের আলোচনা দেখতে পাই। জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসে তাঁদের এই আলোচনা অনেকটা সফল এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হয়। কেননা এই যুগে আমরা ব্যক্তির স্বাধীন মত, বিচারমূলক বিশ্লেষণ, বিজ্ঞানমনসস্কতার পরিচয় পাই। কিন্তু মধ্যযুগে এসে প্রাচীন যুগের চিন্তা ধারাবাহিকতা হারায়। দর্শনচিন্তা এবং আলোচনা এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি এবং বিচারমূলক বিষয়সমূহ চর্চার পরিবর্তে ধর্মীয় প্রাধিকারবাদের প্রাধান্য দর্শনচিন্তাসহ সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে। ফলে মধ্যযুগ দর্শনের ইতিহাসে ভিন্নভাবে স্থান পায়।

মধ্যযুগের দর্শন ছিল মূলত খ্রিষ্টীয় দর্শন। সমগ্র ইউরোপে এই দর্শন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই দর্শনের ভিত্তিমূলে কাজ করেছিল ধর্মীয় মনোভাব। ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত এই যুগে সর্বময় ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল চার্চ, চার্চই দর্শন এবং চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতো। এই মধ্যযুগীয় দর্শনে জ্ঞান বলতে বোঝানো হতো শুধুমাত্র ঈশ্বর এবং আত্মার জ্ঞানকে। মধ্যযুগে যুক্তিবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং নীতিবিদ্যাসহ জ্ঞানের সকল শাখাতে এই জ্ঞানের অন্বেষণ করা হয়েছে।[৭৬] অধ্যাপক ফ্রাংক থিলি মধ্যযুগের দর্শন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যা এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন,

> The assumption of the medieval thinker is either that the truths of religion are rational, reason and faith agree, and there can be no conflict between divine revelation and human thinking; or that, even though some truths of religion may transcend human reason, they are nonetheless guaranteed by faith, which is an independent source of knowledge.[৭৭]

মধ্যযুগের দর্শনকে সাধারনত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১. যাজকের যুগ (Patristic Period)
২. স্কলাস্টিক যুগ (Scholastic Period)

মধ্যযুগের দর্শনে এই উভয় যুগে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা খুব একটা লক্ষ করা যায় না। যাজকদের যুগে দার্শনিক তত্ত্ব অপেক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক আলোচনা এখানে হয়েছে বেশি। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন সেন্ট অগাস্টিন। তিনি জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, মানবমনের পক্ষে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। অন্য দিকে স্কলাসটিক যুগের খ্যাতনামা দার্শনিক সেন্ট আনসেলমও জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এই যুগের আরেকজন অন্যতম দার্শনিক হলেন সেন্ট টমাস একুইনাস। তিনিও জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখন এ তিন জন দার্শনিকের জ্ঞানতাত্ত্বিক মত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

সেন্ট অগাস্টিন (৩৫৪-৪৩০ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর দর্শন আলোচনায় জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর *On the Trinity* গ্রন্থে জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে সেন্ট অগাস্টিনের চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল ধর্মমত এবং ধর্মতাত্ত্বিক বিষয় সম্বন্ধীয়। তবে তিনি দর্শনের সমস্যাবলি নিয়েও আলোচনা করেছেন। অগাস্টিনের দর্শনচিন্তা প্রসঙ্গে বার্ট্রান্ড রাসেলের মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন,

> St Augustine, at most times, does not occupy himself with pure philosophy, but when he does he shows very great ability. He is the first of a long line whose purely speculative views are influenced by the necessity of agreeing with scripture.[৭৮]

দর্শন জগতে যেসব সমস্যা নিয়ে তিনি আলোকপাত করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা। অগাস্টিনের মতে শুধুমাত্র সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞানচর্চা নয়, ব্যক্তির জীবনকে স্বর্গ সুখের সাথে সম্পৃক্ত করাই জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য। অগাস্টিন বাহ্যজগতে বিদ্যমান বস্তুর জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান হিসেবে মেনে নেননি। কেননা বাহ্য বস্তু যেহেতু পরিবর্তনশীল, তাই এর সম্পর্কে প্রাপ্ত জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান হতে পারে না। তিনি মনে করেন মানুষ যেহেতু সসীম তাই তার পক্ষে অসীমের জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়। অগাস্টিন পরম সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি প্রজ্ঞাকে চূড়ান্ত সত্যজ্ঞান লাভ করার ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

অগাস্টিন প্রখ্যাত দর্শনিক প্লেটোর মতে দু'ধরনের জ্ঞানের কথা বলেছেন- (১) পরিদৃশ্যমান পরিবর্তশীল বস্তুজগতের জ্ঞান এবং (২) ধারণার জগতের জ্ঞান, যেটাকে তিনি অপরিবর্তনীয় জ্ঞান বলেছেন। মানুষ এই পরিদৃশ্যমান পরিবর্তনশীল বস্তুজগতের জ্ঞান লাভ করে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। আর ধারণার জগতের অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সত্তার জ্ঞান লাভ করে থাকে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার সাহায্যে। তবে মানবমন যেহেতু ভুলের উর্ধ্বে নয় তাই স্বভাবতই কম বেশি ভ্রান্তি হতে পারে। তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় মনবমন কীভাবে যথার্থ বা নিশ্চিত সত্য জ্ঞান পেতে পারে? এর উত্তরে তিনি বলেন, এক ধরনের ঐশী আলোকের মাধ্যমে মানুষ নিশ্চিত সত্যজ্ঞান লাভ করতে পারে। প্রতিটি মানুষ নিজস্ব প্রচেষ্টা দ্বারা এই ঐশী জ্ঞান পেয়ে থাকে। মানুষ চিরন্তন প্রত্যয়, সত্য-মিথ্যা এবং শুভ-অশুভ প্রভৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান এই ঐশী আলোকের মাধ্যমে অর্জন করে থাকে।

তাই অগাস্টিন মনে করেন আমাদের জ্ঞানের জন্য ঐশী আলোক প্রয়োজন আর ঈশ্বর মানবজাতিকে এই ঐশী আলোক দান করে থাকেন। তবে অগাস্টিনের মনে নিশ্চিত সত্য লাভে কোনো প্রকার দ্বিধা ছিল না। তিনি তাঁর *Contra Academicos* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে মানুষ নিশ্চিত সত্য জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এই সত্য জ্ঞান লাভ করার ক্ষেত্রে অগাস্টিন প্রথমে সংশয়বাদের সমালোচনা করেন এবং ঐশী আলোকবাদের আলোচনার প্রবর্তন করেন। ঐশী আলোকবাদে অগাস্টিন জ্ঞানের ক্রিয়ার মধ্যে প্রকরণ দেখিয়েছেন। যেমন : sense বা ইন্দ্রিয়, inferior reason বা নিম্নস্তরের বুদ্ধি এবং superior reason বা উচ্চস্তরের বুদ্ধি। একে আবার উত্তম বুদ্ধিও বলা হয়। এই তিন ধরনের ক্রিয়া আবার নিজস্ব কার্যপ্রক্রিয়ায় লিপ্ত। যেমন : ইন্দ্রিয় দেহের গুণাবলি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে, নিম্নস্তরের বুদ্ধি বাহ্যজগতের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে খোঁজ রাখে, আর উচ্চস্তরের বুদ্ধির কাজ হলো অনন্ত সত্যের জ্ঞান লাভ করা।

অগাস্টিনের আলোচনায় আমরা দেখি তিনি মূলত দুই ধরনের জ্ঞানের কথা বলেছেন : নিম্নস্তরের জ্ঞান এবং উচ্চস্তরের জ্ঞান। নিম্নস্তরের জ্ঞানের অধিকারী হয় সাধারণ মানুষ এবং মূর্খব্যক্তিগণ। দ্বিতীয় স্তরের উচ্চ জ্ঞান লাভ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, শুধুমাত্র ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি নিজস্ব গুণাবলির কারণে এই জ্ঞানের অধিকারী হয়। প্রথম স্তরের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় সংবেদনের ভূমিকা থাকলেও, দ্বিতীয় স্তরের জ্ঞানের ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য নয়। এখানে বৌদ্ধিক দিকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম স্তরে মানুষ বিভিন্ন জাগতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে সে সর্বজনীন চিরন্তন সত্যের জ্ঞান পায়। এই দুই প্রকার জ্ঞানের মাঝামাঝি আরও এক ধরনের জ্ঞান পরিলক্ষিত হয় বলে অগাস্টিন অভিমত প্রকাশ করেন। আর সেটা হলো বিচারবুদ্ধিসম্মত জ্ঞান। এই

ধরনের জ্ঞান মানুষ তার নিজস্ব যুক্তি এবং বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে অর্জন করে। তবে বলে রাখা ভালো বিচারবুদ্ধিহীন কোনো অর্বাচীন লোকের পক্ষে এই জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। এই জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয় অর্জিত জ্ঞান নয়, তবে বিচার-বুদ্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার ওপরে নির্ভরশীল বলে তিনি অভিমত দেন। অগাস্টিন এ জাতীয় ইন্দ্রিয় সংমিশ্রিত জ্ঞানকে 'জ্ঞান' (Knowledge) এবং চিরন্তন সত্যের জ্ঞানকে 'প্রজ্ঞা' (Wisdom) বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এই প্রজ্ঞাকে ধ্যানের সাথে যুক্ত বলে মতামত প্রদান করেছেন। সেন্ট অগাস্টিন নিজের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন, দেকার্তের চিন্তার পূর্বাভাস আমরা অগাস্টিনের চিন্তনে দেখতে পাই। অগাস্টিন মনে করেন, "যদি আমি প্রতারিতও হই, তথাপি আমি আছি।"[৭৯] অর্থাৎ ব্যক্তির নিজস্ব অস্তিত্ব সম্পর্কে যে-কোনো প্রকার সংশয় চলে না তাই অগাস্টিন উল্লিখিত উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। আধুনিক দর্শনের জনক রেনে দেকার্ত তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার শুরুতে সংশয়বাদের আলোচনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেন, তা হলো "I think therefore, I am"/ "Cogito ergo sum."[৮০] অর্থাৎ দেকার্ত চিন্তনকারী সত্তার অস্তিত্বকে সংশয় বা সন্দেহীনতা থেকে মুক্ত করে নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়ার পথে অগ্রসর হয়েছেন। দেকার্তের পূর্বে মধ্যযুগে সেন্ট অগাস্টিনও তেমনটি চেয়েছিলেন। তবে অগাস্টিনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, তিনি মূলত তাঁর জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় বুদ্ধির পাশাপাশি বিশ্বাসকেও গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তবে তার পূর্ববর্তী দার্শনিক প্লেটো এবং এরিস্টটলের বুদ্ধিবাদের সাথে তাঁর বুদ্ধিবাদের পার্থক্য রয়েছে। অগাস্টিনের বুদ্ধিবাদ মূলত প্রত্যাদেশ সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিবাদ। তাই বলা যায় অগাস্টিনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় আমরা যে বুদ্ধিবাদ দেখতে পাই তা মূলত প্রত্যাদেশ নির্ভর বুদ্ধিবাদ।[৮১]

সেন্ট আনসেলম (১০৩৩-১১০৯) মধ্যযুগের দর্শনিকদের মধ্যে প্রখ্যাত ছিলেন। তিনি সেন্ট অগাস্টিনের অনুসারী। তবে তাঁর চিন্তা ও কর্মে নিরপেক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি তাঁর দর্শনচিন্তায় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। দর্শনচর্চায় তিনি দ্বান্দ্বিক এবং যৌক্তিকতাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। খ্রিষ্টান ধর্মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন এই দার্শনিক। তিনি তাঁর *Proslogion* গ্রন্থে জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি জ্ঞান অর্জনের দু'টি উৎস : বিশ্বাস এবং প্রজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আনসেলম মনে করেন, বিশ্বাস কিংবা প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য বা দ্বন্দ্ব নেই। পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এরা অভিন্ন, একই। খ্রিষ্টান ধর্মে উল্লিখিত সকল প্রকার বিষয়কে বিনা দ্বিধায় সত্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত বলে আনসেলম মনে করতেন। আনসেলম মনে করেন প্রত্যাদিষ্ট সত্যকে বুদ্ধি দ্বারা যেমন প্রমাণ করা যায়

না, তেমনি বর্জন করাও ঠিক নয়। তিনি *Proslogion* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, খ্রিষ্টান ধর্মের বিষয়গুলোকে তিনি বোঝার জন্যই বিশ্বাস করেন। তিনি আরও বলেন বিশ্বাসকে বুঝতে না চাওয়া তা অবজ্ঞা করার শামিল। তিনি বিশ্বাস এবং প্রজ্ঞার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর মতে ধর্মীয় সত্যের জ্ঞান অর্জন করতে গেলে বিশ্বাস সেখানে আবশ্যকীয় বিষয়। আর এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তির আবশ্যিকতার ওপর।

তিনি চেয়েছেন বিশ্বাসের মাধ্যমে অর্পিত ধর্মীয় জ্ঞানের উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। প্রয়োজনে ধর্মবিশ্বাসকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করার জন্য যৌক্তিক প্রায়োগিকতা আবশ্যক। আনসেলম মনে করতেন ঈশ্বর এবং ঈশ্বর নির্দেশিত বিধি-বিধান মানুষের নিকট বোধগম্য করতে হলে তা যৌক্তিক উপায়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে করতে হবে। তিনি সংশয়বাদীদের মতের বিরোধিতা করে বলেন, বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে বোধগম্যতা সম্ভব নয়। তিনি মনে করতেন, ঈশ্বর, ধর্মশাস্ত্র এবং এ সম্পর্কীয় বিধি-বিধান এজন্য বিশ্বাস করতে হবে যে এগুলো সম্পর্কিত অনুবেদন মানবপ্রজ্ঞানে সম্ভব নয়। আনসেলম যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, খ্রিষ্টান ধর্মে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে যে যুক্তি প্রয়োগ করা যায় সেই একই যুক্তি অখ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। তিনি আরও মনে করতেন, যুক্তিই আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। তাই খ্রিষ্টান ধর্মে বিশ্বাসীদের উচিত ধর্মীয় বিধি-বিধানকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা। এভাবে আনসেলম তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রত্যাদেশের ওপর বুদ্ধির প্রয়োগ এবং যৌক্তিকতার আবশ্যকতা বিশ্লেষণে প্রয়াসী হন।

সেন্ট টমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর দর্শন আলোচনায় জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। একুইনাসের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা তাঁর সমগ্র দর্শন আলোচনার আঙ্গিকে আমাদেরকে বুঝতে হবে। কারণ তাঁর বিশ্লেষণকৃত বিভিন্ন আলোচনায় আমরা জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা দেখতে পাই। মধ্যযুগের আলোচিত এই দার্শনিক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর *On Spiritual Creatre* গ্রন্থে জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। একুইনাস তাঁর জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলকে অনুসরণ করেছেন। তাঁর সময়ে প্লেটো এবং এরিস্টটলের মতবাদ একত্রে মিশ্রিতভাবে আলোচনা চলছিল তা থেকে তিনি এরিস্টটলের মতকে সূক্ষ্মভাবে পৃথক করে নিজে গ্রহণ করেন। জ্ঞানের স্বরূপ এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে তিনি এরিস্টটলের মতকে গ্রহণ করেন। একুইনাস মনে করেন প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে সম্প্রত্যয়গত (Conceptual) জ্ঞান। আর এই জ্ঞানের ভিত্তিমূলে রয়েছে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ। বুদ্ধির মধ্যে আবার সম্প্রত্যয় বা ধারণার বিষয়টি নেই। একুইনাস মনে করেন যথার্থ জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় কাজ

করে। আর তা হলো–সংবেদন, সক্রিয়বুদ্ধি ও সম্ভাব্যবুদ্ধি। সংবেদন বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা আমাদেরকে প্রাথমিকভাবে বহির্জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, আর মানবমনে চিন্তন ক্রিয়ার সূত্রপাত হয় এখান থেকে।[৮২] আর ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ মানুষের বৌদ্ধিক ক্ষমতাকে সক্রিয় করে তোলে। তাই বলা যায় মানুষের মনে জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং কোনো কিছুর বোধগমত্য অর্জন করার ক্ষেত্রে শুধু সংবেদন দিয়ে তা সম্ভব নয়, বুদ্ধির সাহায্য প্রয়োজন।[৮৩]

একুইনাস মনে করেন জ্ঞানের ভিত্তিমূলে রয়েছে ইন্দ্রিয়-সংবেদনের বিষয়টি এবং এখান থেকে জ্ঞানের শুরু হয়। আর জ্ঞানের সার্বিকতা প্রাপ্তি ও পূর্ণতার জন্য বুদ্ধি আবশ্যক। অর্থাৎ বিষয়টা আরও সহজ করে বললে এরকম দাঁড়ায় যে, বস্তুর জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে শুধু বুদ্ধির একার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কেননা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা আমাদেরকে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে জ্ঞানের উপাত্ত সংগ্রহ করে দেয়। একুইনাসের এই চিন্তা আমরা তাঁর পরবর্তী দার্শনিক কান্টের চিন্তায় দেখতে পাই। তাঁর এই মনোভাব অনেকটা বিচারবাদী এবং সমন্বয়বাদী যার বিস্তৃত বিবরণ আমরা আধুনিক যুগের খ্যাতনামা দার্শনিক কান্টের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় দেখতে পাই। তবে একুইনাস এবং কান্টের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় আমরা বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে যে সমন্বয় দেখতে পাই তার তুলনামূলক বিচারে করলে কান্টের চিন্তায় আমরা বেশি স্পষ্টতা দেখতে পাই।

তবে একুইনাস তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রত্যাদেশের ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই প্রত্যাদেশের মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞানকে তিনি প্রজ্ঞা থেকে উচ্চে স্থান দিয়েছিলেন, যদিও এই জ্ঞানের প্রাথমিক স্তরে বিশ্বাস কার্যকর থাকে। এই প্রত্যাদেশ এবং প্রজ্ঞার সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল প্রত্যাদেশ প্রজ্ঞার উর্ধ্বে অবস্থান করে এবং এরা কখনো একে অপরের বিপক্ষে নয়। তিনি মনে করতেন জ্ঞানের সৌধ নির্মাণের ক্ষেত্রে একদিকে ধর্মতত্ত্ব এবং আরেকদিকে দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বনিতভাবে কাজ করে। আর এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিলক্ষিত হয় না। তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় আমরা দর্শন এবং ধর্মের মধ্যে এক ধরনের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখতে পাই। দর্শনশাস্ত্র এবং ধর্মের মধ্যে কোনো ধরনের দ্বন্দ্বকে তিনি মেনে নেননি বরং এদের মধ্যে সম্পর্ক অন্বেষণ করেছেন।

আধুনিক যুগের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন প্রখ্যাত দার্শনিক দেকার্ত, লক, বার্কলি, হিউম, স্পিনোজা, লাইবনিজ, কান্ট, ফিখটে প্রমুখ। এ সকল দার্শনিকগণ জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তবে এসব গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিকদের আলোচনা

আমরা এখানে প্রাচীন ও মধ্যযুগের মতো করে এখানে উপস্থাপন করবো না। জ্ঞানের উৎস ও পদ্ধতি সম্পর্কিত চারটি মতবাদের মধ্যে এ সম্পর্কিত আলোচনা বিস্তারিতভাবে থাকবে।

জ্ঞানের উৎস ও পদ্ধতি

মধ্যযুগের দর্শনের নির্বিচার বিশ্বাসের পরিবর্তে আধুনিক যুগের দর্শনে মানুষের মুক্ত, স্বাধীন, যৌক্তিক চিন্তা ও প্রজ্ঞার ওপর দার্শনিকরা গুরুত্ব প্রদান করেন। এ যুগের দর্শন আলোচনা মূলত মানুষের জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এ সময় জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। এ যুগে দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যাকে অনেকটা অভিন্ন মনে করা হতো।

জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা লক্ষ করি জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎসগুলো কী? আমরা জ্ঞান অর্জনের প্রাথমিক পর্যায়ে ধারণা কীভাবে লাভ করি। ইন্দ্রিয় সংবেদন, বুদ্ধি এবং স্বজ্ঞাকে লৌকিকমত জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধারণা বলে অভিহিত করে। এছাড়াও মানুষ জ্ঞানপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রামাণিক শাস্ত্র কিংবা প্রাধিকার থেকেও ধারণা লাভ করে থাকে।[৮৪] এ সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে অধ্যাপক আবদুল মতীনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> ... epistemology inquires which of these sources exactly is or are the 'real' source or sources of our ideas? It may be that sense alone is the original source, and reason simply plays upon the sensory materials. The same may be said of reason, intuition or authority; or any two or more of these sources may be combined.[৮৫]

শুধু আধুনিক দর্শনে নয়, সাম্প্রতিক জ্ঞানতত্ত্বের উৎস সম্পর্কিত আলোচনা দর্শনশাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তবে এ কথা সত্য যে পাশ্চাত্যদর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের বিস্তারিত এবং গভীর আলোচনা শুরু হয় এই আধুনিক যুগে। এ যুগের প্রখ্যাত দার্শনিক রেনে দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ, লক, বার্কলি, হিউম, কান্ট ফিখটে, বার্গসো প্রমুখ দার্শনিক এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এসব দার্শনিক জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় সচেষ্ট হয়েছেন, তবুও দর্শনের চিরাচরিত নিয়মে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে দার্শনিকগণ সর্বজনগ্রাহ্য বা সর্বসম্মত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। ফলে পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন মতবাদের। যেমন : বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, বিচারবাদ, প্রাধিকারবাদ, সংশয়বাদ প্রভৃতি। জ্ঞানের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে অনেকগুলো মতবাদ পরিলক্ষিত হলেও, এর মধ্যে মূলত চারটি মতবাদকে প্রধান মতবাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এগুলো হলো : বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, বিচারবাদ এবং স্বজ্ঞাবাদ। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা এই চারটি মতবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

এখন জ্ঞানের উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ এই মতবাদগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

জ্ঞানের উৎস হিসেবে বুদ্ধিবাদ

জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হলো বুদ্ধিবাদ। এই মতবাদ মনে করে সঠিক ও যথার্থ জ্ঞান বুদ্ধির মাধ্যমে পাওয়া যায়। বুদ্ধিই জ্ঞানের একমাত্র গ্রহণযোগ্য উৎস। এই মতবাদ মনে করে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নয়, বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। অধ্যাপক জন হসপার্স বুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এভাবে,

> ...reason is the ability to think, and the degree of your rational powers, or powers of reason, is the degree of your ability to engage in thinking. It is in this sense that man is a rational animal. It we could not think, we could not acquire any knowledge of any sort, Including knowledge acquired through sense-perception.[৮৬]

বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জিত জ্ঞান অনেক সময় আমাদেরকে প্রতারিত করতে পারে কিন্তু বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান সার্বিক, নিশ্চয়তামূলক এবং বিশুদ্ধ। তাই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, "...বুদ্ধিও একটি স্বতন্ত্র বোধ এবং ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে বুদ্ধি (বা প্রজ্ঞা) অধিকতর নির্ভরযোগ্য জ্ঞান-উৎস।"[৮৭] বৌদ্ধিক স্পষ্টতা এবং প্রাঞ্জলতার কারণে আমরা যথার্থ জ্ঞানের দেখা পাই। বুদ্ধিবাদ মনে করে যে মন বা আত্মা বৈশিষ্ট্যগত কারণে সক্রিয় থাকে, আর বুদ্ধিই হচ্ছে মানবমনের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম। বুদ্ধিবাদ সম্পর্কে অধ্যাপক আবদুল মতীনের মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন,

> "Rationalism is that theory of knowledge according to which our reason is the only source of 'certain' knowledge. Reason is simply our faculty of correct thinking which works in collaboration with or independently of senses."[৮৮]

বুদ্ধিবাদীরা বহির্জগতের ইন্দ্রিয়-সংবেদনলব্ধ অভিজ্ঞতাকে বর্জন করে বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দেন এবং নিশ্চিত জ্ঞান অর্জনের উৎস এবং উপায় হিসেবে বুদ্ধিকেই স্বীকৃতি প্রদান করে থাকেন। তারা মনে করেন সক্রিয় আত্মার স্বাভাবিক গুণ হিসেবে বুদ্ধি নিজের অন্তর্জাত ধারণা স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্ঞান উৎপন্ন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়,

"Rationalism is the view that we know what we have thought out, that the mind has the ability to discover truth by itself, or that knowledge is obtained by comparing ideas with ideas."[৮৯]

বুদ্ধিবাদী দর্শনের প্রাথমিক আলোচনা দেখা যায় এলিয়াটিক দর্শনে। সক্রেটিসও বুদ্ধিবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বুদ্ধিকেই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় হিসেবে নির্দেশ করেছেন। সক্রেটিস বুদ্ধির সাহায্য সার্বিক ধারণা এবং এর দ্বারা জ্ঞান অর্জিত হয় বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তবে বুদ্ধিবাদের পরিপক্বতা পরিলক্ষিত হয় প্লেটো ও এরিস্টটলের হাতে।[৯০] প্লেটো মনে করেন বিচার বুদ্ধির মাধ্যমে প্রকৃত শাশ্বত, চিরন্তন ও নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়া যায়। আমরা বুদ্ধিবাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন দেখি হেগেলের দর্শনে। হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি চিন্তা ও সত্তাকে অভিন্ন মনে করে।

দর্শনের ইতিহাস অন্বেষণ করলে আমরা দেখি যে বুদ্ধিবাদের রয়েছে নানান রূপ এবং প্রকার। বুদ্ধিবাদের ইতিহাসে আমরা একদিকে দেখি চরমপন্থী এবং নরমপন্থী বুদ্ধিবাদ, অন্য দিকে রয়েছে এর প্রকারভেদ। Dr. Paulsen তিন রকম বুদ্ধিবাদের কথা বলেছেন। যথা : (১) অধিবিদ্যক বৃদ্ধিবাদ (Metaphysical Rationalism), (২) গাণিতিক বুদ্ধিবাদ (Mathematical Rationalism) এবং (৩) আকারগত বুদ্ধিবাদ (Formal Rationalism)।[৯১]

চরমপন্থী বুদ্ধিবাদের সমর্থক হিসেবে আমরা গ্রিক দার্শনিক পারমেনাইডিস, জার্মান দার্শনিক উলফ এবং ব্রিটিশ দার্শনিক ব্রাডলীকে পাই। তাঁরা মনে করেন বুদ্ধিই জ্ঞান অর্জনের একমাত্র উৎস, এর কোনো অন্যথা নেই। গ্রিক দার্শনিক হিরাক্লিটাস এবং ইলিয়াটিক সম্প্রদায় মনে করেন শুধুমাত্র বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা সত্যের স্বরূপকে জানতে পারি।[৯২] আর প্রকৃত অর্থ অন্বেষণ করলে আমরা নরমপন্থী বুদ্ধিবাদী হিসেবে ইমানুয়েল কান্টকে অভিহিত করতে পারি। চরমপন্থীরা অনিবার্য, অবশ্যসম্ভাবী জ্ঞানের অন্বেষণ করলেও নরমপন্থীরা প্রজ্ঞাসিদ্ধ ও প্রজ্ঞালভ্য গাণিতিক জ্ঞানের আদর্শকে অন্বেষণ করেছেন।[৯৩]

আধিবিদ্যক বুদ্ধিবাদের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে আমরা গ্রিক দার্শনিক মহামতি প্লেটো এবং জার্মান দার্শনিক হেগেলকে পাই। আধুনিক দর্শনের জনকখ্যাত ফরাসি দার্শনিক দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবেনিজ এবং উলফ ছিলেন গাণিতিক বুদ্ধিবাদের সমর্থক। আর আরেক খ্যাতনামা জার্মান দার্শনিক কান্টকে আমরা পাই আকারগত বুদ্ধিবাদের সমর্থক হিসেবে। এই তিন প্রকার বুদ্ধিবাদের মধ্যে আধুনিক যুগে গুরুত্ব পেয়েছে গাণিতিক বুদ্ধিবাদ। যাচাই-বাছাই এবং বিশ্লেষণগত মূল্যায়নে বুদ্ধিবাদের

ইতিহাসে এই গাণিতিক বুদ্ধিবাদের অবস্থান হয়েছে সুদৃঢ়। তাই স্বল্প পরিসরের আলোচনায় আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে এই গাণিতিক বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবেনিজ এবং উলফের চিন্তাগত দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্র করে। কেননা বুদ্ধিবাদ বলতে গেলে এই দার্শনিকগণের আলোচনায় সবার উপরে প্রাধান্য পায়। এখন পর্যায়ক্রমে এদের মতের সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরা হলো :

রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০)

আধুনিক দর্শনের জনক হিসেবে খ্যাত রেনে দেকার্ত তিনি তাঁর *Discourse on Method* (1637) এবং *Meditations* (1641) গ্রন্থে জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন দর্শন আলোচনা মানে প্রজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা। সকল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানই হচ্ছে প্রজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। দেকার্তের দর্শন আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল নিশ্চিত এবং সন্দেহাতীত সত্য আবিষ্কার করা। আর এ লক্ষে তিনি দর্শনে গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগে অগ্রসর হন। তিনি সংশয় এবং গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করে নিশ্চিত সত্যকে পেতে চেয়েছেন। তিনি মনে করতেন সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে দর্শনের ক্ষেত্রে অনেক অনাবিষ্কৃত সত্য আবিষ্কার করা সম্ভব। আর এ লক্ষ্যেই তিনি একপর্যায়ে প্রকৃতির সকল কিছুকে সন্দেহ শুরু করলেন। এমনকি তিনি আকাশ, বাতাস, শব্দ, বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি নিয়েও সংশয় করা শুরু করলেন। এ প্রসঙ্গে দেকার্তের *মেডিটেশন* গ্রন্থের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন,

> "I suppose, accordingly, that all the things which I see are false; I believe that none of those things which my deceptive memory presents to me are true; I suppose that I have no senses; I believe that body, figure, extension, motion, and place are nothing but fictions of mind. What is there then that can be thought true? Perhaps only that nothing in the world is certain."[৯৪]

তিনি চেয়েছিলেন সর্বব্যাপক বিজ্ঞানসম্মত দর্শনের ভিত্তি দাঁড় করাতে। জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় দেকার্ত তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক বেকনের অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতির বিরোধিতা করেছেন। জ্ঞানবিদ্যক আলোচনায় দেকার্ত বেকনের আরোহ পদ্ধতির বিরোধিতা করে অবরোহ পদ্ধতিকে গ্রহণ করলেন।[৯৫] দেকার্ত দর্শনের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত এবং স্বতঃপ্রতীত জ্ঞানের অন্বেষণ করেছেন যে জ্ঞান সব মানুষ সন্দেহহীনভাবে গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ এ জাতীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো সংশয়, অনুমান থাকবে না। এই জাতীয় জ্ঞান হবে যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণ হতে প্রাপ্ত সর্বজনগ্রহণযোগ্য জ্ঞান। জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনায় দেকার্ত প্রাচীন যুগের দার্শনিক প্লেটো, এরিস্টটল এবং মধ্যযুগের দার্শনিক

অগাস্টিনকে অনুসরণ করলেও প্লেটো এবং এরিস্টটলের সাথে দেকার্তের আলোচনার পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। প্লেটো, এরিস্টটল যেখানে সমগ্র মানবজাতির কথা বলেছেন অর্থাৎ মানবজাতি কীভাবে জানতে পারে, কীভাবে জ্ঞান পেতে পারে– এই চিন্তা করেছেন। দেকার্ত সেখানে একজন মানুষ অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষের জ্ঞান অর্জনের বিষয় নিয়ে অলোচনা করেছেন। দেকার্ত ব্যক্তি মানুষের চিন্তা-চেতনার, বিচার-বুদ্ধির ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। মোটকথা তিনি ব্যক্তি মানুষের মুক্ত বুদ্ধি এবং স্বাধীন চিন্তার উপর গুরুত্ব প্রদান করে দর্শনে স্বতন্ত্র ধারা প্রবর্তন করতে চেয়েছেন। আর এজন্যই তাকে আধুনিক দর্শনের জনক বলা হয়ে থাকে।[৯৬] দেকার্ত মূলত তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে এই অন্বেষণে ব্রতী ছিলেন যে, কীভাবে জ্ঞানের শক্তিশালী ভিত প্রতিষ্ঠা করা যায় যাতে কেউ তাকে কোনো অবস্থায় পরিত্যাগ করতে না পারে। এর এ লক্ষ্য পূরণের জন্য তিনি গণিতকে ভিত হিসেবে বেছে নেন। দেকার্ত লক্ষ করলেন জ্ঞানের সকল প্রকার শাখাতেই গাণিতিক নিয়মাবলীর প্রয়োগ ঘটানো যায়। এই গাণিতিক সূত্রাবলির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তিনি স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল জ্ঞান পেতে চেয়েছেন যা জ্যামিতির স্বত:সিদ্ধের মতো সত্য।

মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ সত্যের অন্বেষণে দেকার্ত তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে সংশয় পদ্ধতি প্রয়োগে প্রয়াসী হন। আর মৌলিক সত্যটি হচ্ছে, "Cogito ergo sum' or 'I think therefore, I am."[৯৭] দেকার্ত মনে করেন সবকিছু অবিশ্বাস বা সন্দেহ করলেও নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তিনি মনে করেন সন্দেহ করা, অবিশ্বাস করাও চিন্তার অংশ। অর্থাৎ চিন্তন ক্রিয়ার কারণে আমার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়। এভাবে দেকার্ত তাৎক্ষণিক উপলব্ধি লাভ করেন। এই তাৎক্ষণিক উপলব্ধি, স্বজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর পদ্ধতির অন্যান্য বচন অনুমানে সচেষ্ট হন এবং এ থেকে তিনি সত্যের একটি মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। আর এই মানদণ্ড দ্বারা তিনি নিজ, ঈশ্বর এবং বহির্জগতের বস্তুনিষ্ঠতার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।[৯৮]

অর্থাৎ দেকার্ত সংশয় থেকে প্রথমে নিজের, এরপর ঈশ্বর এবং তারপর বস্তুজগতের অস্তিত্বের প্রমাণ দেন। দেকার্ত তাঁর মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে যেয়ে তিন প্রকার ধারণার কথা বলেছেন। যথা : সহজাত (innate), আগন্তুক বা বহিরাগত (adventitious) এবং কৃত্রিম (factitious) ধারণা। দেকার্ত মনে করেন যেসব ধারণা বাইরে থেকে এসে আমাদের মনে ক্রিয়া করে তাদেরকে আগন্তুক ধারণা বলা যেতে পারে। এই ধারণাগুলো অস্পষ্ট অর্থাৎ স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল নয়। এগুলো প্রত্যক্ষণ থেকে পাওয়া বাহ্যবস্তুর ধারণা। তাই এই ধারণাগুলো বিভ্রান্তিকর এবং সন্দেহযুক্ত। ফলে এই ধারণার সাহায্যে আমরা সঠিক এবং নিশ্চিত জ্ঞান পেতে পারি না। কৃত্রিম ধারণাগুলো আমাদের মনোজগতের কল্পনার

ফসল। এই ধারণাগুলো প্রায় মিথ্যা হয়ে থাকে। তাই এর দ্বারা সত্য জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়।[৯৯] একমাত্র সহজাত ধারণাই বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণা যা আমাদের জন্মের সময় থেকেই আমাদের মনে থাকে এবং ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে থাকে। এই সহজাত ধারণাই জ্ঞান অর্জনের সাধারণ ও সর্বজনীন সূত্র প্রদান করে থাকে। ঈশ্বর, পূর্ণসত্তা, সত্যতা, বস্তু, নিত্যতা, দ্রব্য, অসীমতা প্রভৃতি হলো সহজাত ধারণালব্ধ জ্ঞান যাকে দেকার্ত যথার্থ জ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। দেকার্ত মনে করেন সহজাত ধারণাগুলো মানবমনে জন্মের পর থেকে প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট অবস্থায় থাকে এবং ধীরে ধীরে বুদ্ধির সাহায্যে এগুলো বিকাশ লাভ করে। দেকার্তের এই তিন প্রকার ধারণার ব্যাখ্যা স্পষ্টকরণ প্রসঙ্গে এখানে আরও উল্লেখ করা যায়,

> Descartes divides ideas into three kinds adventitious ideas, factitious ideas and innate ideas. The ideas imposed on the mind from without or sensations are adventitious; they are not clear and distinct. The ideas created by the mind by the conjunction of ideas are factitious; they are the ideas created by the imagination; they also are not clear and distinct. Both are doubtful. But the innate ideas, which are nither adventitious nor factitious, are clear and distinct and implanted in the mind by God at the time of birth; the are self-evident."[১০০]

জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হচ্ছে, সুনিশ্চিত এবং সঠিক জ্ঞান পাওয়া। দেকার্ত গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এই সত্য জ্ঞান পেতে চেয়েছেন। কেননা দেকার্ত গণিতের মধ্যে মানবমনের মৌলিক কার্যক্রম সম্পর্কিত কিছু বিষয়ের সন্ধান পেয়েছেন যা আমাদেরকে সরাসরি নিশ্চিত সত্যের উপলব্ধিতে সহযোগিতা করবে। আর এর ফলে আমরা নির্দেশনা পাব আমাদের জানার পরিধি সম্পর্কে।[১০১]

একজন গণিতজ্ঞ হিসেবে দেকার্ত চেয়েছেন দর্শনেও গণিতের মতো সূক্ষ্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে যথার্থ জ্ঞান পেতে। দেকার্ত তার জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তি প্রসঙ্গে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন : স্বজ্ঞা (Intuition) এবং অবরোহ (Deduction)। স্বজ্ঞার মাধ্যমে আমরা কোনো বিষয়ের মৌলিক ধারণা পাই আর অবরোহের মাধ্যমে আমাদের অনুভূতিজাত বিষয় থেকে নতুন নতুন তথ্যের ধারণা পাই। দেকার্ত আরও উল্লেখ করেন যে স্বজ্ঞা বুদ্ধিসঞ্জাত বিষয়ের একটি ক্রিয়া হিসেবে মানবমন থেকে সন্দেহ দূর করে থাকে।[১০২]

দেকার্ত মূলত মৌলিক জ্ঞান পাওয়ার জন্য সংশয়ের মাধ্যমে অগ্রসর হন এবং সংশয় দিয়ে সংশয়কে দূর করতে চেয়েছেন। দেকার্তের পূর্বে কোনো দার্শনিক এ ধরনের প্রচেষ্টা দর্শনে করেননি। মুক্তবুদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যক্তির বিচার বুদ্ধিকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন যা পূর্বে কোনো দার্শনিকের চিন্তায় লক্ষ করা যায় না। দেকার্তের গাণিতিক এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনা তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর *History of Western Philosophy* গ্রন্থের Book Three, Modern Philosophy, Part. 1 -এ দেকার্তকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন,

> "He is the first man of high philosophic capacity whose outlook is profoundly affected by the new physics and astronomy. While it is true that the retains much of scholasticism, he does not accept foundations laid by predecessors, but endeavours to construct a complete philosophic edificede novo."[১০৩]

একজন দার্শনিক এবং গণিতজ্ঞ হিসেবে তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার পদ্ধতি, প্রয়োগ এবং যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তি রচনায় তাঁর প্রচেষ্টা তাঁর পরবর্তী দার্শনিকদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ রসদ যুগিয়েছে। ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়কে জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসে তিনিই প্রথম স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করেন। আর এদিক থেকে বিবেচনা করলে তাঁকে আমরা বুদ্ধিবাদের আলোচনায় প্রধানতম দার্শনিক হিসেবে অভিহিত করতে পারি।

বেনেডিক্ট স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭)

দর্শনজগতের আরেকজন প্রখ্যাত দার্শনিক স্পিনোজার হাত ধরে জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসেবে বুদ্ধিবাদ আরও পরিপক্বতা লাভ করে। দেকার্ত তাঁর দর্শনে যে গাণিতিক পদ্ধতি চালু করেছিলেন সেই ধারা স্পিনোজার দর্শনেও অব্যাহত ছিলো। তবে স্পিনোজার গ্রহণীয় পদ্ধতির নাম ছিল জ্যামিতিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি জীবন, জগৎ এবং ঈশ্বরের নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিলেন। স্পিনোজার জ্যামিতিক পদ্ধতি গ্রহণ করার কারণ হিসেবে দেখা যায় যে, সব ধরনের জ্ঞানের দালিলিক প্রমাণ গণিত অন্বেষণে পাওয়া যেতে পারে। জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা স্পিনোজার দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাঁর দার্শনিক আলোচনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন প্রখ্যাত লেখক, সাংবাদিক ড. রজার স্ক্রটন তাঁর *A Short History of Modern Philosophy* গ্রন্থে। তিনি বলেন,

> "Spinoza's philosophy rests on two principles. First, a rationalist theory of knowledge, according to which what is 'adequaterly' conceived is for that reason true; secondly, a nation of substance, inherited through Descartes form

the Aristotelian tradition of which Descartes himself was the unwilling heir."[১০৪]

স্পিনোজার প্রখ্যাত গ্রন্থদ্বয় *Ethics* এর দ্বিতীয় ভাগে এবং *On the Improvement of the Understanding*-এ আমরা তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা দেখতে পাই। তিনি দেকার্তকে অনুসরণ করে বলেন যে, অভিজ্ঞতা নয় অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণা অর্থাৎ বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা নিত্যতা, পূর্ণতা, অসীমতা, ঈশ্বর, পরম সত্তা, দেশ-কাল প্রভৃতির জ্ঞান পেতে পারি। তিনি বুদ্ধিকেই নিশ্চিত এবং পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জ্ঞানের স্বচ্ছতা, প্রাঞ্জলতা আমরা বুদ্ধির মধ্যমে পেতে পারি বলে তিনি অভিমত প্রদান করেন। তিনি ইন্দ্রিয়-সংবেদনকে জ্ঞান পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. জি. সি. দেবের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "স্পিনোজার মতে যা কালিক, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সঙ্গে যার সম্বন্ধ, তা কখনো সত্য হতে পারে না ; যা ত্রৈকালিক, যা শাশ্বত, তাই সত্য, তার সত্তা অনস্বীকার্য। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে আমাদের চলমান কর্মচঞ্চল প্রাত্যহিক জীবনের যে অপরিহার্য যোগ, স্পিনোজার মতে তা অসত্য, অপ্রমাণ, খণ্ডদৃষ্টি থেকেই এর উৎপত্তি। এই কারণেই ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি ভ্রান্ত, অবিশ্বাস্য।"[১০৫] স্পিনোজাও দেকার্তের মতো সহজাত ধারণার অস্তিত্বকে গ্রহণ করেছিলেন। স্পিনোজা দ্রব্য (Substance), গুণ (Attribute) এবং বিকার (Mode)– এই তিনটি সহজাত ধারণা থেকে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে সকল প্রকার সত্যকে পরীক্ষা করেছেন। স্পিনোজা তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় তিন রকমের জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন :

১. অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ জ্ঞান (Obscure and indequate knowledge): সংবেদন এবং কল্পনা এই ধরনের জ্ঞানের উৎস। বিভিন্ন ধরনের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণজনিত বা কল্পনাপ্রসূত ধারণা সঠিক বা নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করতে পারে না। কেননা এসব জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা সঠিক কারণকে জানতে পারিনা। তাই আমরা এ জাতীয় জ্ঞানকে নির্ভুল এবং বোধগম্য জ্ঞান বলতে পারি না।

২. পূর্ণাঙ্গ এবং প্রকৃত জ্ঞান (Adquate or true knowledge): এই ধরনের জ্ঞানকে স্পিনোজা বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। এই ধরনের জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ, প্রকৃত এবং সুনিশ্চিত। এখানে জ্ঞানের উৎস বুদ্ধি হওয়ার কারণে বস্তুর সাথে ঈশ্বরের জ্ঞান সম্পর্কযুক্ত হয়ে বস্তুর সারসত্তা আমাদের কাছে বোধগম্য হয়। তাই এ ধরনের বৌদ্ধিক জ্ঞানকে তিনি স্বতঃসিদ্ধ এবং সত্য হিসেবে গণ্য করেছেন।

৩. স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান (Intuitive knowledge): স্পিনোজা স্বজ্ঞামূলক জ্ঞানকে উচ্চতর জ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে এই স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান কতটা উচ্চতর তা তাঁর দর্শনে তিনি স্পষ্ট করেননি। তবে এই স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ এবং আদর্শমূলক জ্ঞান এবং এই জ্ঞান ঈশ্বরের সত্তায় নিহিত থাকে। স্পিনোজা মনে করেন বৌদ্ধিক জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান লাভ করা যায়। এই জ্ঞান দ্বারা জাগতিক বিষয়বস্তুর সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক নির্ণীত হয়। তবে এই জ্ঞানকে 'মহাকালিক' জ্ঞানও বলা হয়।

জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে স্পিনোজা জ্ঞান বা প্রত্যক্ষণের চারটি প্রত্যাংশ (Modes) এর কথা উল্লেখ করেছেন। যথা: (১) জনশ্রুতি থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান, মানুষের জন্মের তারিখ বা বংশ পরিচয় সম্পর্কিত জ্ঞান। এই শ্রুতি থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান সম্পর্কে মানুষ সন্দেহ বা সংশয় করার তেমন প্রয়োজন মনে করে না। (২) শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান, জীবনের বিভিন্ন ধরনের বাস্তব জ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- মানুষ মরণশীল। (৩) অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক অনুমানলব্ধ জ্ঞান। যেমন- আকাশকে দেখে কাছে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অনেক দূরে। (৪) বস্তুর সারসত্তা বা নিকটবর্তী কারণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষণ। যেমন, মনোগত উপাদান দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি যে মন ও দেহ একত্রে সংযুক্ত।[১০৬]

উল্লিখিত চারটি প্রত্যাংশের মধ্যে স্পিনোজা শেষের প্রত্যাংশটিকে নির্ভুল এবং সুনিশ্চিত বলে মনে করেন। বস্তুর প্রকৃত সারসত্তা অনুধাবন করতে এটি আমাদেরকে সহযোগিতা করে থাকে। স্পিনোজা এভাবে অবরোহী পদ্ধতি প্রয়োগ করেন এবং এই পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি জ্যামিতিক সমস্যার অনুরূপ গাণিতিক সমস্যার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তিনি ঈশ্বরের ধারণা এবং অস্তিত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি ঈশ্বরের ধারণাকে সবচেয়ে সুনিশ্চিত এবং সত্য ধারণা বলে মনে করেছেন। জ্যামিতিক ক্ষেত্রে কোনো প্রতিজ্ঞা যেমন মৌলিক সংজ্ঞা এবং স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম থেকে আসে, তেমনি জগতের অভ্যন্তরে যা কিছু দৃশ্যমান, অস্তিত্বশীল কিংবা বাস্তব বলে আমরা জানি তা ঈশ্বরের প্রকৃতি থেকেই আসে। অর্থাৎ স্পিনোজার চিন্তায় ঈশ্বর-প্রকৃতি এবং দ্রব্য এক ও অভিন্ন। সত্তার সমগ্রতাই (totality of being) ঈশ্বরে নিহিত। আমাদের সবকিছুর ভিত্তিমূলে রয়েছে এই ঈশ্বর। তাই যে কোনো কিছুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ঈশ্বর থেকেই আমাদেরকে আরম্ভ করতে হবে। কেননা ঈশ্বর থেকেই সবকিছু অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়।

গটফ্রিড উইলহেলম লাইবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬)

জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন জন লকের অভিজ্ঞতাবাদের বিপক্ষে। তিনি দেকার্তের সাথে সুর মিলিয়ে বলেন মানবমন প্রথম থেকেই ধারণার অধিকারী। তবে তিনি মনে করেন মানুষ সহজাত ধারণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না ঠিক তবে তার মধ্যে সহজাত প্রবণতা রয়েছে। এই সহজাত প্রবণতাগুলো মানবমনে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, বুদ্ধিদ্বারা প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে থাকে। তিনি মনে করেন মানবমনের সকল প্রবণতা বা ধারণা সহজাত। লাইবনিজ মানবমন বা আত্মাকে মনাড (Monad) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করেন এই জগতে অসংখ্য মনাডের উপস্থিতি রয়েছে। এই প্রতিটি মনাড বা মনকে তিনি স্বতন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং প্রত্যেকটি মনাডকে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোটো একটি জগৎ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই মন বা মনাড বাইরে থেকে কোনো ধারণা গ্রহণ বা লাভ করে না, কেননা এই মনাড গবাক্ষহীন তাই বাইরের কোনো ধারণা মনে প্রবেশ করতে পারে না। তাই তিনি মনে করেন মন বা মনাড থেকেই আসে সকল ধরনের জ্ঞান। এ প্রসঙ্গে লাইবনিজ দার্শনিক জন লকের মতের বিরোধিতা করেছেন। লক মনে করেন জন্মলগ্নে মানবমন থাকে একটা অলিখিত সাদা কাগজের মতো, জন্মগ্রহণের পর থেকে সেই কাগজে দাগ পড়তে থাকে অর্থাৎ অভিজ্ঞতা দ্বারা পূর্ণ হতে থাকে। লাইবনিজ লকের এ মত প্রত্যাখ্যান করে বলেন জ্ঞানের সকল ধরনের উপকরণ মানবমনের মধ্যে সুপ্তাবস্থায় নিহিত রয়েছে। লাইবনিজ বলতে চেয়েছেন সকল জ্ঞানের উৎস ও আকার হলো মানুষের মন বা আত্মা। লাইবনিজের এই চিন্তার মধ্যে আমরা সক্রেটিস এবং প্লেটোর চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাই। এ প্রসঙ্গে আমরা জ্ঞান সম্পর্কে সক্রেটিসের অভিমতের স্বরূপ তুলে ধরলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। তিনি মনে করেন,

> ...দার্শনিকের জ্ঞানোৎপত্তির চেষ্টা ধাত্রী-বিদ্যারই সমজাতীয়। সুনিপুণ ধাত্রী যেমন মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সহায়তা করে থাকে, দার্শনিকের কাজও ঠিক তেমনি মানুষের অন্তরাত্মায় যে জ্ঞানভাণ্ডার লুক্কায়িত তাকে সন্তর্পণে, দক্ষতা ও তৎপরতার সঙ্গে প্রকাশ করা। সক্রেটিস রহস্য করে তাই বলেছেন যে, তিনি ও তাঁর মা সমব্যবসায়ী। সক্রেটিসের মা ছিলেন ধাত্রী। তিনি বলতেন : তাঁর মার কাজ ছিল মাতৃগর্ভে লুক্কায়িত সন্তানের পৃথিবীতে অবতরণের ব্যবস্থা করা, আর তাঁর কাজ হলো মানুষের অন্তরাত্মার ভিতর লুক্কায়িত জ্ঞানের অভিব্যক্তির সহায়তা করা। তাই জ্ঞানের ক্ষেত্রে ধাত্রী বিদ্যার প্রয়োগই তাঁর পেশা।[১০৭]

লাইবনিজের মতো সক্রেটিসও বহুপূর্বে মানবমনে জ্ঞানের সুপ্তাবস্থার কথা বলে গেছেন যে জ্ঞান প্রতিটি মানুষের অন্তরে লুক্কায়িত থাকে। সক্রেটিস এবং লাইবনিজ উভয়ই মনে করেন বৌদ্ধিক কারণে মানবমনের এই সুপ্ত জ্ঞান বিকাশ লাভ করে এখানে সংবেদন বা অভিজ্ঞতার কোনো ভূমিকা নেই। লাইবনিজ মনে করেন অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান পেয়ে থাকি তা হলো আপেক্ষিক

জ্ঞান। আর শাশ্বত, নিয়ত ও শুদ্ধজ্ঞান বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার মাধ্যমে পেয়ে থাকি। তাই তিনি লকের মতের বিরোধিতা করে তাঁর *New Essays Conerning Human Understanding* গ্রন্থে বুদ্ধিকে অভিজ্ঞতাপূর্ব বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন বুদ্ধি কখনো সংবেদন বা অভিজ্ঞতার বিষয় হতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায়, লাইবনিজ মনে করেন মানবমনের অন্তরস্থ অস্পষ্ট বা অব্যক্ত ধারণাসমূহ বৌদ্ধিক সক্রিয়তার কারণেই বিকশিত হয় এবং স্পষ্টতা লাভ করে।

ক্রিশ্চিয়ান উলফ (১৬৭৯-১৭৪৫)

তিনিও বুদ্ধিবাদের জয়গান করেছেন। তিনি অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেন। চরমপন্থী হিসেবে পরিচিত উলফ মনে করেন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ আমাদেরকে যে জ্ঞান প্রদান করে তা ভ্রান্ত। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণে আমরা ভ্রম-প্রত্যক্ষণের স্বীকার হই বলে তিনি মনে করেন, তাই বুদ্ধিকেই তিনি জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছেন। উলফের চিন্তায় আমরা বুদ্ধিবাদের স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাই। তিনি মনে করেন বুদ্ধি দিয়ে সকল কিছুর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। উলফের বুদ্ধির ব্যাপ্তি কিন্তু সংকীর্ণ নয়, সুদূর প্রসারী। তিনি তিন রকম জ্ঞানের ক্ষেত্রের কথা বলেছেন। যথা : বৌদ্ধিক বিশ্বতত্ত্ব, বৌদ্ধিক মনস্তত্ত্ব এবং বৌদ্ধিক ধর্মতত্ত্ব।[১০৮] এই বিষয়গুলোর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সহজাত ধারণার কথা বলেছেন। এই ধারণা থেকে অবরোহ পদ্ধতিতে আত্মা, ঈশ্বর, জগৎসহ প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা যায়। তিনিও তাঁর পূর্ববর্তী বুদ্ধিবাদী দার্শনিকের মতো মনের সহজাত ও বোধজাত ধারণার কথা স্বীকার করেছেন। চিরন্তন কিংবা শাশ্বত জ্ঞান এই সহজাত ধারণা থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

বুদ্ধিবাদের উপযুক্ত দার্শনিক চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে তাঁরা সবাই সহজাত ধারণার ওপর ভিত্তি করে সঠিক, নিশ্চিত এবং সার্বিক জ্ঞান পাওয়ার কথা বলেছেন এবং একতরফাভাবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভূমিকা অস্বীকার করেছেন। ফলে বুদ্ধিবাদ দর্শনের ইতিহাসে কোনো সন্তোষজনক অবস্থান তৈরি করতে পারেনি।

এতৎস্বত্ত্বেও বুদ্ধিবাদ অবরোহমূলক পদ্ধতিতে অভিজ্ঞাতাপূর্ণ ধারণার মাধ্যমে যে সঠিক, সার্বিক এবং সর্বজনগ্রাহ্য জ্ঞানের অন্বেষণ করেছে তা দর্শনের ইতিহাসে বিশেষ করে জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। বুদ্ধিবাদের এই অবদান নিঃসন্দেহে প্রসংশারযোগ্য।

জ্ঞানের উৎস হিসেবে অভিজ্ঞতাবাদ

দর্শনশাস্ত্রে যখন অভিজ্ঞতা শব্দটি ব্যবহার করা হয় তখন তা মূলত বাহ্যবস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ স্থাপনকে বোঝায়। এই সংযোগ স্থাপনের ফলে এক ধরনের সংবেদন তৈরি এবং এই সংবেদন থেকে যে প্রতিফলন বা ধারণার তৈরি হয় তাকে প্রত্যক্ষণ বলে। এই প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে বস্তু সম্পর্কে যে জ্ঞান হয় তাই অভিজ্ঞতা।[১০৯] আর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় এই তত্ত্বকে অভিজ্ঞতাবাদ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধিবাদী দর্শনের সরাসরি বিরোধিতার ফল হিসেবে অভিজ্ঞতাবাদের উদ্ভব ঘটেছে। জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হচ্ছে এই অভিজ্ঞতাবাদ। এই মতবাদ মনে করে যে স্বার্থক এবং যথার্থ জ্ঞান আমরা পেয়ে থাকি সংবেদন বা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ থেকে। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের মাধ্যমে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে থাকি। এই অভিজ্ঞতাবাদ প্রসঙ্গে D.W. Hamlyn তাঁর *The Theory of Knowledge* গ্রন্থে বলেন,

> Empiricism in respect to knowledge of truths (as opposed to empiricism in respect to concepts or ideas) might be thought to be simply the thesis that all knowledge comes ultimately from experience.[১১০]

অভিজ্ঞতাবাদে আমাদের প্রত্যক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ শক্তিকে মূল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন মনে করে এই প্রত্যক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংবেদনের সমবায়ে যে ধারণা তৈরি হয় তা থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অভিজ্ঞতাবাদীরা মনে করেন সংবেদন থেকে আমরা বহির্জগতের বস্তুসমূহের জ্ঞান পেয়ে থাকি আর অন্তর্দর্শনের সাহায্যে জানা যায় মানুষের মানসিক অবস্থার জ্ঞান। এই অভিজ্ঞতাবাদে আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে সামন্যীকরণের মাধ্যমে সাধারণ সত্য এবং সাধারন ধারণার জ্ঞান পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় অমূর্ত ধারণারও জ্ঞান অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাওয়া যায় বলে তাঁরা দাবী করেন। তাঁদের মতে বিভিন্ন স্বতঃসিদ্ধ নিয়মও (যেমন : কার্যকারণ সম্পর্ক বা Law of Causation, তাদাত্ম্য নিয়ম বা Law of Identity, বিরোধবাধক নিয়ম বা Law of Contradiction অভিজ্ঞতাবাদের ওপর নির্ভরশীল এবং এগুলো হলো সার্বিকীকরণের ফল। এই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আবার কখনো কখনো পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের সাহায্যও নেওয়া হয়ে থাকে। অভিজ্ঞতাবাদীরা বৌদ্ধিক নীতিমালার ভিত্তিতে পাওয়া জ্ঞানকে ভ্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কেননা তাঁরা মনে করেন বুদ্ধিপ্রসূত সকল প্রকার নিয়ম-কানুন প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত জ্ঞান মাত্রই অভিজ্ঞতা থেকে উৎপন্ন। শুধু তাই নয় জ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে বৈধতা এবং সত্যতা পরিলক্ষিত হয় তাও অভিজ্ঞতার অঙ্গীভূত বিষয়। অভিজ্ঞতাবাদকে সংক্ষেপে বুঝতে হলে অধ্যাপক টাইটাসের সংজ্ঞাটি

এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, "Empiricism stresses man's power of perception, or observation, or what the senses receive from the environment. Knowledge is obtained by forming ideas in accordance with observed facts."[১১১] এই অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. আবদুল মতীনও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন,

> বুদ্ধিবাদ দর্শনের সঙ্গে গণিতের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং গাণিতিক পদ্ধতি গ্রহণ করে। অন্যদিকে অভিজ্ঞতাবাদ দর্শনের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের মতো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং মনে করে যে, দর্শনের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে এক ধরনের আরোহ পদ্ধতি। এই মতবাদ অনুসারে, ঘটনার পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যতার বিশ্লেষণ ও অনুচিন্তন বা অন্তর্দর্শন দ্বারা জ্ঞান লাভ করতে হবে।[১১২]

অভিজ্ঞতাবাদের বৈশিষ্ট্য

অভিজ্ঞতাবাদের মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করলে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সেগুলো হলো :

১. অভিজ্ঞতাবাদ অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করে।
২. অভিজ্ঞতাবাদ অনুসারে ধারণা গ্রহণের সময় আমাদের মন নিষ্ক্রিয় এবং ধারণা গ্রহণের পরবর্তী সময়ে আমাদের মন সক্রিয় হয়।
৩. অভিজ্ঞতাবাদ বুদ্ধিবাদীদের সহজাত ধারণার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে।
৪. অভিজ্ঞতাবাদ থেকেই আসে যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ নতুনত্ব।
৫. অভিজ্ঞতাবাদ মনে করে বস্তু বিশেষের সংবেদন থেকে জ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়ে থাকে।
৬. অভিজ্ঞাতাবাদে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে আরোহ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

অভিজ্ঞতাবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অভিজ্ঞতাবাদের ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা দেখি যে, পাশ্চাত্য দর্শনের জনকখ্যাত থেলিস এবং তাঁর পরবর্তী দার্শনিকগণ, যথা : এনাক্সিমিনিস, এনাক্সিমেন্ডার, হিরাক্লিটাস অভিজ্ঞতাবাদী ছিলেন। তাঁরা বস্তুর প্রত্যক্ষণলব্ধ জ্ঞান দ্বারা তাঁদের দার্শনিক আলোচনাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁরা মনে করতেন, প্রত্যক্ষণ দ্বারা সব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। তবে পরমাণুবাদিগণ এবং প্রোটাগোরাস, জার্জিয়াস প্রমুখ সোফিস্ট সম্প্রদায় মনে করতেন ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সত্য জ্ঞান লাভ করা যায়। সোফিস্ট সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব প্রোটাগোরাসের বিখ্যাত উক্তি যা প্লেটোর *থিয়েটেটাস* সংলাপে গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে। প্রোটাগোরাস বলেন, "Man is the measure of all things, of things that are that they are, and of things that are not that

they are not." এই উক্তির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতাই সত্যতার নির্দেশক। অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই যা সত্য বলে বিবেচিত হবে তাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিষয়। প্রাচীন ভারতের চার্বাক দর্শনেও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে এরিস্টিপাস এবং এপিকিউরাসও অভিজ্ঞতাবাদকে মেনে নিয়েছিলেন। মধ্যযুগের অভিজ্ঞতাবাদের আলোচনার গুরুত্ব পায় বেকনের দর্শনে। তিনি মনে করেন প্রতিটি অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জ্ঞানের উপকরণ পেয়ে থাকি। আর আধুনিক যুগে ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক হলেন অভিজ্ঞতাবাদের পুরোহিত ও জনক। কেননা সর্বপ্রথম লকের হাতে অভিজ্ঞতাবাদের সুসংহত ও সুস্পষ্ট রূপ পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে বিশপ বার্কলি এবং ডেভিড হিউমের হাতে আমরা একটা সম্পূর্ণ এবং আরো সুস্পষ্ট রূপ পাই। এক্ষেত্রে দার্শনিক জে. এস. মিল এবং বেইন প্রমুখ হিউমকে সমর্থন করেন। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে অভিজ্ঞতাবাদ বলতে সহজেই আধুনিক যুগের খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব লক, বার্কলি এবং হিউমের অভিজ্ঞতাবাদই আমাদের সামনে চলে আসে। তাছাড়া এই অধ্যায়ের আলোচনার পরিসর সীমিত রাখার স্বার্থে আমরা এখন শুধুমাত্র এই তিনজন প্রখ্যাত দার্শনিকের অভিজ্ঞতাবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করবো :

জন লক (১৬৩২-১৭০৪)

ব্রিটিশ দার্শনিক জন লকের হাতে অভিজ্ঞতাবাদের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞানের প্রশ্নে তাঁর মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাবাদী। তাই আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে লক হলেন অভিজ্ঞতাবাদের জনক এবং প্রধান পুরোহিত। অভিজ্ঞতাবাদের একটি সুস্পষ্ট ও সুসংহত রূপ পরিগ্রহ করে লকের হাতে। জ্ঞানের সব ধরনের উপকরণ আমরা অভিজ্ঞতা থেকে পাই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। লক তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *An Essay Concerning Human Understanding* (1689) গ্রন্থে অভিজ্ঞতাবাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। লক এ গ্রন্থে দেকার্তের সহজাত ধারণা নিয়ে আলোচনা এবং সহজাত ধারণার অসারতা প্রমাণ করে তাকে বর্জন করেছেন। বুদ্ধিবাদী দর্শনের অর্থহীনতা তুলে ধরে তিনি অভিজ্ঞতাবাদকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছেন।[১১৩] লক মূলত জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে নতুন পথ ও পদ্ধতির অনুসন্ধান করেছিলেন। লক তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় একদিকে সহজাত ধারণার অর্থাৎ বুদ্ধিবাদের বিরোধিতা করে তা প্রত্যাখান করেছেন, অন্যদিকে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। লক মনে করেন দেকার্ত যে সহজাত ধারণার কথা বলেছেন আসলে এই ধরনের কোনো ধারণার অস্তিত্ব মানুষের মনে নেই। অভিজ্ঞতাহীন এরূপ কোনো সহজাত ধারণা যদি মানুষের মনে থাকতো তাহলে সকল মানুষ তা সমানভাবে বুঝতে পারতো। লক আরও অভিযোগ করে

বলেন, এরূপ ধারণা শুধু দেকার্তের মতো পণ্ডিতদের মনে থাকতে পারে, সাধারণ মানুষের মনে নয়।[১১৪] তাছাড়া শিশু, কমবুদ্ধিসম্পন্ন লোক কিংবা বোকা প্রকৃতির মানুষের মনে এ জাতীয় সহজাত ধারণা বলে কিছু নেই। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ঈশ্বরের ধারণা কিংবা নৈতিক নিয়ম শুধু ভিন্ন সমাজে নয় একই সমাজের বিভিন্ন মানুষের মনে একইভাবে বিরাজ করে না। তাই তিনি সহজাত ধারণাকে বাতিল করে অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। লক মনে করেন অভিজ্ঞতার মধ্যেই সকল ধারণা এবং বিশ্বাসের বিষয় নিহিত। তিনি মনে করেন অভিজ্ঞতা থেকে উৎপত্তি হয় না এমন কোনো কিছু বুদ্ধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই অভিজ্ঞতা জ্ঞানের একমাত্র উৎস।[১১৫] লক অভিজ্ঞতাকে সংবেদন এবং অন্তর্দর্শন - এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। মানবমন প্রাথমিক ক্ষমতা বলে এই সংবেদন এবং অন্তর্দর্শনজাত ধারণাকে গ্রহণ করে। লকের মতে ধারণা হলো মানবমন যাকে সরাসরি উপলব্ধি করে থাকে। অর্থাৎ ধারণা দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষণ, চিন্তা, বুদ্ধিজাত বিষয়সমূহকে সরাসরি অনুভব করতে পারি।[১১৬]

জন লক ধারণাকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। সরল ও যৌগিক ধারণা। বস্তুর সংবেদন এবং অন্তর্দর্শন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে আমরা যে ধারণা পাই তাই সরল ধারণা। মানবমন নিষ্ক্রিয়ভাবে এই ধারণা গ্রহণ করলেও, গ্রহণের পর মন সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর বিভিন্ন সরল ধারণার সংযোগে যৌগিক ধারণা গঠিত হয়। আর একাধিক ধারণার অনুসঙ্গ হতে মন একটি ধারণাকে পৃথক করে নিয়ে সার্বিক ধারণা গঠন করে থাকে। এভাবে লক তাঁর আরোহাত্মক পদ্ধতিতে জ্ঞানের উৎসের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি মনে করেন একাধিক ধারণার মধ্যে মিল এবং অমিল প্রত্যক্ষ করাই হচ্ছে জ্ঞান। আর বিভিন্ন ধারণার মধ্যে জ্ঞানের যে সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় তাকে জ্ঞানের বস্তু বলে। অর্থাৎ লক বলতে চেয়েছেন ধারণার উৎস মূলে রয়েছে ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা। এ প্রসঙ্গে লকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "তাহলে আমরা ধরে নিই যে, মন সাদা কাগজের মতো, এতে কোনো লেখা নেই। কোনো ধারণা বা প্রত্যয় নেই; তাহলে মনে জ্ঞান আসে কোথা থেকে? কেমন করে ব্যস্ত এবং অসংখ্য মানুষ সীমাহীন বিচিত্র বিষয় দিয়ে এই বিশাল মনে নানা কিছু অঙ্কন করে? কোথা থেকে মানুষ বুদ্ধি এবং জ্ঞানের উপাদানসমূহ পায়? এক কথায় আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেবো - অভিজ্ঞতা থেকে, অভিজ্ঞতাই আমাদের সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি এবং অভিজ্ঞতা থেকে চূড়ান্তভাবে জ্ঞানের উপাদান আসে (Book II, Chap. 1, Sec. 2)"[১১৭]

লকের মতে জ্ঞান তিন ধরনের। যথা :

১. স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান
২. প্রমাণমূলক জ্ঞান
৩. সংবেদনমূলক জ্ঞান

১. স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান

ক্রম অনুসারে প্রথমে আসে স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান। এই স্বজ্ঞামূলক জ্ঞানকে অব্যবহিত সাক্ষাৎ জ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে মন ধারণার সাহায্য ব্যতীত জ্ঞান পেয়ে থাকে। এই জ্ঞান প্রসঙ্গে বলা যায়, "Most certain of these is intuitive knowledge, in which the mind perceives the agreement or disagreement of two ideas without the intervention of any other."[১১৮] অর্থাৎ এই জ্ঞানে দুটি ধারণার মধ্যে সঙ্গতি বা অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়, তৃতীয় কোনো ধারণার সাহায্য এখানে দরকার হয় না। এ জাতীয় জ্ঞানে কোনো ধরনের সন্দেহ করার অবকাশ থাকে না, সেজন্য এই জ্ঞানকে সবচেয়ে নিশ্চিত জ্ঞান হিসেবে গণ্য করা হয়। মানুষের নিজস্ব অস্তিত্ব এ জাতীয় অনুভূতিমূলক জ্ঞানের উদাহরণ।

২. প্রমাণমূলক জ্ঞান

দ্বিতীয় প্রকার প্রমাণমূলক জ্ঞানে ধারণার সাহায্যে জ্ঞান লাভ হয়। লক মনে করেন এ ধরনের জ্ঞান হলো পরোক্ষ জ্ঞান। এই জ্ঞানের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা যায়,

> When the mind cannot bring two ideas together clearly enough to compare them directly, it can often effect such a comparison through the intervention of other ideas; this is demonstrative knowledge, and depends upon proofs;...[১১৯]

মানবমন যখন সরাসরি তুলনা করার জন্য দুটি ধারণাকে একসাথে না পায় তখন অন্য কোনো ধারণার সাহায্যে এই তুলনা করার কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। আর এখান থেকে যে জ্ঞান লাভ হয় তাই প্রমাণমূলক জ্ঞান। যেমন: ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞান। আরোহ যুক্তির মাধ্যমে এ জাতীয় জ্ঞান পাওয়া যায়।

৩. সংবেদনমূলক জ্ঞান

তৃতীয় প্রকারের এই জ্ঞান আমরা সংবেদন থেকে পেয়ে থাকি। এই জাতীয় জ্ঞান হলো সম্ভাব্য। সংবেদন দ্বারা বস্তুসামগ্রী এবং বর্তমান ঘটনাসমূহকে জানতে পারি। বহির্জগৎ যে আছে সেটাও আমরা সংবেদনের ওপর ভিত্তি করেই অনুমান করি, অর্থাৎ "Sensitive knowledge assures us that an

external world exists, and that it contains particular things with primary qualities inhering in substances."[১২০]

সংবেদনের দ্বারা প্রাপ্ত মৌলিক ধারণাই এ জাতীয় জ্ঞানের উৎস হিসেবে কাজ করে থাকে। তাই এ জাতীয় জ্ঞানের প্রামাণিকতা অনেকটা অনিশ্চিত। লক এ জাতীয় জ্ঞানকে সমস্যামূলক জ্ঞান বলেও অভিহিত করেছেন। দার্শনিক লকের চিন্তার ক্ষেত্রকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করলে তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনাকে আমরা সদর্থক বলতে পারি। এই আলোচনায় লক বিজ্ঞানকে অভিজ্ঞলব্ধ জ্ঞানের অঙ্গীভূত করেন। আর একারণেই জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ বিশেষ করে অভিজ্ঞতাবাদের আলোচনায় তাকে অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে অভিহিত করা হয়। তবে লকের অভিজ্ঞতবাদী মত সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। লকের এই অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। তিনি তাঁর 'জ্ঞানার্জন বিদ্যার বৈজ্ঞানিক বিধিবিধান' প্রবন্ধে লককে সমালোচনা করে বলেন, "লক্ জ্ঞানার্জন বিদ্যার যে কার্য-কারণ তত্ত্বের কথা বলেন তাতে তিনি 'সংবেদন'কে 'প্রত্যক্ষণে'র সঙ্গে এক করে গুলিয়ে ফেলেন। ফলে একদিকে সংবেদনকেই ভুল করে ধরা হয়েছিল মনেরই এক অবস্থারূপে; অন্যদিকে মনকে পরিণত করা হয়েছিল নিষ্ক্রিয় দর্শকরূপে। অর্থাৎ সংবেদন মনের কাছে যে ছবি পৌঁছে দেয় মন তাকে সে রকমই দেখে, তার নিজের কোনো বক্তব্য বা করণীয় থাকে না।"[১২১]

বিশপ বার্কলি (১৬৮৫-১৭৫৩)

জর্জ বিশপ বার্কলি তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক জন লকের প্রদত্ত দার্শনিক তত্ত্বসমূহের মধ্যে যে সকল অসঙ্গতি অবলোকন করেন তা তিনি একদিকে সংশোধনের চেষ্টা করেন অন্যদিকে তিনি এর ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। বার্কলি কর্তৃক লকের বিমূর্ত ধারণা প্রত্যাখাত হলেও লকের অভিজ্ঞতাবাদের অগ্রগতি সাধন ঘটে বার্কলির হাত ধরে। বার্কলি লক প্রদত্ত অভিজ্ঞতাবাদের একটি সুসংহত এবং যৌক্তিক ভিত্তি প্রদানের চেষ্টা করেছেন।[১২২] বার্কলি তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *Principle of Human Knowledge* এবং *Three Dialogue between Hylas and Philonous* গ্রন্থদ্বয়ে জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বার্কলি তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় লকের সার্বিক ও বিমূর্ত ধারণার অস্তিত্ব, দ্রব্যের ধারণা, মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যকার পার্থক্যের বিষয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বার্কলির অভিমতের স্বরূপ ছিল এরূপ, "...অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস–লকের এই মতকে মেনে নিলে বিমূর্ত বা সার্বিক ধারণার জ্ঞানকে স্বীকার করা যায় না। কারণ এর কোনো অভিজ্ঞতা নেই। অভিজ্ঞতায় আমরা যা পাই তা হল সাদা, কালো, লাল রং এবং এসব রং সম্পন্ন বিশেষ বস্তু। আমরা যেমন সাদাত্ব, কালোত্ব, লালত্বকে অভিজ্ঞতায় পাই না তেমনি বিশেষ বস্তুর

সার্বিক অস্তিত্বও অভিজ্ঞতায় পাই না।"[১২৩] আর এ কারণে তিনি সার্বিক ধারণা সম্ভব নয় বলে মনে করেন। সকল প্রকার ধারণাকে বার্কলি বিশেষ ধারণা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন, "...'জড়বস্তু' বা 'বাহ্যবস্তুর' ধারণা বিমূর্ত ধারণা হওয়ার কারণে দুর্বোধ্য। সুতরাং আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি না যে, জড়বস্তু বা বহির্জগতের অস্তিত্ব আছে। সংক্ষেপে, 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর'। শুধুমাত্র ঈশ্বর, সসীম আত্মা এবং তাদের ধারণাগুলোই প্রকৃত অর্থে অস্তিত্বশীল।"[১২৪]

তিনি লকের মুখ্য ও গৌণ গুণের পার্থক্যকে বাতিল করে দেন। তিনি বলেন মুখ্য গুণগুলো যেমন মনের ধারণা ঠিক তেমনি গৌণ গুণগুলোও মনের ধারণা। ফলে মুখ্য গুণগুলোর আধার হিসেবে জড় দ্রব্যের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে তিনি স্বীকার করেননি। তিনি শুধুমাত্র মনের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন এবং অভিমত প্রকাশ করেছেন যে সবকিছু মননির্ভর, মনের বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। তাঁর এই অভিমত থেকে বোঝা যায় প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বা মননির্ভর বলতে তিনি শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর কথাই নিদের্শ করেছেন।[১২৫]

ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬)

দার্শনিক জন লকের চিন্তায় আমরা যে ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদকে দেখি তার চরম পরিণতি লক্ষ করা যায় হিউমের দর্শনে। লকের অভিজ্ঞতাবাদী চিন্তায় বুদ্ধিবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বার্কলিও পুরোপুরি বুদ্ধিবাদ মুক্ত হতে পারেননি। কিন্তু হিউম এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে স্ব-বিরোধহীন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করেন।[১২৬] তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিবাদের বিপরীত। এজন্য তাঁকে চরম অভিজ্ঞতাবাদীও বলা হয়ে থাকে। তিনি তাঁর *A Treatise of Human Nature* (1739) এবং *An Enquiry Concerning Human Understanding (1894)* গ্রন্থে অভিজ্ঞতাবাদ এবং জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। হিউম লকের অভিজ্ঞতাবাদকে একটি চরম যৌক্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যান। সাক্ষাৎ জ্ঞান না পাওয়ার কারণে তিনি দ্রব্য, আত্মা এবং ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেননি। কেননা দ্রব্য, আত্মা এবং ঈশ্বরের ইন্দ্রিয়জ বা ধারণা সম্ভব নয়। তাই এদের সত্তাকে স্বীকার করার দরকার নেই বলে মনে করেন হিউম। হিউম মনে করেন আমাদের সমস্ত জ্ঞানের উৎস হচ্ছে ইন্দ্রিয়জ (Impression) এবং ধারণা (Idea)। মানব ইন্দ্রিয় যখন কোনো বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন মানবমনে বস্তুর ছাপ পড়ে। হিউম এর নাম দিয়েছেন ইন্দ্রিয়জ। আর এই ইন্দ্রিয়জ যখন অস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় তখন তাকে ধারণা বলে। তবে ইন্দ্রিয়জ ছাড়া ধারণা তৈরি হয় না। অর্থাৎ হিউম প্রত্যক্ষণ ছাড়া কোনো বিষয়ের জ্ঞান পাওয়াকে অসম্ভব বলে মনে করেন। হিউম আমাদের জ্ঞান বা চিন্তার উপকরণ হিসেবে প্রত্যক্ষণকে বেছে নিয়েছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাবাদের আলোচনায়

প্রত্যক্ষণকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা : (১) ইন্দ্রিয়জ (Impression) ও (২) ধারণা (Idea)। আমাদের সমস্ত জ্ঞানই আসে এই ইন্দ্রিয়জ এবং ধারণা হতে। এ প্রসঙ্গে হিউমের নিজস্ব বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন,

> All the perception of the human mind resolve themselves into two distinct kinds, which I shall call *impressions* and *ideas*. The difference betwixt these consists in the degrees of force and liveliness, with which they strike upon the mind, and make their way into our thought or consciousness. Those perceptions which enter with most force and violence, we may name *impressions*; and under this name I comprehend all our sensations, passions, and emotions, as they make their first appearance in the soul. By *ideas* I mean the faint images of these in thinking and reasoning; such as for instance, are all the perceptions excited by the present discourse,...[১২৭]

ইন্দ্রিয়জ বলতে হিউম বহিঃস্থ এবং অভ্যন্তরীণ (External and internal) সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত এই দুটি বিষয়কে নিদের্শ করেছেন। অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ উপাত্ত আসে এই ইন্দ্রিয়জ থেকে। এই ইন্দ্রিয়জ প্রকৃতি অত্যন্ত সজীব এবং স্পষ্ট। হিউম তাঁর ইন্দ্রিয়জ সম্পর্কিত আলোচনায় আবার দুটি উপশ্রেণির কথা বলেছেন, সংবেদনের ইন্দ্রিয়জ এবং অন্তর্দর্শনের ইন্দ্রিয়জ। স্বাদ, শব্দ, সুখ, দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বর্ণ, তাপ প্রকৃতি সংবেদনের ইন্দিয়জভুক্ত। আর অনুভূতি, কামনা, বাসনা, আবেগ, বিশ্বাস, সন্দেহ, চিন্তা প্রভৃতি অন্তর্দর্শনের ইন্দ্রিয়জভুক্ত। সংবেদনের ইন্দ্রিয়জের আগমন আমাদের ইন্দ্রিয় থেকে আর অন্তর্দর্শনের ইন্দ্রিয়জের আগমন বেশি ঘটে ধারনা থেকে।[১২৮]

হিউম মনে করেন মানবমনের বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জগুলো সান্নিধ্য, সাদৃশ্য এবং কার্যকারণ সম্পর্ক – এই ত্রয়ী অনুষঙ্গের নিয়ম দ্বারা সংযুক্ত হলে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তবে তিনি কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ককে স্বীকার করেননি। কার্যকারণ সম্পর্ককে তিনি অভ্যাসগত একটি ধারণা হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর জ্ঞানের উৎপত্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধির কোনো ভূমিকাকেই তিনি স্বীকার করেননি। হিউম মনে করেন দ্রব্য, আত্মা এবং ঈশ্বরকে আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করি না, তাই এসবের জ্ঞান সম্ভব নয়। এসব বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট সংশয় ছিল। জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সর্বজনীন, সত্য কিংবা নিশ্চিত কোনো জ্ঞান নেই বলে সব জ্ঞানকে সম্ভাব্যতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে জ্ঞানের মধ্যে কোনো অনিবার্যতার স্থান নেই। তাঁর মতে শুধুমাত্র সংবেদনের জ্ঞানই সম্ভব। এর বাইরে কোনো জ্ঞান পাওয়া যায় না। এভাবে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাবাদকে শেষ পর্যন্ত সংশয়বাদে পর্যবসিত করেন। হিউমের মতে একমাত্র সংবেদনই সত্য, যে বিষয়ের সংবেদন পাওয়া

যায় না। এভাবে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাবাদকে সংবেদনবাদ বা সংশয়বাদে নিয়ে যান। তাই হিউমের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা হিউমের অনুষঙ্গ নিয়ম দ্বারা জ্ঞানের একত্ব ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া তাঁর সংশয়বাদী চিন্তা জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা সংশয়বাদ জীবনযাপন প্রণালিকে বেশি দুর্বোধ্য এবং কঠিনের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি হিউম ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র জ্ঞানের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিচারবাদী দার্শনিক হিসেবে খ্যাত কান্টের আলোচনায় আমরা দেখি যে অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা জ্ঞানের উপাদান পাই কিন্তু জ্ঞানের আকার পাই না, আবার নতুনত্ব পেলেও বার্ধক্য এখানে অনুপস্থিত। তাই জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাবাদ একপেশে, আংশিক, একতরফা মতবাদ। তবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো উপাদান যা আমরা অভিজ্ঞতা থেকে পাই। তাছাড়া এই মতবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় জড়বাদ, বাস্তববাদ, প্রয়োগবাদ এমনকি ভাববাদেও। কাজেই জ্ঞানের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ হিসেবে এই মতবাদের একটা বিশেষ গুরুত্ব এবং মর্যাদা রয়েছে। শুধু তাই নয় এই অভিজ্ঞতাবাদ তাঁর পরবর্তী জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনাকেও করেছে সমৃদ্ধ।

জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিচারবাদ

প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) তাঁর দর্শনে যে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে তাঁর দর্শনের ভিত্তিভূমি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কান্ট তাঁর সমগ্র দার্শনিক আলোচনায় জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়টিকে বেশ প্রাধান্য দিয়েছেন। কান্ট তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরার পাশাপাশি উভয় মতবাদের গ্রহণীয় ভালো দিককে সামনে এনে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ পরস্পর বিরোধী দুটি মতবাদ। ইমানুয়েল কান্ট এ দুটি মতবাদকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *Critique of Pure Reason*-এ জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করেছেন এই গ্রন্থে। আর কান্টের মতবাদ বিচারবাদ নামে অভিহিত। কেননা জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি বিচারমূলক অনুসন্ধান এবং পর্যালোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবদুল মতীন যথার্থ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন,

> Kant's theory is called 'critical' because it spring from a criticism or examination of our faculties of knowledge. It may also be called 'synthetic' because it synthesizes empircism and rationalism (and also intuitionsm, in a sense).[১২৯]

কান্ট পর্যবেক্ষণ করেন যে বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের মূল বিরোধ হলো জ্ঞানের উৎস এবং উৎপত্তিকে কেন্দ্র করে। জ্ঞানের উৎপত্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদ এককভাবে বুদ্ধিকে প্রাধান্য প্রদান করে অন্যদিকে অভিজ্ঞতাবাদ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির কার্যকারিতাকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় সংবেদন কিংবা অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে। কান্ট বুদ্ধিবাদী এবং অবিজ্ঞতাবাদীদের একতরফা চিন্তার বিয়ষটি পর্যবেক্ষণ করে বলেন তাঁরা জ্ঞানের উৎপত্তি এবং স্বরূপের প্রশ্নে নির্বিচারবাদী মনোভাবের প্রতিফলন দেখিয়েছে যা যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কান্ট মনে করেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি আমাদেরকে আকার প্রদান করে ইন্দ্রিয় উপাদান বা বস্তু দিয়ে থাকে।[১৩০] আর যথার্থ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ দুটিকেই প্রয়োজন রয়েছে।

কান্ট মনে করেন মানবজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটি দিক আছে। যথা : উপাদান এবং আকারের দিক। উপাদান আমরা পেয়ে থাকি সংবেদন কিংবা অভিজ্ঞতা থেকে। আর বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় থেকে আমরা পেয়ে থাকি জ্ঞানের আকারের বিষয়টি। অর্থাৎ আকার এবং উপাদানের যৌথ ভূমিকা জ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের লেইসেস্টার (Leicester) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন কেম্পের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে কান্টের অবস্থান বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি, "Human knowledge arises through the joint functioning of sensibility and intellect, or understanding; it consists of a union of intuition (the product of sensibility) and concept (the product of the understanding."[১৩১]

কান্ট মনে করেন আমরা যদি প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে চাই, তাহলে আকার এবং উপাদান দুটিই প্রয়োজন। তাছাড়া কান্ট মনে করেন জ্ঞানের জন্য সার্বিকতা, অনিবার্যতা এবং নতুনত্ব দরকার। সার্বিকতা ও অনিবার্যতা আমরা পাই বুদ্ধি থেকে এবং নতুনত্ব আসে অভিজ্ঞতা থেকে। অর্থাৎ নতুন জ্ঞানের যৌথ সংযোজন হয় বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা। কেননা বুদ্ধি দেয় আকার আর অভিজ্ঞতা দেয় উপাদান যাদের সমন্বয়ে সঠিক জ্ঞান হয় । তাই এ প্রসঙ্গে কান্ট মন্তব্য করেন, "Concepts without percepts are empty and percepts without concepts are blind."[১৩২]

কান্ট মনে করেন ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে আমরা যা পাই তা দিয়ে জ্ঞান হয় না, আমাদের ভেতরকার বুদ্ধি প্রদত্ত কিছু বিষয় সেখানে যোগ করতে হয়। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন জ্ঞানের জন্য বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ানুভব দুই আবশ্যক।[১৩৩] এই ইন্দ্রিয় অনুভবের ক্ষেত্রে দুটি পূর্বতসিদ্ধ আকার দেখা যায়। যথা : দেশ ও কাল। আমাদের দেশবোধ এবং কালবোধের ধারণা পূর্বতসিদ্ধ, সব ধরনের ইন্দ্রিয় অনুভবের পূর্বেই এটা আমাদের মধ্যে নিহিত থাকে। তাই কান্ট মনে করেন বিশুদ্ধ জ্ঞান পেতে হলে

ইন্দ্রিয়ানুভবের বিষয়গুলোকে দেশ ও কাল সংশ্লিষ্ট সংবেদনের গণ্ডি অতিক্রম করে বোধশক্তির দিকে ধাবিত হতে হয়।

বোধশক্তির আলোচনা করতে গিয়ে কান্ট বলেন, জ্ঞান শুধু অসংলগ্ন কোনো কিছু প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। যখন দুই বা ততোধিক প্রত্যক্ষকে সম্পর্কিত করা হয় তখন এক ধরনের উচ্চতর বৃত্তি দ্বারা এই সম্পর্ক এবং সংশ্লেষণ সংগঠিত হয় যাকে কান্ট 'বোধশক্তি' নামে অভিহিত করেছেন।[১৩৪] বাহ্যজগতের অবধারণ এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ অহম (Self) সম্পর্কে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় এই বোধশক্তির ভূমিকার জন্য।[১৩৫] এই বোধশক্তির অধীনে রয়েছে ক্যাটিগরি যা জ্ঞানের মৌলিক ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। ইন্দ্রিয়ানুভবের সাথে এই ক্যাটিগরিগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণা হিসেবে চিহ্নিত। কান্ট বারটি ক্যাটিগরির কথা বলেছেন। এই ক্যাটিগরি বা বোধজাত আকারগুলো আমরা বুদ্ধির মাধ্যমে পাই। আর ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা জ্ঞানের উপাদানকে পেয়ে থাকি। কাজেই এদের সমন্বয়ের ফল হিসেবে আমরা জ্ঞান পেয়ে থাকি।

বুদ্ধিবাদে অবরোহ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় এবং এই পদ্ধতি ব্যবহারের কারণে এখানে শুধুমাত্র সার্বিকতা পাওয়া যায়। অন্যদিকে অভিজ্ঞতাবাদে আরোহ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় বলে এখানে নতুনত্ব থাকে, ফলে এখানে শুধু জ্ঞানের প্রসারতার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। অবরোহ প্রক্রিয়া আমাদেরকে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে সার্বিক ও অনিবার্য সত্যের জ্ঞান দেয়, আরোহ প্রক্রিয়া সংশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতালব্ধ, আপেক্ষিক জ্ঞান দান করে, এখানে সার্বিকতা বা অনিবার্যতা পাওয়া যায় না।[১৩৬] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কান্ট দুই প্রকার অবধারণের কথা বলেছেন। যথা : বিশ্লেষক (analytic) ও সংশ্লেষক (synthetic)। যে বাক্যের বিধেয় উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত থাকে সেটি বিশ্লেষক বাক্য। এই জাতীয় বাক্য নতুন কোনো কথা বলে না কিন্তু এতে সার্বিকতা ও অনিবার্যতা পাওয়া যায়। অন্যদিকে যে বাক্যের বিধেয় উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত থাকে না সেটি সংশ্লেষক বাক্য। এই জাতীয় বাক্যে সার্বিকতা ও অনিবার্যতা নেই কিন্তু নতুনত্ব আছে। তাই কান্ট বলেন, " যে বাক্য যথার্থ জ্ঞান প্রকাশ করে তাতে দুই রকম উপাদান থাকা চাই। অর্থাৎ সেই বাক্যকে একদিকে অনিবার্য ও সার্বিক হওয়া চাই এবং অপরদিকে নতুন তথ্য পরিবেশন করা চাই। বাক্যের অনিবার্য ও সার্বিক উপাদান আসে বুদ্ধিবৃত্তি (reason) থেকে। আর নতুন তথ্যের সংযোজন ঘটে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।"[১৩৭] সুতরাং কান্টের প্রচেষ্টা হলো এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করা।

কান্টের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় আমরা দেখি যে, তিনি বস্তুর দুটি রূপের কথা বলেছেন। একটি বস্তুর অবভাসিক রূপ, অন্যটি অতিন্দ্রিয় রূপ। কান্ট মনে করে বস্তুর অবভাসিক রূপকে জানা গেলেও অতিন্দ্রিয় বা স্বকীয় রূপকে জানা যায় না। কেননা অতিন্দ্রিয় রূপের বেলায় বোধজাত আকারগুলো কাজ করে না। আর এর ফলে কান্টের বিচারবাদ অজ্ঞেয়বাদে পর্যবসিত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার বিষয় দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত কিন্তু কীভাবে এদের মধ্যে স্বার্থক সংমিশ্রণে জ্ঞান উৎপন্ন হয় কান্ট তাঁর যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারেননি। কান্টের সমালোচনা করে প্রফেসর আবদুল মতীন তাঁর *An Outline of Philosophy* গ্রন্থে বলেন,

> It is difficult to understand how the *a priori* and concepts which are purely mental can apply to sensations which are produced by non-mental, external objects. Kant's own solution to this problem (cf. his doctrine of schematism) is not quite convincing.[১৩৮]

কান্ট বস্তুর স্বরূপের ব্যাখ্যায়ও দ্বৈতবাদের উৎপত্তি ঘটান। বস্তুর অবভাসিক রূপ জানা যায় কিন্তু অতিন্দ্রিয় রূপ জানা যায় না বলে তিনি যে দ্বৈতবাদের সূত্রপাত করেন তা তিনি তাঁর দার্শনিক আলোচনায় সমাধানের চেষ্টা করেননি। তাছাড়া বস্তুসত্তা আছে অথচ তাকে জানা যায় না বলে তিনি বিচারবাদকে অজ্ঞেয়বাদে নিয়ে গেছেন। কিন্তু দর্শনের আলোচনায় অজ্ঞেয়বাদ আদৌ গ্রহণযোগ্য কোনো মতবাদ নয়। শুধু তাই নয় এই মতবাদে তাঁর স্ববিরোধিতার বিষয়টিও স্পষ্ট।

পরিশেষে বলা যায়, উল্লিখিত সমালোচনা থাকলেও জ্ঞানের উৎপত্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ করে যে সমন্বয়ধর্মী বিচারবাদ তিনি প্রবর্তন করেন তা জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসে বিশাল মাইলফলক হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

সত্যিকারের জ্ঞানের জন্য অভিজ্ঞতামূলক তথ্য যেমন দরকার তেমনি অভিজ্ঞতাপূর্ব প্রত্যয়ও প্রয়োজন।[১৩৯] আর এই বিষয়টি কান্ট তাঁর বিচারবাদী আলোচনায় নিশ্চিত করেছেন যা নিঃসন্দেহে এক অনন্য কৃতিত্ব। জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর মতো জ্ঞানগর্ভ ও চুলচেরা বিশ্লেষণ আমরা খুব কম দর্শনিকের আলোচনায় দেখতে পাই। তাছাড়া কান্টের এই বিচারমূলক মতবাদকে সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক মতবাদ হিসেবেও অভিহিত করা হয়। তাই কান্টের জ্ঞানতাত্ত্বিক চিন্তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সময়ের বিচারে আজও অনস্বীকার্য।

জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বজ্ঞাবাদ

স্বজ্ঞাবাদ জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত একটি অন্যতম মতবাদ। এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ মনে করেন বুদ্ধি কিংবা অভিজ্ঞতা কোনোটি আমাদেরকে প্রকৃত জ্ঞান দিতে পারে না। স্বজ্ঞার মাধ্যমে একমাত্র যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যায় বলে এদের ধারণা। স্বজ্ঞাবাদীরা মনে করেন বিচারবুদ্ধি মনের একমাত্র শক্তি নয়, স্বজ্ঞা নামক আরেক ধরনের শক্তি রয়েছে আমাদের মনে যার সাহায্যে সরাসরি কোনো সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। অধ্যাপক উইলিয়াম লিলি এই স্বজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, " An intuition is the immediate apprehension of an object by the mind without the intervention of any reasoning process."[১৪০] তবে বিভিন্ন দার্শনিক এবং নীতিবিদ স্বজ্ঞা শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেছেন। এই স্বজ্ঞা প্রসঙ্গে অধ্যাপক জন হসপার্স বলেন,

> "... the word "intuition" in its most limited sense is merely the label for a certain kind of experience, one that (like somany) is not easily described. A conviction of certainty comes upon us quife suddenly, like "a light going on inside" and instantly we are convince that what comed to us in this "flash" is true."[১৪১]

বৃহৎ অর্থে স্বজ্ঞা বলতে বোঝায় কোনো বস্তু বা ঘটনার সরাসরি জ্ঞান পাওয়াকে। এই স্বজ্ঞার ক্ষেত্রে একটি গভীর আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গিও দেখা যায়। এদিক থেকে জ্ঞাতা উচ্চমার্গীয় অপরোক্ষ উপলব্ধির মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ জগতের সকল বহুত্ব ও বৈচিত্র্য অতিক্রম করে পরমসত্তার সন্ধান লাভ করেন। সংক্ষেপে স্বজ্ঞা বলতে বোঝায় কোনো ধরনের বিচারবুদ্ধির সাহায্য ছাড়া কোনো বস্তুকে সরাসরি মন দ্বারা উপলব্ধি করাকে। এই স্বজ্ঞাবাদের স্বরূপ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম বলেন, "আকস্মিকভাবে কোনো প্রকার চিন্তা ও ভাবনা ব্যতিরেকে, কোনো সমস্যার সমাধান লাভের উপায়কে স্বজ্ঞা বা বোধি বলে অভিহিত করা হয়।"[১৪২] ব্যক্তির কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে হঠাৎ করে তার মনে সমাধানের আলোকরশ্মি জ্বলে উঠে। সত্য এসে যেন এখানে আপনাপনি হাজির হয়। আর এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তির কোনো ধরনের চিন্তা ভাবনা, অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা কাজ করে না। স্বজ্ঞাবাদীরা মনে করেন স্বজ্ঞার মধ্য দিয়ে মানুষ চরম সত্যের সন্ধান পেতে পারে।[১৪৩] স্বজ্ঞাবাদ মনে করে জগৎ–জীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান পাওয়া যায় একমাত্র স্বজ্ঞার মাধ্যমে, বুদ্ধি কিংবা অভিজ্ঞতা আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দিতে পারে না। এই মতবাদ অনুযায়ী বাস্তবসত্তার জ্ঞান শুধুমাত্র আমরা স্বজ্ঞার মাধ্যমে লাভ করতে পারি অন্যকোনো উপায়ে নয়। স্বজ্ঞার গুরুত্ব প্রসঙ্গে অধ্যাপক টাইটাস তাঁর *Living Issues in*

Philosophy গ্রন্থে বলেন, "Intuition is a higher kind of knowledge, different in nature from that disclosed by the senses or by the intellect."[১৪৪] স্বজ্ঞার প্রকৃতি প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবদুল মতীন তাঁর *দর্শনের রূপরেখা* গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "... স্বজ্ঞার ক্ষেত্রে বিষয়ী বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি যোগ স্থাপন করে। স্বজ্ঞার সারসত্তা হচ্ছে প্রত্যক্ষতা এবং তাৎক্ষণিকতা। এই দুটি গুণই স্বজ্ঞাকে অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে।"[১৪৫]

এই স্বজ্ঞার সাহায্যে আমরা কোনো বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারি, বস্তুর সাথে একাত্ম হতে পারি। অনেক সময় স্বজ্ঞাবাদ এবং মরমীবাদকে একই প্রকৃতির বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ স্বজ্ঞাবাদ এবং মরমীবাদের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য আছে বলে মনে করা হয় না। এই মরমীবাদ ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত। মুসলিম দর্শনে এই মরমীবাদের আলোচনা আমরা দেখতে পাই। অবশ্য মুসলিম দর্শনে মরমীবাদ সুফিবাদ হিসেবে আলোচনা হয়। এই সুফিবাদ ইন্দ্রিয় সংবেদন এবং বুদ্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের প্রতি কোনো ধরনের আগ্রহ প্রদর্শন করে না বরং উদাসীনতাই পরিলক্ষিত হয়।[১৪৬]

মরমিবাদ বস্তুর প্রতি এক ধরনের নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যক্ষমূলক যা বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে সম্পর্ক স্থাপন করে। ফরাসি দার্শনিক হেনরী বার্গসো স্বজ্ঞাবাদের প্রধান প্রবক্তা। ব্রিটিশ দার্শনিক ব্রাডলিও স্বজ্ঞাবাদকে সমর্থন করেছেন। তিনি চরম তত্ত্বের সঠিক জ্ঞান পাওয়ার জন্য স্বাজ্ঞিক পদ্ধতিকে বেছে নেন। তবে প্রাথমিকভাবে পাশ্চাত্য দর্শনে স্বজ্ঞাবাদের আভাস মেলে নব্য প্লেটোবাদে। স্বজ্ঞাবাদের প্রকৃতি প্রসঙ্গে আরও বলা যায়, "মানুষের এমন একটি অন্তর্নিহিত শক্তি (অন্তর্নিহিত বোধ বা স্বজ্ঞা) আছে যার সাহায্যে সে সঠিক ও বেঠিক, যথোচিত ও অনুচিত প্রভৃতি নৈতিক গুণাগুণ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারে।"[১৪৭] স্বজ্ঞা প্রসঙ্গে বারট্রান্ড রাসেল বার্গসোকে উদ্ধৃত করে বলেন, "By 'intuition' he says 'I mean instinct that has become disinterested, self-conscious, capable of reflecting upon its object and of enlarging it indefinitely."[১৪৮]

হেনরী বার্গসো বুদ্ধিবাদের কঠোর সমালোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর স্বজ্ঞাবাদী অবস্থানকে মজবুত করেন। তিনি মনে করেন বস্তু বা সত্তার পূর্ণাঙ্গ রূপকে আমরা বুদ্ধির মধ্য দিয়ে জানতে পারি না। বুদ্ধি যেহেতু স্থিতিশীল তাই বুদ্ধি দিয়ে গতিশীল সত্তা কিংবা জগতের জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেন। তাছাড়া বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান আপেক্ষিক হওয়ায় তা বস্তুর পূর্ণাঙ্গ রূপ জ্ঞান দিতে পারে না। বার্গসো মনে করেন, বুদ্ধি সত্তার স্বরূপ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এক ধরনের অযথার্থ রূপকে স্থাপন করে। তিনি

আরো মনে করেন, বুদ্ধির সাহায্যে আমরা কেবল বস্তুটির বাহির বা প্রকাশ্য রূপকে জানতে পারি। বস্তুর স্বরূপকে আমরা বুদ্ধি দিয়ে জানতে পারি না। কেননা বুদ্ধি বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। বার্গসো আরো বলেন, বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান যেহেতু প্রত্যয় বা ধারণাভিত্তিক তাই তা শুধু আমাদেরকে অবভাসের জ্ঞান দেয়।

বার্গসো স্বজ্ঞাকে বুদ্ধিসঞ্জাত সহানুভূতি হিসেবেও অভিহিত করেছেন। বার্গসো মনে করেন এই বুদ্ধিসঞ্জাত অনুভূতি দ্বারা আমাদের পক্ষে বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বস্তুর সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে এর স্বরূপকে জানা সম্ভব হয়। বার্গসো স্বজ্ঞাকে বলেছেন বৌদ্ধিক সংবেদন, এক অনন্য অভিজ্ঞতা। একমাত্র স্বজ্ঞার দ্বারা আমরা বাস্তব সত্তার জ্ঞান লাভ করতে পারি। বার্গসো মনে করেন এই জগতের পরমতত্ত্ব বলতে বোঝায় প্রাণপ্রবাহকে (Elan Vital)। বার্গসো এই প্রাণপ্রবাহকে আবার কালপ্রবাহ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই প্রাণপ্রবাহ সম্পূর্ণভাবে গতিশীল এবং একে বুদ্ধি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। বুদ্ধি এই নিয়ত প্রবাহমান পরিবর্তশীল বিষয়ের স্বরূপ বুঝতে পারে না। তাই জগতের চিরন্তন সত্যের জ্ঞান আমরা বুদ্ধি থেকে পেতে পারি না। শুধুমাত্র স্বাজ্ঞিক উপায়ে আমরা এই প্রাণপ্রবাহ বা কালপ্রবাহকে উপলব্ধি করতে পারি।

নীতিবিদ্যায়ও স্বজ্ঞাবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়। নৈতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের কর্ম এবং আচরণের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে স্বজ্ঞা মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে। নীতিবিদ্যার ইতিহাসে আমরা দুধরনের স্বজ্ঞাবাদ দেখতে পাই। যথা : (১) বিশুদ্ধ স্বজ্ঞাবাদ (Pure intuitionism) এবং (২) মার্জিত স্বজ্ঞাবাদ (Modified intuitionism)। যখন কোনো বিষয়বস্তুকে স্বতঃস্ফূর্ত এবং বুদ্ধি বা চিন্তা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না তখন তাকে বিশুদ্ধ স্বজ্ঞাবাদ হিসেবে অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে স্বাজ্ঞিক উপায়ে কোনো বিষয়বস্তুকে যখন স্বতঃস্ফূর্ত এবং গভীর চিন্তন দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয় তখন তাকে মার্জিত স্বজ্ঞাবাদ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এছাড়াও অধ্যাপক সিজউইক এবং অধ্যাপক লিলি তিন প্রকার স্বজ্ঞাবাদের কথা বলেছেন। যথা : (১) প্রত্যক্ষগত স্বজ্ঞা বা ব্যক্তিগত স্বজ্ঞা, (২) নির্বিচার স্বজ্ঞাবাদ বা সাধারণ স্বজ্ঞাবাদ এবং (৩) দার্শনিক স্বজ্ঞাবাদ বা সর্বজনীন স্বজ্ঞাবাদ প্রভৃতি। তবে নীতিবিদ্যক স্বজ্ঞাবাদ এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক স্বজ্ঞাবাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র যেহেতু জ্ঞানতাত্ত্বিক স্বজ্ঞাবাদ তাই আমরা নীতিবিদ্যক স্বজ্ঞাবাদের বিস্তারিত আলোচনা এখানে করবো না।

জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত মতবাদ হিসেবে স্বজ্ঞাবাদ ত্রুটিমুক্ত মতবাদ নয়। হেনরী বার্গসোর চিন্তার বিশ্লেষণ থেকে আমরা বলতে পারি তিনি যে স্বজ্ঞার কথা বলেছেন সেখানে ব্যক্তিগত অনুভূতি মুখ্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। যেমন: সুমন এবং রুমনের অনুভূতি এক রকম নাও হতে পারে। তাই

ব্যক্তিগত অনুভূতি সর্বজন গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে এই ধরনের অনুভূতি সর্বজনীন জ্ঞান দিতে পারে না। তাছাড়া দর্শনের সত্যের লক্ষ্য থাকে সর্বজনীনতা অর্জন করা। এই স্বজ্ঞাবাদে আমরা বিজ্ঞানের সাথে এর বিরোধ লক্ষ করি। কেননা এখানে বিজ্ঞানের কোনো পদ্ধতি বা কোনো প্রকার বিচার-বিশ্লেষণকে গ্রহণ করা হয় না। তবে বার্গসো নিজে একজন স্বজ্ঞাবাদী হয়েও নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যুক্তি এবং বুদ্ধির সাহায্য নিয়েছেন। এখানেও আমরা বার্গসোর চিন্তায় স্ববিরোধিতা দেখতে পাই।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি জ্ঞান উৎপত্তির ক্ষেত্রে স্বজ্ঞাবাদ কোনো আদর্শ কিংবা সন্তোষজনক মতবাদ নয়। তবে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ধারাবাহিকতায় একটা দার্শনিক শৈলী এ মতবাদে পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া স্বজ্ঞার বাস্তবাতা সকলের কাছে স্পষ্ট না হলেও এর বাস্তবতা একেবারে অপ্রমাণিতও হয়ে যায়নি। তাছাড়া ব্যক্তিগত স্বাজ্ঞিক অনুভূতি কোনো বাস্তব স্বরূপের পরিবর্তনও করে না। ফলে এখানে কোনো ক্ষতির বিষয় নেই। সর্বশেষে আমরা অধ্যাপক আবদুল মতীনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে পারি, "....স্বজ্ঞা আমাদের সকল ব্যবহারিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় এবং বাস্তবসত্তার অন্তঃস্থ সারসত্তার গভীরে নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে বাস্তবতাসত্তাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।"[১৪৯]

জ্ঞানের উৎপত্তি বা উৎস সম্পর্কে উল্লিখিত চারটি প্রধান মতবাদ ছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস পরিলক্ষিত হয় যাকে প্রাধিকারবাদ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এখন সংক্ষেপে প্রাধিকারবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রাধিকারবাদ

মানবচিন্তার ইতিহাসে প্রাধিকারবাদ (Authoritarianism) জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। এটি এমন একটি মতবাদ যা প্রাধিকার বা আপ্তবাক্যকে জ্ঞান পাওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র উৎস হিসেবে বিবেচনা করে। প্রাধিকারবাদ অনুযায়ী বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয়, সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা থেকে জ্ঞান প্রাপ্তি ঘটে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ যেমন– কুরআন, বাইবেল, গীতায় উল্লিখিত বিভিন্ন আপ্তবাক্য থেকে জ্ঞান অর্জন করা। আবার কখনো রাষ্ট্রীয় নীতিমালা কিংবা মানুষের প্রবর্তিত নৈতিক নিয়মকানুনকে প্রাধিকারের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দর্শনের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় প্রাচীন যুগে এই প্রাধিকারের প্রবল জোয়ার পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগে প্রাধিকারের দাপট ছিল প্রবল। যেহেতু ধর্মীয় এবং নৈতিক ক্ষেত্রে এই মতবাদের প্রাবাল্য বেশি পরিলক্ষিত হয়, তাই মধ্যযুগের ধর্মীয় আধিপত্যকালে এই মতবাদের জয়জয়কার ছিল, ছিল সোনালি অধ্যায়। তবে আধুনিকযুগে এসে এর প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কমে

যায়। বলা যায় প্রধিকারবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আধুনিক দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক দিকের সাগ্রহই অগ্রযাত্রা পরিলক্ষিত হয়। আমরা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রয়োগ দেখলেও সাধারণ মানুষের পক্ষে কিন্তু এই প্রাধিকারের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বা ঈশ্বরের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল এই ধরনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা রাখে।[১৫০] প্রাধিকারবাদ নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য কর্তৃপক্ষ হিসেবে কোনো ক্ষমতা কিংবা কোনো কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকে। এই প্রাধিকারবাদে আমরা প্রামাণিক সাক্ষ্য কিংবা ঈশ্বরের বিধিবিধান সম্পর্কিত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে থাকি। এই প্রাধিকারবাদ প্রসঙ্গে Max Black তাঁর *Critical Thinking* গ্রন্থে বলেন,

> "Among the most useful tests of qualification applied to alleged authorities are *recognition by other authorities* (especially as evidenced by such official signs of respectability as titles, diplomas, and degrees), *agreement with other authorities, and special competence* (being in a position to know')"[১৫১]

প্রাধিকারের বিভিন্ন পদ্ধতি বা মানদণ্ড

এই প্রাধিকারবাদের ক্ষেত্রে এর যথার্থতা নির্ণয় এবং এর গুণাবলিও বিচারের জন্য কিছু পদ্ধতি বা মানদণ্ড পরিলক্ষিত হয়। যেমন– সংখ্যা, সময় কিংবা কালিক স্থিতি এবং খ্যাতি বা সুনাম। যখন বেশি সংখ্যক লোক কোনো একটি বিশ্বাসকে সত্য বলে মেনে নেয় তখন সেই মতটি সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। আমাদের সাধারণ নৈতিক বিশ্বাস এবং পূর্বপুরুষদের থেকে প্রাপ্ত বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু এখানে বেশি সংখ্যক লোকের সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয় তাই সংখ্যাকেই এখানে বিচারের মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে এই মানদণ্ডকে সন্তোষজনক হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, কেননা সংখ্যা কখনো সত্য-মিথ্যার বিষয়টি নির্ধারণ করতে পারে না।[১৫২]

সময় বা কালিক স্থিতির ক্ষেত্রে নতুনের তুলনায় বহু পুরাতন কোনো মতকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়। যুগ যুগ কিংবা শতক অতিক্রম করে আসা প্রতিষ্ঠানের নির্ভরযোগ্যতা সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক বেশি থাকে। এই কালিক স্থিতি সম্পর্কে অধ্যাপক মন্টেগু চমৎকার কথা বলেছেন যা এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি এই প্রাধিকারবাদ মূল্যায়নের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি দেখিয়েছেন যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

> ... there are three reasons for the strength of this test. First, it has a natural appeal to the sentiment of the authoritarion who is conservative in temperament. Secondly, the notion that just as an old man is more experienced and therefore wiser and more reliable, so also our ancestors of antiquity who have held their authority over great lengths of time are more trustworthy.

> Thirdly, the old theory that the remote past is the golden age of man in which truth was revealed direct from God, and the later history is only one of degeneration of truth.[১৫৩]

কিন্তু প্রাধিকারবাদের পক্ষে কালিক স্থিতির পক্ষে এসব মানদণ্ড শক্ত কোনো ভিত তৈরি করে না বরং ভাবাবেগের বিস্তৃতি ছাড়া কিছু নয়।

খ্যাতি বা সুনাম বলতে বোঝায় প্রাজ্ঞ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি কিংবা খ্যাতিমান লেখক বা বিজ্ঞানী প্রমুখের জীবদ্দশায় অর্জিত সাফল্যমণ্ডিত কাজের ফলাফলকে অনুসরণ করা। খ্যাতি, সাফল্য বা সুনামের জন্য আমাদের বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ ঘটানো হয়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ভালো কাজের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী জীবনে তা প্রয়োগ করা হয়। তবে খ্যাতি বা সুনামের উপর ভিত্তি করে কোনোকিছুকে সব সময় গ্রহণ করা দার্শনিক দৃষ্টিতে কোনোভাবে সমর্থনযোগ্য নয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত মতবাদ হিসেবে প্রাধিকারবাদ কোনো সন্তোষজনক মতবাদ নয়। বিজ্ঞান এবং দর্শনের বিচারমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা বিজ্ঞান পূর্ণাঙ্গ নিশ্চয়তামূলক সত্যের অনুসন্ধান করে অন্যদিকে দর্শন যুক্তি এবং বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া কোনো কিছুকে গ্রহণ করে না। তাই প্রাধিকারবাদকে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ না বলে বিশ্বাস সম্পর্কিত মতবাদ হিসেবে অভিহিত করাই উত্তম।

জ্ঞানের সমস্যা হিসেবে সংশয়বাদ

জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আলোচনার বিশ্লেষণ থেকে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। চূড়ান্ত বিচারে কীভাবে জ্ঞান সম্ভব হতে পারে? হলে কতটুকুই বা সম্ভব? জ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাসমূহ কী? জ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে দার্শনিক জ্ঞান অর্জন সম্ভব কি না, সত্তাকে জানা যায় কোন প্রক্রিয়ায়? এ সকল আলোচনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে অভিজ্ঞতাবাদী, বুদ্ধিবাদী, প্রাধিকারবাদী, স্বজ্ঞাবাদী এবং বিচারবাদী দার্শনিকগণ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বিরাজ করলেও জ্ঞান অর্জন সম্ভব। কিন্তু এর বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেন সংশয়বাদীরা। দর্শনের ইতিহাসে আমরা দেখি এই সংশয়বাদ জ্ঞানের নিশ্চয়তা এবং যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এই সংশয়বাদ বিচারযুক্ত দার্শনিকসুলভ পর্যবেক্ষণ বা দৃষ্টিভঙ্গি। এই সংশয়বাদকে আমরা একটি দার্শনিক জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসেবেও অভিহিত করতে পারি। জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাচীনকালে গ্রিস দেশে এই সংশয়বাদের উদ্ভব আমরা দেখতে পাই। সংশয়বাদের মূল বক্তব্য হলো ব্যক্তি নিরপেক্ষ কিংবা বিষয়ীগত (Subjective) জ্ঞান অর্জন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। খ্রিষ্টপূর্ব সেই চর্তুথ শতকে

প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে সংশয়বাদের উদ্ভব ঘটে। এই মতবাদ দাবী করে যে নিশ্চিত বা সঠিক জ্ঞান অর্জন অসম্ভব এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা পাওয়া গেলেও আমরা সে সম্পর্কে কিছু জানি না।[১৫৪]

সংশয়বাদ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, "ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কোনো জ্ঞান আছে বলে প্রমাণ করা যায় না। ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহের সুস্থতা, অসুস্থতা, ব্যক্তির অভাব অভিযোগ, সুখ- স্বাচ্ছন্দ্য, প্রচলিত বিশ্বাস, অবিশ্বাস, আচার আচরণ দ্বারা ব্যক্তির জ্ঞান প্রভাবান্বিত হয়। অথচ জ্ঞান বলতে পণ্ডিতগণ এমন কিছুকে বুঝাতে চান যা ব্যক্তির মন বা পারিপার্শ্ব, তার অবস্থা বা ইতিহাস কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু ব্যক্তি এবং অবস্থা-নিরপেক্ষ জ্ঞান যখন সম্ভব নয় তখন বিশ্বের বৃহৎ বৃহৎ সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা নিরর্থক।"[১৫৫]

নিশ্চিত বা সঠিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুর সাথে সত্যতার সঙ্গতি লক্ষ করা যায় এবং এই প্রকৃত জ্ঞানের ক্ষেত্রে সার্বিকতা ও অনিবার্যতা পাওয়া যায়। কিন্তু সংশয়বাদীরা মনে করেন এ জাতীয় জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়।[১৫৬] প্রাচীন যুগের সংশয়বাদিগণ আরও বলতেন যে জ্ঞানপিপাসা অসন্তোষের জন্ম দেয়। তাই মানবমনের প্রশান্তির জন্য জ্ঞান অর্জন থেকে বিরত থাকাই ভালো। বিভিন্ন দার্শনিক এই সংশয়বাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তবে প্রাচীনকালে সংশয়বাদের গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী অবস্থান লক্ষ করা যায় প্রোটাগোরাস, জর্জিয়াস, পিরহো, আরসেসিলাস, কারনিয়াডিস, ইনিসিডেমাস, সেক্সটাস, এমপিরিকাস প্রমুখ দার্শনিকদের মধ্যে। এসব সংশয়বাদীদের প্রশ্ন ছিল প্রচলিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিশ্চিয়তা কীভাবে আসবে? তাঁরা মনে করতেন জগৎ কিংবা বস্তুরাজি সম্পর্কে মানুষ যে জ্ঞান লাভ করতে পারে - এ জাতীয় যুক্তির পক্ষে অবস্থান নেওয়ার কোনো ভিত্তি নেই। উইকিপিডিয়াতে সংশয়বাদের স্বরূপ প্রসঙ্গে এভাবে বলা হয়েছে, "সংশয়বাদ শব্দটি অনেক বৃহৎ পরিসরে ব্যবহৃত হয়। যেকোনো কিছুকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মনোভাবকেই সংশয়বাদ বলা যেতে পারে। সাধারণ্যে বহুল প্রচলিত কোনো ধারণাকে সন্দেহ করা অর্থে সংশয়বাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোনো কিছুর নির্দেশ পেলে তাকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে না নিয়ে বরং সেই নির্দেশনাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করাই সংশয়বাদ।"[১৫৭] অর্থাৎ সংশয়বাদীরা জ্ঞানের দাবীকে সোজাসুজি নাকচ করে দেন।

জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় বিশেষ করে জ্ঞান কী সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তরে অন্বেষণ করতে গেলে আমাদের সংশয়বাদে প্রবেশ করতে হয়। তবে এখানে বলে রাখা ভালো সাধারণ সংশয়বাদ এবং দর্শনের সংশয়বাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। দর্শনের ক্ষেত্রে যখন সংশয়বাদ বলা হয় তখন মূলত এটি

একটি দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে পরিগণিত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, "দর্শনে সংশয়বাদ বলতে বোঝায় একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। এ দৃষ্টিভঙ্গি যাদের তাঁরা সাধারণ মানুষের, এমনকি বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের, জ্ঞানের দাবি সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন। এ মতে কোনো কিছুই সংশয়াতীত নয়।"[১৫৮]

অর্থাৎ সংশয়বাদের মূল বক্তব্য হলো ব্যক্তির পক্ষে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। সংশয়বাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন সোফিস্ট সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান প্রোটাগোরাস। তিনি বলেন, "Man is the measure of all things…." এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রোটাগোরাস ব্যক্তিসাপেক্ষ জ্ঞানের জয় গান করেছেন। আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক জ্ঞান ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই এই জ্ঞান সার্বিকতা এবং অনিবার্যতা দাবি করতে পারে না। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সোফিস্টদের চিন্তায় বিশেষ করে প্রোটাগোরাসের চিন্তায় সংশয়বাদের বীজ নিহিত। মধ্যযুগেও আমরা সংশয়বাদী চিন্তা দেখতে পাই। ধর্মীয় গোড়ামি এবং প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিপক্ষে অবস্থান নেয় সংশয়বাদ। আর আধুনিককালে হিউম, কান্ট প্রমুখ দার্শনিকদের চিন্তায় আমরা সংশয়বাদের আলোচনা দেখতে পাই। ডেভিড হিউম জন লকের অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্বের সমালোচনা করে বলেছেন যে, যদি অভিজ্ঞতাকে আমরা জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে একমাত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে ঈশ্বর, আত্মা, মন প্রভৃতি বিষয়কে আর স্বীকার করা চলে না। হিউম মনে করেন মানবজ্ঞানের সীমানা সীমিত অর্থাৎ অভিজ্ঞতার জগতে সীমাবদ্ধ। তাই সর্বজন স্বীকৃত নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

আধুনিক দর্শনের জনকখ্যাত ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্তের চিন্তায় সংশয়বাদের আলোচনা দেখা যায়। তবে দেকার্তের সংশয়বাদ 'পদ্ধতিগত সংশয়বাদ' হিসেবে পরিগণিত। দেকার্ত সংশয় পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নিঃসন্দিগদ্ধ, নিশ্চিত সত্যকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। এছাড়া ভারতীয় দর্শনের চার্বাক সম্প্রদায়ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া অন্যকিছু বিশ্বাস করতেন না। চার্বাকদের এই সংশয়বাদী চিন্তা থেকে অনুমান করা যায় প্রাচীন ভারতেও সংশয়বাদের অস্তিত্ব ছিল। মুসলিম দর্শনেও আল-গাযালির চিন্তায় নতুনভাবে সংশয়বাদ বিশ্লেষিত হয়েছে। তিনি সকল প্রকার জ্ঞানকে যাচাই করার কথা বলেছেন। এই যাচাই করার মানসিকতা তাঁকে সংশয়বাদের দিকে ধাবিত করে। যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করার পক্ষপাতি তিনি ছিলেন না, সবকিছুকেই সন্দেহের চোখে দেখতেন।[১৫৯] মোটকথা বিভিন্নযুগে বিভিন্নভাবে দর্শনের প্রায় সকল শাখায় সংশয়বাদের আলোচনা দেখা যায়।

সংশয়বাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিভিন্ন যুগে সংশয়বাদীরা বিভিন্নভাবে সংশয়বাদের পক্ষে নানা ধরনের যুক্তি প্রদান করেছেন।[১৬০] যেমন– ঐতিহাসিক, দ্বান্দ্বিক, শরীরবৃত্তিয় এবং মনস্তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তি। ঐতিহাসিক যুক্তির ক্ষেত্রে ভাববাদ এবং বস্তুবাদের মধ্যকার বিরাজমান দ্বন্দ্ব,

আস্তিক্যবাদ, নাস্তিক্যবাদ বিষয়ক বিতর্ক ইত্যাদি থেকে সংশয়বাদীরা দেখতে চান নিশ্চিত বা চূড়ান্ত জ্ঞানপ্রাপ্তি মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। জ্ঞানগত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বুদ্ধিও বেশ কিছু সমস্যা তৈরি করে যা সমাধানযোগ্য নয়। আবার এলিয়াটিক সম্প্রদায়ের যেনো (Zeno) যে গতি ও বহুত্বের কথা বলেছেন সেখানেও বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ "Many antinomies have been developed by philosophers and the sceptic refers to them to show that no solution is possible of the ultimate issues."[১৬১] আবার শরীরবৃত্তীয় যুক্তিতে বলা হয়েছে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য সন্দেহমুক্ত নয়। সংশয়বাদীরা মনস্তাত্ত্বিক যুক্তির সমালোচনা করে বলেন যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সঠিকতা এবং অনিবার্যতার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় তা মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[১৬২]

সংশয়বাদ দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে যথার্থ কোনো পদ্ধতি নয়। সংশয়বাদীরা প্রকৃত জ্ঞান পাওয়াকে উদ্ভট এবং সঙ্গত নয় বলে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে গিলবার্ট রাইলের বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন যে, বাস্তবে সচল মুদ্রা আছে বলে আমরা অচল মুদ্রার কথা বলতে পারি, তেমনি সত্যের দাবি আছে বলে মিথ্যার প্রসঙ্গও আসে। অর্থাৎ জ্ঞান সম্ভব বিধায় জ্ঞানের অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে বলা যায়।[১৬৩]

সংশয়বাদ সবকিছুর সম্ভাবনাকে অস্বীকার করার কারণে আমাদের জ্ঞানের পথই প্রকারন্তরে রুদ্ধ হয়ে যায় যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সংশয়বাদ যদি সমস্ত জ্ঞানকে সন্দেহ করে অর্থাৎ সম্ভাব্য মনে করে, তাহলে স্বয়ং সংশয়বাদও এ সন্দেহ থেকে দূরে নয়। তাছাড়া সংশয়বাদকে মেনে নিলে আমাদের বাস্তব জীবনের গতি থেমে যাবে। তাই এটাকে কোনো সুষ্ঠু বা স্বাভাবিক পদ্ধতি হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। তাই একে সন্তোষজনক মতবাদ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।

পরিশেষে বলা যায়, সংশয়বাদ নির্বিচারবাদী মতবাদ বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞাতাবাদের যে সমালোচনা এবং ত্রুটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে তার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞানের ধারণা এবং অন্ধবিশ্বাসের শেকড় উৎপাটনের যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা প্রশংসার দাবিদার। তাছাড়া মহাবিশ্বের প্রায় সবকিছু যদি আমরা বিনাবাক্যে মেনে নিতাম তাহলে এই বিশ্বে মানবজাতির এত উন্নতি সম্ভব হতো না। মানবজাতির সকল বিষয়ে অর্থাৎ পার্থিব এবং অপার্থিব বিষয়ে সংশয়বাদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাই বলে সংশয়বাদকে আমরা যথার্থ কোনো দার্শনিক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারি না।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমস্যা হিসেবে অজ্ঞেয়বাদ

দর্শনের ইতিহাসে অজ্ঞেয়বাদ বলতে বোঝায় এমন একটি দার্শনিক মতবাদ বা চিন্তন যেখানে ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা কিংবা পরমসত্তার অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সম্পর্কে জানা কখনো সম্ভব নয়। তবে সাধারণভাবে কিংবা সহজ করে বলতে গেলে অজ্ঞেয়বাদ জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানার অপারগতাকে নির্দেশ করে।[১৬৪] জ্ঞানের ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদের সাথে সংশয়বাদের বক্তব্যের মিল দেখতে পাই। তবে অজ্ঞেয়বাদ সংশয়বাদের মতো অত পুরাতন কোনো চিন্তা বা ধারণা নয়। ১৮৬৯ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী টমাস হেনরি হাক্সলি 'অজ্ঞেয়বাদ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তবে এর পূর্বে ভারতীয় দার্শনিক সঞ্জয় বেলটিঠপুত্তের 'পরকাল' সম্পর্কীয় চিন্তা ভাবনায় অজ্ঞেয়বাদের দেখা মেলে। পঞ্চম শতকের আরেকজন খ্যাতনামা সোফিস্ট দার্শনিক প্রোটাগোরাসের চিন্তায়ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রশ্নে অজ্ঞেয়বাদী চিন্তা পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া ঋগ্বেদেও পৃথিবীর সৃষ্টি প্রসঙ্গে অজ্ঞেয়বাদী চিন্তার সন্ধান মেলে।[১৬৫]

ধর্মীয় বিধিবিধানের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মানবজ্ঞানে জানা কী সম্ভব? এ প্রশ্নে মূলত অজ্ঞেয়বাদের উদ্ভব ঘটে। এ প্রসঙ্গে মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম এল. রোয়ের বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন, "অজ্ঞেয়বাদ হচ্ছে মানবজাতি কখনো ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা যে আছেন এটি শক্তভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হবে না আবার ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা যে নেই এটিও শক্তভাবে প্রমাণ করতে অসমর্থ থেকে যাবে।"[১৬৬]

উনিশ শতকে ধর্মীয় বির্তকের প্রেক্ষাপটে মূলত অজ্ঞেয়বাদের উদ্ভব ঘটে। এখানে মূলত এ বিষয়ে আলোচনা হয় যে, এই বিশ্ব বিধাত্রীর পরিচালকরূপে কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে কিনা সে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো মানবজ্ঞানে সম্ভব নয়। তবে বর্তমানে অজ্ঞেয়বাদের পরিসীমা বিস্তৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবদুল মতীনের বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন,

> "...currently, its meaning has extended beyond theology into metaphysics in general, and God has been replaced by reality. Thus, agnosticism is that position according to which knowledge of the ultimate reality is not possible but only of its phenomenal menifestations."[১৬৭]

আধুনিক যুগে লকের দর্শনে আমরা অজ্ঞেয়বাদী চিন্তার পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। লক মনে করেন আমরা বস্তুর গুণকে জানতে পারলেও বস্তুর আধারকে জানতে পারি না। তবে লকের

অজ্ঞেয়বাদকে বেশিদূর অগ্রসর হতে দেখা যায় না, কেননা তিনি ঈশ্বর এবং মুখ্য গুণসমূহের বিষয়ে প্রামাণ্য বা অনুমানগত জ্ঞানকে স্বীকার করেছেন।[১৬৮]

আরেকজন প্রখ্যাত দার্শনিক হিউমের চিন্তায়ও আমরা অজ্ঞেয়বাদী চিন্তার সন্ধান পাই। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *An Enquiry Concerning Human Understanding* (1748) গ্রন্থে মানুষের পক্ষে আসলে কোনো জ্ঞান অর্জন সম্ভব কি না, এ জাতীয় মৌলিক প্রশ্নের আলোচনা পাওয়া যায়।[১৬৯] তবে অজ্ঞেয়বাদের বিস্তৃত বক্তব্য পাওয়া যায় প্রখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের চিন্তায়। অজ্ঞেয়বাদ প্রসঙ্গে কান্টের বক্তব্য ছিল এরূপ,

> ... বস্তুর জ্ঞান সংবেদনবৃত্তির আকার ও বোধ বোধশক্তির ধারণার মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। কিন্তু এসব আকার ও বোধশক্তির ধারণার মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। কিন্তু এসব আকার ও ধারণার অভিজ্ঞতাপূর্ব এবং বিষয়ীগত হওয়ার কারণে অতীন্দ্রিয় সত্তা (noumena) বা বস্তুসত্তা (Things-in-themselves) অজ্ঞেয় থেকে যায়।[১৭০]

অর্থাৎ কান্টের মতে মানুষ নিজের জ্ঞানসূত্র কিংবা ক্যাটিগরি ছাড়া অন্যকিছু জানতে পারে না। আধুনিক অজ্ঞেয়বাদের আলোচনায় ঈশ্বর কিংবা ধর্মীয় ক্ষেত্র ছাড়াও প্রাকৃতিক বিধান, সামাজিক বিকাশধারা প্রভৃতি মানুষের কাছে অজ্ঞেয়।

তবে পরিশেষে বলা যায় যে, অজ্ঞেয়বাদ জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কোনো মতবাদ হতে পারে না। কেননা স্রষ্টার সৃষ্টিজগৎসহ অন্যান্য বিষয়ে অজ্ঞেয়বাদীদের মত গ্রহণ করলে মানবজীবনে হতাশা, স্থবিরতা এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। তাই এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অজ্ঞেয়বাদকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। তিনি তাঁর প্রখ্যাত *এ্যান্টিডুরিং*- গ্রন্থে অজ্ঞেয়বাদের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদান করেছেন। অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম অজ্ঞেয়বাদের বিরুদ্ধে এঙ্গেলস এর চিন্তা তুলে ধরেন এভাবে, "তাঁর মতে বস্তুকে মানুষ আদৌ জানতে পারে কিনা, এ প্রশ্ন নিয়ে মানুষের মাথা ঘামাবার দিন শেষ হয়ে গেছে। কারণ মানুষ বস্তুকে কেবল তাত্ত্বিকভাবেই জানছে না। বাস্তবভাবে সে বস্তুকে স্পর্শ করছে, বিশ্লেষণ করছে, তার অন্তর্নিহিত বিধি-বিধানকে জানছে এবং জ্ঞাত সেই বিধানকে প্রয়োগ করে বস্তুকে সে নতুনভাবে গঠনও করছে। এর পরে জ্ঞনের ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদের আর অবকাশ থাকে না বলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অভিমত পোষণ করে।"[১৭১] এছাড়া ভাববাদী দার্শনিকরা অজ্ঞেয়বাদের কঠোর

সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে হেগেল, কেয়ার্ড প্রমুখের চিন্তায় আমরা অজ্ঞেয়বাদের বিরোধিতায় বিষয়টি দেখতে পাই।[১৭২]

জ্ঞানের সম্ভাব্যতা/ সম্ভাবনা

জ্ঞান সম্পর্কীয় মতবাদের ধারাবাহিক আলোচনার সবশেষে বলা যায় যে, জ্ঞান সম্ভব। কেননা সংশয়বাদে নিজেই উভয়সংকট অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই মতবাদকে প্রমাণও করা যায় আবার অপ্রমাণও করা য়ায়। আবার অজ্ঞেয়বাদ কিংবা আপেক্ষিতাবাদের কথা যদি বলি তাহলে বলতে হয় এ দুটো মতবাদ প্রত্যক্ষণের প্রকৃতির সমন্বীয় অন্যান্য মতবাদের ওপর নির্ভর করে। তাছাড়া স্বাভাবিকভাবে এ সকল মতবাদকে গ্রহণ করা হয় না।[১৭৩] তাই জ্ঞানতাত্ত্বিক বিভিন্ন মতবাদের বিশ্লেষণ এবং আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি জ্ঞান অর্জন সম্ভব এবং এই সম্ভাবনামূলক জ্ঞান দিয়ে আমরা আমাদের বাস্তবজীবনকে পরিচালিত করতে পারি।

উপসংহার

বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব উপভোগ করছে তার জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষমতার কারণে। বিশ্বে বিরাজমান প্রাণিকুলের মধ্যে মানুষ তার অনন্য সাধারণ গুণাবলি বা শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে তার চিন্তার কারণে। পৃথিবীতে আর কোনো প্রাণী মানুষের মতো করে চিন্তা করতে পারে না। আর এই চিন্তার অপর নামই হচ্ছে জ্ঞান। মানুষ তার চিন্তাশক্তির বলে যখন পড়ালেখার আবিষ্কার করে সেই থেকে সে তার চিন্তার স্বাক্ষর পৃথিবীর বুকে রাখতে শুরু করে। চিন্তাজগতে মানুষের কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কিত পথের অনুসন্ধানকে দর্শন নামে অভিহিত করা হয়। দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম কাজ হলো জ্ঞানানুসন্ধান। মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের মূলে কাজ করে এই জ্ঞান। এই জ্ঞানের সৌধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি, প্রগতি, সার্থকতা এবং সফলতা। জ্ঞানের সফল ফল হিসেবে মানুষ আজ বিশ্বের বুকে তার শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে যা দৈহিকভাবে বহুগুণ শক্তিশালী অন্যকোনো প্রাণী পারেনি। জ্ঞান এবং জ্ঞানচর্চার ইতিহাসকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে মানুষের আগ্রহ এবং কৌতূহল। আর দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞান, জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস, উৎস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে।

চিন্তাসম্পন্ন জীব বলে মানুষের পক্ষে প্রাণীর মতো জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। সে সুন্দর করে বাঁচতে গিয়ে সম্মুখীন হয় নানা প্রশ্নের। আর এসব প্রশ্নের সমাধানে সে জ্ঞানের অন্বেষণে পা বাড়ায়।

দর্শনশাস্ত্রের মধ্য দিয়ে সে জীবন জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটনে সম্মুখপানে ছুটে চলে। তাই মানুষের সমগ্র জীবনবোধের পরিপূর্ণ রূপায়ণে জ্ঞানের পরিপক্ব আলোচনা আবশ্যক।

মানবসভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি বিভিন্ন সভ্যতার বিকাশ এবং উৎকর্ষ সাধনে মানুষ তার সাধনালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে গেছে। সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল থেকে শুরু করে দেকার্ত, লক, কান্ট, রাসেল, ম্যুর, হেগেল প্রমুখ দার্শনিক জ্ঞানের স্বরূপ এবং উৎস সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, "প্রতীচ্যের জ্ঞানতাপস সক্রেটিস ও তাঁর সুযোগ্য ভাবশিষ্য প্লেটো থেকে শুরু করে সমকালীন যুগের প্রায় সব দার্শনিকই 'ফিলসফি' অর্থে এই জ্ঞানপ্রীতি বা জ্ঞানানুরাগকেই নির্দেশ করেছেন।"[১৭৪]

আলোচ্য অধ্যায়ের আলোচনা শেষে আমরা বলতে পারি মানবজ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কীয় চিন্তা-ভাবনা বেশ কিছু জটিল দার্শনিক সমস্যার জন্ম দিয়ে থাকে। এসব সমস্যা নিয়েই জ্ঞান সম্পর্কীয় মতবাদ বা জ্ঞানবিদ্যার বিষয়বস্তু গঠিত। জ্ঞানতত্ত্ব জ্ঞানের পরিধি, জ্ঞানের মানদণ্ড, মানদণ্ড সম্পর্কিত সমস্যা এবং মানবজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় নিয়েও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে। এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যায়,

> "Human knowledge must have some connection with mental powers, knowledge must be a state of mind, or a mental disposition of some kind. It is rather like belief, though belief, as we have seen, can be either true or false whereas knowledge must be true."[১৭৫]

মূলত মানুষের জ্ঞানতাত্ত্বিক অন্বেষণ এবং প্রয়োজনের তাগিদেই জ্ঞানের উৎপত্তি, স্বরূপ, সম্ভাবনা, উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। তাই দর্শনশাস্ত্রে পৃথক শাখা হিসেবে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে ড. জি. সি. দেব যথার্থই মন্তব্য করেছেন,

> জ্ঞানের উৎপত্তি বিশ্লেষণ না করে কোন্ জ্ঞান বিশ্বাসযোগ্য আর কোনো জ্ঞান বিশ্বাসযোগ্য নয়, তা জানা সহজ নয়। আর কোনো জ্ঞান বিশ্বাসযোগ্য তাই যদি আমরা বুঝতে না পারি, তাহলে যে তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা দর্শনের উদ্দেশ্য, তার সম্বন্ধে ভালো ধারণাই আমরা করতে পারব না, তা লাভ করা তো দূরের কথা। সুতরাং তত্ত্ব নির্ণয়ের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যই জ্ঞান-উৎপত্তিবাদ আলোচনা করা প্রয়োজন।[১৭৬]

সর্বশেষে বর্তমান অধ্যায়ের বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা-পর্যালোচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাই বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতির পাশাপাশি

মানুষের জীবনকে সুন্দর, সার্থক এবং সফল করতে হলে দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার কোনো বিকল্প নেই।

তথ্যনির্দেশ

১. আবুল কাসেম ফজলুল হক, "উত্তরাধুনিকতাবাদ আধুনিকতাবাদ ও রেনেসাঁস", *প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা*, চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল, ২০১৪, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ২২

২. আলী আসগর, "জাতীয় জীবনে দর্শনের ভূমিকা", *কার্যবিবরণী; বাংলাদেশ দর্শন সমিতি*, অষ্টম সাধারণ সম্মেলন, (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯০), পৃ. ৬৪

৩. Bertrand Russell, *What I Believe,* 2nd Edition, (London : Routledge, 2004), P.

৪. সরদার ফজলুল করিম, *দর্শনকোষ*, পঞ্চম সংস্করণ, (ঢাকা : প্যাপিরাস, ২০০৬), পৃ. ২৫৩-৫৪

৫. V. Afanasyev, *Marxist Philosophy,* Third Revised Edition, (Moscow : Progress Publishers, 1968), p. 156

৬. গোবিন্দচন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্যা-সার*, (ঢাকা : অধুনা প্রকাশন, ২০০৪), পৃ. ১১৫

৭. রমাপ্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্ত্তী, *পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা*, তৃতীয় সংস্করণ, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯২), পৃ. ৯৬

৮. S.C. Chatterjee, *The Nyaya Theory of Knoweledge,* Reprinted, (Calcutta : University of Calcutta 1978), p. 12

৯. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, অনুবাদ, আবদুল মতীন ও প্রদীপ রায়, (ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৭), পৃ. ১৩

১০. রমাপ্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্ত্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১-১০৪

১১. David Hume, *A Treatise of Human Nature,* ed., by L. A. Selby- Bigge, (Oxford : At the Clarendon Press, 1987) P. ১। অনুবাদ, আবু তাহা হাফিজুর রহমান, *মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮১), পৃ. ৩

১২. কালী প্রসন্ন দাস, *ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা: চার্বাক ও হিউম*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ১৭৯

১৩. David Hume, *op.cit.*, pp. 7-8

১৪. *Ibid,* pp. 2-3

১৫. রমা প্রসাদ দাস, *হিউমের ইন্‌ক্যয়ারি: একটি উপস্থাপনা*, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১), পৃ. ১৪

১৬. David Hume, *An Enquiry Concerning Human Understanding,* (New York : Coller Books, 1962), p. 5

১৭. মো: আবদুর রশীদ, "জানা এবং বিশ্বাস করা", *কার্যবিবরণী; বাংলাদেশ দর্শন সমিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

১৮. মো: আবদুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

১৯. নিখিলেশ বন্দোপাধ্যায়, *ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের কিছু জ্ঞানতাত্ত্বিক ও অধিবিদ্যাগত সমস্যা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, (কলকাতা : সদেশ, ২০১২), পৃ. ৬৭

২০. নিখিলেশ বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

২৫. মো: আবদুর রশীদ, অনুদিত, *জ্ঞানতত্ত্ব*, পুনর্মুদ্রণ, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ১৭৩

২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭

২৭. মো: আবদুর রশীদ, "জানা এবং বিশ্বাস করা", *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

২৮. D.W. Hamlyn, *The Theory of Knowledge,* (London : Macmillan, 1970), p. 79

২৯. *Ibid,* p. 86

৩০. নিখিলেশ বন্দোপাধ্যায়, *বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন*, পুনর্মুদ্রণ, (কলকাতা : সদেশ, ২০১৬),পৃ. ১২৮
৩১. হাসান আজিজুল হক, *সক্রেটিস*, (ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৩), পৃ. ৫৭
৩২. Abdul Matin, *An Outline of Philosophy,* (Dhaka : Adhuna Prakashan, 2006), p. 91
৩৩. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩
৩৪. আর. এম. চিজম, *জ্ঞানবিদ্যা*, অনুবাদ, মো: আবদুর রশীদ, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯), অনুবাদ প্রসঙ্গ, পৃ. আট
৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. নয়
৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. দশ
৩৭. মো: আবদুর রশীদ, অনূদিত, *জ্ঞানতত্ত্ব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১
৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১
৩৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১
৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮
৪১. রমা প্রসাদ দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮
৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫
৪৩. মো: আবদুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯
৪৬. George Thomas White Patrick, *Introduction to Philosophy,* Revised Edition, (Delhi : Surjeet Publications, 1978), p. 325
৪৭. https: //www.britannica.com/topic/epistemology
৪৮. https: //bn.m.wikipedia.org/wiki/জ্ঞানতত্ত্ব
৪৯. D.W. Hamlyn, *op.cit.*, p. 8
৫০. George Thomas White Patrick, *op.cit.*, p.325
৫১. *Ibid*, p.325
৫২. Harold H. Titus, *Living Issues in Philosophy*, Fourth Edition, (New Delhi : Eurasia Publishing House (p.), Ltd, 1968), p. 21
৫৩. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, অনুবাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮
৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮
৫৫. Alan Goldman, "Epistemology", John Shand (ed.), *Fundamentals of Philosophy*, (London and New York : Routledge, 2003), p. 11
৫৬. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, অনুবাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১
৫৭. সরদার ফজলুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫
৫৮. J.N. Sinha, *Introduction to Philosophy*, Revised Sixth Edition, (Calcutta : Sinha Publishing House, 1971), p.42
৫৯. F. Thily, *A History of Philosophy*, (Allahabad : Central Book Depot, 1975), p. 56
৬০. Paul Edwards (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*, (New York : Macmillan Publishing Co. Inc., and Free Press, 1972), Vol. 1, p. 9
৬১. W.T. Stace, *A Critical History of Greek Philosophy*, (New York : Macmillan, St. Martin's Press, 1972), p. 109
৬২. F. Thily, *op.cit.*, p.57
৬৩. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২

৬৪. হাসান আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

৬৫. রাশিদা আখতার খানম, "সক্রেটিসের নীতিদর্শন", *দর্শন ও প্রগতি*, ১ম ও ২য় সংখ্যা, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯৭), পৃ. ৭৩

৬৬. J.V. Luce, *An Introduction to Greek Philosophy*, (London : Thomas and Hudson, 1992), p. 91

৬৭. A. S. Bogomolov, *History of Ancient Philosophy,* (Moscow : Progress Publishers, 1985), p. 176

৬৮. F. Thilly, *op.cit.*, p.77

৬৯. Robert Ackerman, *Theories of Knowledge*, (Bombay : Tata Mc Graw- Hill Publishing Co. Ltd.,), p. 31

৭০. নীরদবরণ চক্রবর্তী, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদ, ১৯৮৮), পৃ. ১০

৭১. Paul Edwards (ed.), *op.cit.*, p. 12

৭২. Robert Ackerman, *op.cit.*, p. 57

৭৩. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

৭৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

৭৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

৭৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০

৭৭. F. Thilly, *op.cit.*, p.190

৭৮. Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, Reprinted, (London : Routledge, 1995), p. 351

৭৯. শ্রীতারকচন্দ্র রায়, *পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস: প্রথম খন্ড*, পুনর্মুদ্রণ, (কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫), পৃ. ২৫৫

৮০. Bertrand Russell, *op.cit.*, p.547

৮১. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১

৮২. F. Thilly, *op.cit.*, p.229

৮৩. আমিনুল ইসলাম, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন*, পুনর্মুদ্রণ, (ঢাকা : শিখা প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৩৫৬

৮৪. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫

৮৫. Abdul Matin, *op.cit.*, p. 73

৮৬. John Hospers, *An Introduction to Philosophical Analysis*, Sixth Reprinted, (New Delhi : Allied Publishers Private Ltd., 1986), p. 133

৮৭. রমা প্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

৮৮. Abdul Matin, *op.cit.*, p. 77

৮৯. Harold H. Titus, *op.cit.*, p. 30

৯০. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

৯১. রমা প্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭-১৩৮

৯২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮

৯৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

৯৪. F. Thilly, *op.cit.*, p. 304, (মূলঃ Descartes, *Meditations* II)

৯৫. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮

৯৬. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০

৯৭. Abdul Matin, *op.cit.*, p. 78

৯৮. James K. Feibleman, *Understanding Philosophy*, (Bombay : Jaico Publishing House, 1990), p. 103

৯৯. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০

১০০. J.N. Sinha, *op.cit.*, p. 42

১০১. Stumpf, S. E., Fieser J., *Socrates to Sartre and Beyond*, (New York : Mc Gra Hill, 2008), p. 207

১০২. Stump, S. E., Fieser J., *op. cit.*, p.207

১০৩. Bertrand Russell, *op.cit.*, p. 542

১০৪. Roger Scruton, *A Short History of Modern Philosophy*, Second Edition, (London and New York : Routledge, 1995), p. 47

১০৫. গোবিন্দচন্দ্র দেব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫

১০৬. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

১০৭. গোবিন্দচন্দ্র দেব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

১০৮. Abdul Matin, *op.cit.*, p. 79

১০৯. F. Thilly, *A History of Philosophy*, 3rd ed., (Allahabad : Indian University Press, 1956) p. 335

১১০.D.W. Hamlyn, *op.cit.*, p. 36

১১১.Harold H. Titus, *op.cit.*, p. 28

১১২.আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

১১৩. John Locke, *Essay Concerning Human Understanding*, ed., by A. Seth, (Oxford : Pringle Pattison, 1924), Book IV, Chap. 1

১১৪.গোবিন্দচন্দ্র দেব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

১১৫. আমিনুল ইসলাম, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, চতুর্থ সংস্করণ, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫), পৃ. ১৩১

১১৬. John Locke, *op.cit.*, Book II, Chap. VIII

১১৭.বার্ট্রান্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস* (পুস্তক-৩ : আধুনিক দর্শন : দ্বিতীয় অংশ : রুশো থেকে বর্তমানকাল), অনুবাদ, প্রদীপ রায়, (ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৮), পৃ. ১১৯

১১৮. William Kelley Wright, *A History of Modern Philosophy*, Twenty-Seeond Printing, (New York : The Macmillan Company, 1967), p. 157

১১৯. *Ibid*, p. 158

১২০. *Ibid*, p. 159

১২১.এম.এন. রায়, *দর্শন ও বিজ্ঞান*, পৃ. ১৪১

১২২. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬

১২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭

১২৪. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

১২৫. নীরদবরণ চক্রবর্তী, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (প্লেটো. অ্যারিস্টটল)*, চতুর্থ মুদ্রণ, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০১), পৃ. ৫৩

১২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

১২৭. David Hume, *A Treatise of Human Nature (Book One)*, Third Impression, Ed., D.G.C. Macnabb, (London and Glasgow : Fontana/ Collins, 1970), p. 45

১২৮. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

১২৯. Abdul Matin, *op.cit.*, p. 86

১৩০. Norman Kemp Smith (ed.), *Immanuel Kant's Critique of Pure Reason*, (London : Macmillan and Co., Limited, 1934), p. 38

১৩১. John Kemp, *The Philosophy of Kant*, Reprinted (London : Oxford University Press, 1979), p. 16

১৩২. Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, (London : Cambridge University Press, 1999), p. 41

১৩৩. রাসবিহারী দাস, *কান্টের দর্শন*, তৃতীয় পর্ষৎ মুদ্রণ, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৩), পৃ. ১০

১৩৪. মো: আব্দুল মুহিত, *ইমানুয়েল কান্টের জ্ঞানতত্ত্ব ও নীতিদর্শন*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০২০), পৃ. ৪৫

১৩৫. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

১৩৬. Laurence Bonjour, *The Structure of Empirical Knowledge*, (USA : Harvard University Press, 1985), p. 193

১৩৭. ইমানুয়েল কান্ট, *নৈতিকতার দার্শনিকতত্ত্বের মূলনীতি*, আনুবাদ, সাইয়েদ আবদুল হাই, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮২), পৃ. ১৯

১৩৮. Abdul Matin, *op.cit.*, p. 87

১৩৯. মো: আব্দুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

১৪০. William Lillie, *An Introduction to Ethics*, (London : University Paperbacks, 1966), p. 118

১৪১. John Hospers, *An Introduction to Philosophical Analysis*, Sixth Reprinted, (New Delhi : Allied Publishers Private Ltd., 1986), p.136

১৪২. সরদার ফজলুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭

১৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭

১৪৪. Harold H. Titus, *op.cit.*, p. 32

১৪৫. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

১৪৬. Harold H. Titus, *op.cit.*, p. 33

১৪৭. আমিনুল ইসলাম, *জগৎ জীবন দর্শন*, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১), পৃ. ১৫৮

১৪৮. Bertrand Russell, *op.cit.*, p. 758

১৪৯. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১

১৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

১৫১. Max Black, *Critical Thinking*, (New York : Prentice-Hall, 1952), p. 256

১৫২. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

১৫৩. Abdul Matin, *op.cit.*, p. 75

১৫৪. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০

১৫৫. সরদার ফজলুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৫

১৫৬. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০

১৫৭. https: //bn.m.wikipedia.org

১৫৮. রমাপ্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্ত্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩

১৫৯. M.M. Sharif, *A History of Muslim Philosophy*, ed., Vol.1, (Delhi : Low Price Publications, 1981), p. 588

১৬০. Abdul Matin, *op.cit.*, p. 107

১৬১. *Ibid*, p. 107

১৬২. *Ibid*, p. 107

১৬৩. রমাপ্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্ত্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪

১৬৪. সরদার ফজলুল করিম, *দর্শন কোষ*, পৃ. ৩১

১৬৫. https: //bn.m.wikipedia.org

১৬৬. *Ibid*

১৬৭. Abdul Matin, *op.cit.*, p. 109

১৬৮. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩

১৬৯. সরদার ফজলুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

১৭০. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩

১৭১. সরদার ফজলুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

১৭২. Abdul Matin, *op.cit.*, p. 109

১৭৩. *Ibid*, pp. 112-113

১৭৪. এম. মতিউর রহমান, "*দর্শনচিন্তার রূপস্বরূপ: ভারতীয় ও প্রতীচ্য*", *প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা*, চতুর্থ সংখ্যা, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : সংস্কৃত বিভাগ এপ্রিল, ২০১৪), ঢাকা, পৃ. ৮২

১৭৫. Jenny Teichman and Katherine C. Evans, *Philosophy: A Beginner's Guide*, Second Edition, (U.K. : Blackwell Publishers Ltd.), 1998, p. 255

১৭৬. গোবিন্দচন্দ্র দেব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব

ভারতীয় জীবন-জিজ্ঞাসার মূলে রয়েছে বিভিন্ন মুনি-ঋষির চিন্তন, আত্মচেতনা এবং সত্যের উপলব্ধিবোধ। এসব মুনি-ঋষি এবং চিন্তকদের নিয়ে গড়ে উঠেছে ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়। ফলে ভারতবর্ষে আমরা দেখতে পাই অনেকান্ত দর্শনের। জগৎ-জীবন সম্পর্কীয় জিজ্ঞাসা এবং অন্বেষা মানবজাতির স্বভাবগত বিষয়। জগৎ-জীবনকেন্দ্রিক বিষয়াদির প্রচেষ্টা মানবজাতির ইতিহাসের প্রথম দিক থেকেই পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় দর্শন জগৎ ও জীবন সম্পর্কীয় এক সর্বব্যাপক উদারশাস্ত্র। কেননা ভারতবর্ষের পরিবেশ ছিল দর্শন এবং সংস্কৃতিচর্চার পক্ষে সহায়ক। ভারতের একদিকে অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালা এবং অন্যদিকে সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, যার ফলে ভারতবর্ষ বহুকাল বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দূরে ছিল। এছাড়া ভারতের উদার প্রকৃতির কারণে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো, ফলে মানুষের জীবন-সংগ্রাম অনেকটা সহজ ছিল। তাই ভারতীয়দের কাছে জগৎ-জীবন কখনই কঠিন বলে মনে হয়নি। কেননা ভারতীয়দের অস্তিত্বের জন্য জীবন সংগ্রামে তেমন ব্যস্ত থাকতে হয়নি, ফলে তারা উচ্চতর জীবনের চিন্তা, আত্মিক জীবনের চিন্তা-ভাবনা করতে পেরেছিলেন। বস্তুর তাৎপর্যগত দিকের বিশ্লেষণে তাদেরকে সহযোগিতা করছিল প্রাকৃতিক এবং বৌদ্ধিক কারণ। আর এর পেছনে কাজ করছিল তাদের যুক্তিপ্রবণ মানসিকতা। জানা বা বোঝার মতো বিশুদ্ধতম আনন্দের প্রতি ভারতীয়দের ছিল তীব্র অনুরাগ।

অর্থাৎ ভারতীয়দের জানা এবং বোঝার প্রতি আগ্রহ ছিল বেশ গভীর। ভারতীয় দার্শনিকরা মনে করেন জ্ঞানেই মুক্তি। কর্ম দ্বারা জগৎ-সংসারে জীব বদ্ধ হয় আর জ্ঞান দ্বারা জীব বন্ধনমুক্ত হয়। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে 'জ্ঞান' শব্দটি ব্যাপক এবং বিস্তৃত অর্থকে ধারণ করেছে। ভারতীয় দর্শনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় হচ্ছে জ্ঞানের আলোচনা।[১] এই দর্শন প্রমা, সংশয়, ভ্রম এবং যেকোনো প্রকার স্মৃতি এবং অনুভবকে জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিভাবে, কোনো উপায়ে আমরা যথার্থ জ্ঞান পেতে পারি এবং একটি জ্ঞান কখন যথার্থ জ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি পায় এই জাতীয় প্রশ্ন ভারতীয় দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

জ্ঞান

চার্বাক দর্শন মতে প্রত্যক্ষণ জ্ঞানের একমাত্র উৎস। অন্য কোনো উৎসকে তারা স্বীকার করেন না। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাথে মনের সংযোগ থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। জৈন দার্শনিকরা মনে করেন পদার্থের

যথাযথ ধারণাকেই জ্ঞান বলা হয়। যথার্থ জ্ঞান দ্বারা মানুষের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। জাগতিক বস্তুর সাথে যখন মানুষের সঠিক পরিচয় ঘটে তখন জ্ঞান হয়ে থাকে।

ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানের স্বরূপ

ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানের স্বরূপ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞানের স্বরূপ প্রসঙ্গে ড. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভাকরের মত এভাবে উল্লেখ করেছেন,

> প্রভাকর মনে করেন, জ্ঞান স্বপ্রকাশ। জ্ঞান-ক্রিয়ায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান যুগপৎ ব্যক্ত হয়। জ্ঞান ব্যতিরেকে আত্মা এবং বাহ্য বিষয়ের কোনো পরিচয়ই জানা যায় না। জ্ঞানের তিনটি দিক : অহংবৃত্তি, বিষয়বৃত্তি এবং স্বসংবৃত্তি। বিষয়ী চৈতন্যজ্ঞানের কর্তাস্বরূপ। একে 'অহংবৃত্তি' বলা হয়। বিষয়বৃত্তি অর্থ 'বিষয়-জ্ঞান'। স্বতোবোধ্য বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে স্বসংবৃত্তি বলা হয়। প্রভাকরের এই তত্ত্বটির নাম ***ত্রিপুটীপ্রত্যক্ষবাদ***।[২]

আবার কুমারিল মনে করেন জ্ঞানের স্বরূপের ক্ষেত্রে আমাদের সরাসরিভাবে কোনো প্রত্যক্ষ হয় না। জ্ঞানকে কুমারিল পরোক্ষপদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জ্ঞানকে তিনি অনুমানমূলক বলেছেন। জ্ঞান প্রসঙ্গে কুমারিলের মত ছিল এরূপ, "জ্ঞান-ক্রিয়ায় আত্মা মন এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত হয়। বিষয়টি জ্ঞাত হইলে নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানকার্যটিতে কর্তা, কর্ম, কারণ এবং ফল সম্পর্কে যে চৈতন্য হয় তাহাই জ্ঞান।"[৩] জ্ঞান সম্পর্কে কুমারিলের এই চিন্তা 'জ্ঞাততাবাদ' হিসেবে পরিচিত। তবে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনায় জ্ঞানের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "কোনো একটি বাক্য বা প্রতিজ্ঞাবাক্য অসত্য বা কোনো একটি প্রমাণ বা প্রামাণ্য অবৈধ ও অনাবশ্যক প্রমাণিত হইলে উহাতে পূর্বানুভূত বিশ্বাস বা অভিমত প্রত্যাহার করা হয়। পর্যাপ্তভাবে ও আবশ্যিকভাবে প্রমাণিত তথা যাচাইকৃত সত্য বিশ্বাসই জ্ঞান।"[৪] প্রমার যথার্থতা এখানে সত্যতার দ্বারা নিরূপিত হয়। বিশ্বাস এক্ষেত্রে সত্যজ্ঞান অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্নিহিত মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে কাজ করে থাকে। আমাদের সত্য বিশ্বাস এবং প্রমা এখানে একে অন্যের পরিপূরক। তবে জ্ঞানের স্বরূপ প্রসঙ্গে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে,

> All knowledge involves the knower, the known object, and the knowledge at the same identical moment. All knowledge whether perceptual, inferential or of any other kind must necessarily reveal the self or the knower directly.[৫]

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ

বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার মূলে রয়েছে মূলত জ্ঞানগত সমস্যা অর্থাৎ জ্ঞানের অভাব। তাই এসব বহুবিধ সমস্যা সমাধানে জ্ঞানের বিকল্প নেই। আর ভারতীয় দর্শনের জীবনবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক

আলোচনা বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সংকট ও বিপর্যয়রোধে রাখতে পারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। তাই ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা সময়ের প্রেক্ষাপটে একটি যথার্থ আলোচনা। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

পাশ্চাত্য দর্শনের মতো ভারতীয় দর্শনেও বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। আর জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা ভারতীয় দর্শনে এক অনবদ্য ও অবিস্মরণীয় স্থান দখল করে আছে। ভারতীয় দর্শনের বিশেষ করে প্রচলিত নয়টি সম্প্রদায়ের আলোচনায় জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আস্তিক এবং নাস্তিক সম্প্রদায়ের দর্শন আলোচনাতে একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। ভারতীয় দার্শনিকগণ জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ের আলোচনা যে নিরর্থক তা ভালোভাবে বুঝে ছিলেন। যথার্থ জ্ঞান কী, যথার্থ জ্ঞানের উৎস কী? এবং কিভাবে একটি জ্ঞান যথার্থ বলে গৃহীত হয় – এ সকল প্রশ্ন ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাই ভারতীয় দর্শনেই পরিলক্ষিত হয় জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনার সর্বজনীনতা ও ব্যাপকতা যা পাশ্চাত্য দর্শনে দেখা যায় না। সেই প্রাচীন যুগে ভারতীয় দার্শনিকেরা কিভাবে জ্ঞানতত্ত্বের ওপর এত জোর দিলেন তা নতুন করে দার্শনিক চিন্তা, আলোচনা, সমালোচনা ও বিচারবিশ্লেষণের দাবি রাখে। আর এ সকল বিষয়কে বিচারমূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরাই হবে দ্বিতীয় অধ্যায়ের কাজ।

ভারতীয় দর্শন শাশ্বত সত্যের সন্ধান করেছে। আর সত্যানুসন্ধানের অপর নামই হলো জ্ঞানান্বেষণ। বহির্জগতের পরিবর্তে অন্তর্জগতের দিকে ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। অন্তঃসত্তার উপলব্ধির মাধ্যমে তারা বাইরের জগৎকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। 'আত্মানং বিদ্ধি' বা 'নিজেকে জান' – এ সত্য প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে। জীবনবাদী চিন্তাভাবনা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং জ্ঞান অন্বেষণের স্পৃহা ভারতীয় দর্শনকে অনন্য মর্যাদা প্রদান করেছে। বিশেষ করে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। কেননা, ভারতীয়রা দর্শনকে দেখেছেন সত্যদর্শন হিসেবে। তারা মনে করেন, যথার্থ জ্ঞান, সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি শুধু আমাদেরকে এ জগৎ ও জীবনের জ্ঞান প্রদান করে না, পরজগতের জ্ঞানকেও নির্দেশ করে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে স্পষ্ট ও নির্ভুল জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথে চলার দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা যোগায়।

ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায় যেভাবে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস অন্বেষণ করলে আমরা সেটি দেখতে পাই না। পাশ্চাত্য দর্শনের ক্ষেত্রে

সম্প্রদায়ভিত্তিক দার্শনিক আলোচনা তেমন নেই, এই দর্শনে মূলত ব্যক্তিভিত্তিক দার্শনিক আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। সকল পাশ্চাত্য দার্শনিক সাধারণভাবে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ওপর প্রাধান্য যে দেননি তার প্রমাণ আমরা সহজে পাই। কেননা পাশ্চাত্য দর্শনের যাত্রা বহুপূর্বে শুরু হলেও জ্ঞানবিদ্যক আলোচনার সূত্রপাত আমরা প্রথম দেখি সোফিস্টদের চিন্তায়।[৬] অর্থাৎ পাশ্চাত্য দর্শনে প্রায় একশত বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর জ্ঞানতত্ত্ব বা জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনা স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। তবে পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বের তুলনায় ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা বেশ জটিল।[৭] ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের এই আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, দর্শনশাস্ত্রকে এখানে প্রমাণশাস্ত্র হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে আরো দেখা যায়, যে কারণের উপস্থিতিতে অনিবার্যভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই দর্শন। 'প্রমাণ' শব্দটিকে এখানে প্রমা লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই 'প্রমাই' হল 'যথার্থ জ্ঞান'। আর তাই যেখানে প্রমাণ থাকবে সেখানে জ্ঞান থাকবেই। প্রত্যক্ষণ, অনুমান প্রভৃতিকে ভারতীয় দর্শনে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রমাণশাস্ত্রে তাই জ্ঞানেরই আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। আর এদিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায়, যে শাস্ত্র জ্ঞানের বিশ্লেষণ করে তাও দর্শন।

তাই সংক্ষেপে ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের জ্ঞানবিদ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গি, আলোচনা, সমালোচনা, জ্ঞানগত সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়কে সংক্ষেপে আমরা ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব বলে অভিহিত করতে পারি।

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ভারতীয় দর্শনের সবকটি সম্প্রদায়ই জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়বস্তু এবং জ্ঞানের উৎসের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাছাড়া ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা দেখি যে এই দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব জ্ঞাতাকে প্রমাতা বা প্রামাতৃ, জ্ঞেয়বস্তুকে প্রমেয় এবং যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা হিসেবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি যথার্থ জ্ঞানের উৎসের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রমাণকে স্বীকার করে নিয়েছেন।[৮] ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় মূলত প্রমাণকেন্দ্রিক আালোচনার প্রাধান্য দেখা যায়। কেননা ভারতীয় দর্শনের প্রায় সকল দার্শনিকগণই এই প্রমাণতত্ত্বের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়বস্তুর মধ্যে জ্ঞানগত সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ক, জ্ঞানের আধেয়ের ক্ষেত্রে বাহ্যিক বস্তু কিভাবে জ্ঞানগত বিষয়ে পরিগণিত হয়, কোনো বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান আমরা কিভাবে পেতে পারি, জ্ঞানের

সীমারেখা, জ্ঞানের বৈধতা, প্রকৃতপক্ষে যথার্থ জ্ঞান অর্জন সম্ভব কিনা, জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া কী, সত্য ও মিথ্যাজ্ঞানের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় প্রভৃতি বিষয় ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের পরিধির অন্তর্ভুক্ত বিষয়।[৯] ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অধ্যাপক আর. এন. শর্মা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন,

> Its subject matter is the process, methods, object, characteristics, conditions, validity and fallacies of knowledge. Epistemology is the philosophical discussion of all these problems. It should be remembered here that epistemology uses the philosophical methods of induction and deduction, synthesis and analysis.[১০]

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন উৎস

ভারতীয় দর্শনে প্রধানত দুটি ভাগ লক্ষ করা যায়। যথা : আস্তিক সম্প্রদায় এবং নাস্তিক সম্প্রদায়। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা এবং বেদান্ত দর্শনকে ষড়দর্শন বলা হয়। এই ষড়দর্শন সম্প্রদায়কে আস্তিক দর্শন এবং চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে আস্তিক এবং নাস্তিক শব্দ দুটি ভারতীয় দর্শনে সাধারণ অর্থে নয়, বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ঈশ্বর- বিশ্বাসের সাথে শব্দদ্বয় সম্পৃক্ত নয়। বেদে বিশ্বাসী অর্থাৎ এই দর্শনের যে সকল সম্প্রদায় বেদের কর্তৃত্ব এবং বেদকে অভ্রান্ত হিসেবে মেনে নেয় তাদেরকে আস্তিক বলে। এই আস্তিক দর্শনের আবার দুটি ভাগ রয়েছে। যেমন : বেদানুগত এবং বেদস্বতন্ত্র। মীমাংসা এবং বেদান্ত দর্শন বেদানুগত এবং সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক বেদস্বতন্ত্র।[১১] আর নাস্তিক সম্প্রদায় তাঁরা যারা বেদকে প্রামাণিক শাস্ত্র হিসেবে মানে না এবং বেদের কর্তৃত্বকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে। তবে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো দর্শন সম্প্রদায় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন না করে যদি শুধু বেদে বিশ্বাসী হয় তাহলে তারা আস্তিক হিসেবে গণ্য। এই অধ্যায়ের মূল আলোচনা মূলত জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কিত। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উৎস হলো : প্রত্যক্ষণ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। এখন উল্লিখিত এসব উৎস সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

প্রত্যক্ষণ

ভারতীয় দর্শনের প্রায় সকল সম্প্রদায় অর্থাৎ আস্তিক ও নাস্তিক নয়টি সম্প্রদায়ই এই প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন যা এখন উপস্থাপন করা হলো :

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণই প্রথম প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত। বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার ফলে সরাসরি যে জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে তাকে প্রত্যক্ষণ জ্ঞান বলা হয়। অর্থাৎ, বিষয়ের সঙ্গে এখানে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত যে অধ্যবসায় পরিলক্ষিত হয়, তাকেই প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। শুধু তাই নয় এই প্রত্যক্ষণলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের সাথে অন্তরিন্দ্রিয়ের সম্মিলন ঘটে থাকে। তাই একথা বলা যাবে না যে, শুধু সন্নিকর্ষ থেকেই প্রত্যক্ষণ আসে। বরং এ প্রসঙ্গে এ কথা বলা যথার্থ হবে যে,"...প্রত্যক্ষ যে শুধু সন্নিকর্ষ থেকেই উৎপন্ন হয় তা নয়, আত্মা মনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তারপর ইন্দ্রিয় অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়, তবে প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়।"[১২] তবে প্রখ্যাত দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেল তাঁর প্রসিদ্ধ *An Inquiry into Meaning and Truth* গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে 'Perception and Knowledge' সম্পর্কিত আলোচনায় প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন,

> I do not like to use the word 'perception' for the complete experience consisting of a sensory core supplemented by expectations, because the word 'perception' suggests too strongly that the beliefs involved are true.[১৩]

এখানে (প্রত্যক্ষণে) বিষয়ের সঙ্গে আমাদের বহিরিন্দ্রিয় - চোখ, কান, নাক, জিহ্বা প্রভৃতির সরাসরি সংযোগ স্থাপন হয়, সৃষ্টি হয় সংবেদনের। মানবমনে এই সংবেদন সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সুসংবদ্ধ এবং সুবিন্যস্ত রূপ তৈরি করে বিষয়ের আকার প্রদান করে থাকে। এ জাতীয় ব্যাখ্যা আমরা বাচস্পতি মিশ্রের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশ্লেষণে দেখতে পাই। তবে প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে আমরা বাচস্পতি মিশ্র এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর মধ্যে মতপার্থক্য দেখতে পাই। প্রত্যক্ষণের দুটি প্রকারভেদ লক্ষ করা যায় : লৌকিক বা বাহ্য প্রত্যক্ষণ এবং অলৌকিক বা আন্তর প্রত্যক্ষণ। লৌকিক বা বাহ্য প্রত্যক্ষণে মূলত (চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি) পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান অর্জিত হয়। আর অলৌকিক প্রত্যক্ষণে মূলত যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসীদের অলৌকিক চিন্তনশক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। এরা দূর অতীত, ভবিষ্যৎ মানসচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তাঁরা অতি সূক্ষ্ম বস্তুও অবলোকন করতে পারেন, বুঝতে পারেন। তাঁদের এই জাতীয় প্রত্যক্ষণকে অলৌকিক প্রত্যক্ষণ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বাহ্য প্রত্যক্ষণকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষণ। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে কোনো বস্তুকে শুধুমাত্র বস্তু হিসেবে জানা হয়। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে বলেন, "The Nirvikalpa stage is thus a logical stage in the development of perceptual cognition and not a psychological stage."[১৪] এই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণে আমরা স্রেফ

বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান পেয়ে থাকি। তাই বস্তুর সহজ উপলব্ধিকে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ বলা যায়। তবে বস্তুর সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান আসে পরবর্তী ধাপের সবিকল্প প্রত্যক্ষণে। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের জ্ঞানকে ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। কোনো বস্তু সম্পর্কে শিশুরা যে ধরনের জ্ঞান লাভ করে সেটি নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের উত্তম উদাহরণ। সবিকল্প প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে বস্তুর গুণ, ধর্ম, নাম, জাতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জিত হয়, যার ফলে মানবজ্ঞান একটি নির্দিষ্ট রূপ পেয়ে থাকে। অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষণে আমাদের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভ হয় তাকে সবিকল্প প্রত্যক্ষণ বলা হয়। সবিকল্প প্রত্যক্ষণকে ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায়। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের অস্পষ্ট রূপটি সবিকল্প প্রত্যক্ষণে স্পষ্ট রূপ ধারণ করে। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ হলো প্রথম স্তর আর সবিকল্প প্রত্যক্ষণ হলো দ্বিতীয় স্তর। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের পরিণতি রূপ হলো সবিকল্প প্রত্যক্ষ।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় প্রত্যক্ষণ হলো সাক্ষাৎ জ্ঞান এবং এই জ্ঞান অন্য কোনো জ্ঞানের উপর নির্ভর করে অর্জিত হয় না। এই প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে আরো বলা যায়, *"Perception as conceived here is accordingly the result of a communion between the knower and the known ;..."*[১৫] এই প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করবো। তাই এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

অনুমান

যখন কোনো জ্ঞাত বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে সেই প্রত্যক্ষিত জ্ঞানের পর্যবেক্ষণ থেকে নতুন কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা হয় তখন সেই জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়াকে অনুমান বলে। অর্থাৎ কোনো জ্ঞাত বা জানা সত্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে অজানা সত্যে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াকে অনুমান বলা হয়। এস রাধাকৃষ্ণণ তাঁর *Indian Philosophy* গ্রন্থে অনুমান প্রসঙ্গে বলেন,

> *Anumana* means literally the measuring after something. It is knowledge which follows other knowledge. From the knowledge of the sign (*linga*) we get a knowledge of the object possessing it. *Anumana* is usually translated by the word "inference", Which however, is to be taken in a comprehensive sense, as including both deduction and induction.[১৬]

তাহলে সহজ করে আমরা বলতে পারি, জানা থেকে অজানায় গমন প্রক্রিয়া অনুমান হিসেবে অভিহিত। অনুমানলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্বে প্রত্যক্ষিত কোনো বিষয় বা বস্তুর সাদৃশ্য এবং সম্বন্ধ বিচারের ভিত্তিতে নতুন কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা হয়। যেমন - কোথাও ধোঁয়া

উড়তে দেখে যদি আমরা ধারণা করি যে সেখানে আগুন লেগেছে তাহলে এখানে এই ধারণা গঠনের বিষয়টি হচ্ছে অনুমান। অনুমান হলো জ্ঞানের পশ্চাদ্‌গত জ্ঞান। অর্থাৎ যে জ্ঞান অন্য জ্ঞানকে অনুসরণ করে অর্জিত হয় তাকে অনুমান বলে। আরও সংক্ষেপ করে বললে, জানা বিষয় থেকে অজানা বিষয়ে গমনের প্রক্রিয়াকে অনুমান বলে। অনুমানের স্বরূপ প্রসঙ্গে, Dr. B.N. Seal বলেন, "*Anumana* (inference) is that process of ascertaining, not by perception or direct observation, but through the instruimentality or medium of a mark, that a thing possesses a certain character."[১৭] এই অনুমানলব্ধ জ্ঞান সত্য হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। এটি মূলত পরোক্ষ জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সাইয়েদ আবদুল হাই'র বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন, "কোনো জ্ঞান বিষয়ের উপর নির্ভর করে এবং তার দ্বারা সমর্থিত হয়ে যদি কোনো অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয় তাকে অনুমান বলে।"[১৮] অনুমানের ভিত্তি হিসেবে নিয়ত সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধকে গ্রহণ করা হয়। যখন দুটি বিষয় বা বস্তুর মধ্যে নিয়ত বা ব্যাপ্তি সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় তখন সেখানে একটি বস্তু বা বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে অন্য বিষয় বা বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ হয় তাকে অনুমানলব্ধ জ্ঞান বলে। এই অনুমানলব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে আরও বলা যায়, "Inferential knowledge is the knowledge which is caused by paramarsa. Paramarsa is the knowledge that a concomitant of the probandum (vyaptivisista) is a character of the subject (of the conclusion)."[১৯]

অনুমানের অবয়বঃ যে সকল বচনের সমষ্টি দ্বারা অনুমান গঠন করা হয় সেই বচনগুলোকে অনুমানের অবয়ব বলা হয়। যেকোনো অনুমান গঠনের ক্ষেত্রে তিনটি পদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই পদগুলো হলো: (১) সাধ্যপদ বা প্রধান পদ, (২) পক্ষপদ বা অপ্রধান পদ এবং (৩) মধ্যপদ বা হেতুপদ। তাই প্রত্যেকটি অনুমানে তিনটি পদ এবং তিনটি বচন থাকা আবশ্যক। তবে এই তিনটি বচনকে নিরপেক্ষ হতে হবে। উল্লেখ্য যে, এই বচন তিনটি সদর্থক, নঞর্থক কিংবা উভয় ধরণের হয়ে থাকে।[২০]

অনুমানের প্রকারভেদ

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় অনুমান জ্ঞানের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত। এই অনুমানের শ্রেণিবিভাগ বা প্রকারভেদ নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় আলোচনা করলেও প্রায় সকল সম্প্রদায়ের শ্রেণিগত বিন্যাস একই ধরনের। ন্যায় দার্শনিকগণ অনুমানের উদ্দেশ্যের ভিত্তিকে কেন্দ্র করে একে স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। ব্যক্তির নিজস্ব জ্ঞান লাভের জন্য যে অনুমান করা হয় তাকে স্বার্থানুমান বলা হয়। এই অনুমানের ক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না।

এখানে ব্যক্তিগত জ্ঞান অর্জিত হয়। আর যখন অন্যের কাছে কোনো কিছু প্রমাণ করার জন্য অনুমান করা হয় তখন তাকে পরার্থানুমান বলা হয়। এই পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। আবার অন্য একটি নীতি অনুযায়ী অনুমানের তিনটি শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা : পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। পূর্ববৎ অনুমানের ক্ষেত্রে কারণের দ্বারা কার্যের অনুমিতি জন্মে থাকে। এই অনুমানে কারণকে প্রত্যক্ষ করে অপ্রত্যক্ষ কার্যকে অনুমান করা হয়ে থাকে। এই অনুমানে 'পূর্ব' শব্দ দ্বারা কারণকে নির্দেশ করা হয়। এখানে প্রত্যক্ষগত কারণ থেকে অপ্রত্যক্ষগত কার্যের অনুমিতি জন্মে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় – আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা, অতএব বৃষ্টি হবে। এখানে কালো মেঘ দেখে অনুমান করা হচ্ছে যে বৃষ্টি হবে। পূর্ববৎ অনুমানের বিপরীত বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় শেষবৎ অনুমানে। এই অনুমানে দৃষ্ট কার্য থেকে অদৃষ্ট কারণকে অনুমান করা হয়। এখানে কার্যের দ্বারা কারণের অনুমিতি জন্মে থাকে। যেমন: সকালে ঘুম থেকে উঠে উঠানে পানি দেখে অনুমান করা হয় যে রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। আর যখন কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসরণ না করে কেবল পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং সাদৃশ্যগত বিষয় অনুসরণ করে যে অনুমান করা হয় তাকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলে। কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে যে অনুমান গঠন করা হয় তাকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলে। এই অনুমানকে যুক্তিবিদ্যার সাদৃশ্য অনুমানের সাথে তুলনা করা যায়।

অন্য আরও একটি নীতি অনুসারে নৈয়ায়িকগণ আরো তিন শ্রেণির অনুমানের কথা বলেছেন। সেগুলো হলো : কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান। নব্যন্যায় সম্প্রদায় এই তিন শ্রেণির অনুমান সম্ভাবনার কথা বলেছেন। যে অনুমানে শুধুমাত্র অন্বয় বা সাদৃশ্য দেখে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় তাকে কেবলান্বয়ী অনুমান বলে। এই অনুমানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাধ্যপদ ও হেতুপদের একই সঙ্গে উপস্থিতির বিষয়টি লক্ষ করা হয়ে থাকে। এই কেবলান্বয়ী অনুমানে কোনো ধরনের নঞর্থক বা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

কেবল ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের ওপর ভিত্তি করে যখন কোনো অনুমান করা হয় তখন তাকে কেবল ব্যতিরেকী অনুমান বলে। এই অনুমানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যেখানে সাধ্যপদ নেই, সেখানে হেতুপদও নেই। অর্থাৎ এই উভয় প্রকার পদের অনুপস্থিতি লক্ষ করে এখানে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান হয়ে থাকে। আর কেবল ব্যতিরেকী অনুমানের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এই ব্যাপ্তি সম্পর্ক।

যে অনুমানের ক্ষেত্রে হেতু ও সাধ্যপদের মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেকী এই উভয়বিধ দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপ্তি বাক্যটি প্রমাণ করা হয় তখন তাকে অন্বয় ব্যতিরেকী অনুমান বলে। এই অন্বয়

ব্যতিরেকী অনুমানের ক্ষেত্রে সাধ্য ও হেতুপদের একই সঙ্গে উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির দৃষ্টান্তের বিষয়টি কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সাংখ্য জ্ঞানতত্ত্বে আবার অনুমানের দুটি শ্রেণিবিভাগ লক্ষ করা যায়। যথা: বীত এবং অবীত অনুমান। সদর্থক সামান্য বাক্যের ওপর ভিত্তি করে যে অনুমান গঠিত হয় তাকে বীত অনুমান বলে। অর্থাৎ অন্বয়ী ব্যাপ্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এই অনুমান। আর নঞর্থক সামান্য বাক্যের ওপর ভিত্তি করে যে অনুমান গঠিত হয় তাই অবীত অনুমান। এই অনুমানের ভিত্তি নির্ভর করে ব্যতিরেকী ব্যাপ্তির ওপর।

শব্দ বা আপ্তবাক্য (Testimony)

ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায় শব্দ প্রমাণকে যথার্থভাবে মর্যাদা প্রদান না করলেও শব্দের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা শব্দপ্রমাণ প্রসঙ্গে আমরা ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, "....exception of the Carvakas, the Bauddhas and the Vaisesikas, almost all Indian thinkers accept sabda or authority as an independent and ultimate source of knowledge."[২১] শব্দ মানবজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শব্দই অর্থকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে, বোধগম্য করে তোলে। সাংখ্য দার্শনিক মতে জ্ঞানের যথার্থ প্রমাণের ক্ষেত্রে তৃতীয় এবং শেষ প্রমাণটি হচ্ছে শব্দ বা আপ্তবাক্য। সাংখ্য দার্শনিকরা মনে করেন যখন প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানের সাহায্যে কোনো বস্তুকে জানা সম্ভব নয় তখন শব্দ প্রমাণের দ্বারা সেসব বস্তুকে জানা সম্ভব। মীমাংসা দর্শনে আবার শব্দ প্রমাণ সম্পর্কে এভাবে বলা হয়েছে,

> *Sabda* (word as a *Pramana* means the knowledge that we get about things (not within the purview of our perception) from relevant sentences by understanding the meaning of the words of which they are made up.[২২]

শব্দজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উপলব্ধি। কেননা শব্দ বা আপ্তবাক্যের অর্থ নির্ভর করে উপলব্ধির ওপর। শব্দজ্ঞানের ক্ষেত্রে সঠিক অর্থ বুঝতে না পারলে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয় না। সাধারণত শব্দজ্ঞান দ্বারা বাচনিক জ্ঞানকে নির্দেশ করা হয়। শব্দের দ্বারা নির্দেশিত বস্তুর জ্ঞান শব্দের অর্থের প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচনের অর্থ বোঝার ওপরই নির্ভর করে শব্দজ্ঞান অর্জিত হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "আপ্তবাক্য হেতু শব্দার্থ এবং বাক্যার্থের জ্ঞানকে শব্দ প্রমাণ বলা হয়।"[২৩] চন্দ্রধর শর্মার বক্তব্যও এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, "It is defined as the statement of a trustworthy person (aptavakya) and consists in understanding its meaning."[২৪] সাংখ্য দর্শনে যে তিন প্রকার প্রমাণের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে

সর্বশেষ এবং তৃতীয় প্রকার প্রমাণ হিসেবে আগম বা আপ্তবচনকে নির্দেশ করা হয়েছে। সাংখ্যকাররা শব্দ বা আপ্তবাক্য বলতে বিশ্বস্ত কোনো ব্যক্তির উপদেশ জ্ঞানকে নির্দেশ করেছেন। তবে এই আপ্তব্যক্তিকে ভ্রম-বিপ্রলিপ্সাদি দোষমুক্ত হতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই উপদেশজন্য জ্ঞানের জন্য একদিকে যেমন পদজ্ঞান, অন্যদিকে তেমনি আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, সন্নিধি ও তাৎপর্য থাকতে হবে এবং বাক্যের অন্তর্গত এই চার প্রকার সম্বন্ধের জ্ঞান শব্দ প্রমাণ সম্ভব নয়।

সাংখ্য মতে এই শব্দপ্রমাণের লক্ষণ হলো আপ্তশ্রুতি। *সাংখ্যকারিকা*, *করিকা*-৫ মতে এই শব্দ প্রমাণ হলো 'আপ্তবচনং তু'। যখন কোনো বস্তুকে প্রত্যক্ষণ কিংবা অনুমানের সাহায্যে জানা যায় না তখন শব্দ প্রমাণের সাহায্যে এই বস্তুকে জানা যায়। শব্দজ্ঞানের বৈধতা মূলত নির্ভর করে সেই শব্দ বা আপ্তবচনের অর্থ উপলব্ধি করার ওপর। সঠিক অর্থ বোধগম্য না হলে আপ্তবাক্যের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।

ন্যায় দার্শনিকদের মতো সাংখ্য দর্শনও লৌকিক এবং বৈদিক দু'ধরনের শব্দপ্রমাণের কথা স্বীকার করেছেন। এখন এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

লৌকিক ও বৈদিক শব্দ

লৌকিক শব্দ হলো অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসযোগ্য সাধারণ মানুষের বর্ণনাকৃত বচন। যেমন- কোনো কৃষক যখন তার কৃষি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। তবে সাংখ্যকারগণ লৌকিক শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে মানতে চান না। কেননা প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানের সাহায্যে আমরা এই জাতীয় জ্ঞান লাভ করতে পারি। তবে তারা বৈদিক শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বেদের বচনই বৈদিক শব্দ। বেদ থেকে আমরা স্বর্গ, নরক, পাপ-পুণ্য, দেবতা প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান পেয়ে থাকি। প্রত্যক্ষণ কিংবা অনুমানের সাহায্যে এই জাতীয় জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। বেদের জ্ঞান নির্ভুল জ্ঞান। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, "The Vaidika testimony is perfect and infallible because the vedas are spoken by God; secular testimony, being the words of human beings who are liable to error, is not infallible."[২৫] সাধারণত মানবসমাজ যে জাতীয় ভুল-ভ্রান্তি করে থাকে তা বেদে নেই। কেননা বেদ হলো ভ্রান্তির উর্ধ্বে, অভ্রান্ত, স্বতঃপ্রমাণিত।

প্রজ্ঞাবান ঋষি, মনীষী কর্তৃক এই বেদ রচিত তাই তা নির্ভুল। এ প্রসঙ্গে বিষয়টি আরও সহজ করে আমরা বলতে পারি, সাধারণত শব্দ বলতে আমরা বুঝে থাকি কোনো বাচনিক জ্ঞানকে। শব্দের অর্থ দ্বারা ঐ শব্দ কর্তৃক নির্দেশিত কোনো বস্তুর জ্ঞানকে বোঝায়। কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচনের অর্থ বুঝতে পারা বা বোধগম্য হওয়ার ওপরই নির্ভর করে এই শব্দ প্রমাণের বিষয়টি। ন্যায় দার্শনিকগণ শব্দপ্রমাণকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। শব্দকে বাচনিক জ্ঞান বলা হয়ে থাকে। এই

শব্দজ্ঞানে অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা উচ্চারিত বাক্য থেকে আমরা জ্ঞান পেয়ে থাকি। তবে যে কোনো ব্যক্তির বাক্য বা বচন থেকে নয় আপ্তব্যক্তির বচন থেকেই শব্দজ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। সাহিত্যাচার্য ও সাহিত্যত্ন চন্দ্রধর শর্মা এই শব্দ প্রমাণের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন,

> It is defined as the statement of a trustworthy person (*apta-vakya*) and consits in understanding its meaning. A Sentence is defined as a collection of words and a word is defined as that which is potent to convey its meaning.[২৬]

উল্লেখ্য যে 'আপ্ত' বলতে বিশ্বাসযোগ্য, সত্যবাদী ও সত্যদর্শী ব্যক্তিকে বোঝানো হয়ে থাকে।[২৭] অধ্যাপক সাইয়েদ আবদুল হাই তার *ভারতীয় দর্শন* গ্রন্থে আপ্তব্যক্তি এবং আপ্তবাক্যের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেন, "যিনি জ্ঞানী, সত্যবাদী এবং বিশ্বাসযোগ্য... তার বাক্য গ্রহণযোগ্য এবং সত্য। তিনি হলেন শব্দতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এবং আপ্তব্যক্তি। তার বচন হল আপ্তবাক্য। আপ্তবাক্য হতে যে জ্ঞান লাভ করা হয় সেটা হলো শব্দজ্ঞান।"[২৮] আর আপ্তব্যক্তি তার বাক্য বা বচন দ্বারা বিবৃত করেন তাই শব্দপ্রমাণ। নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষণ, অনুমান এবং উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে মানার পাশাপাশি শব্দকে চতুর্থ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা প্রত্যক্ষণ, অনুমান কিংবা উপমান থেকে শাব্দিক জ্ঞান পাওয়া যায় না। তাই শব্দকে স্বতন্ত্র একটি প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করতে হয়। তবে এই শব্দপ্রমাণের যথার্থতা নির্ভর করে অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারার ওপর। অর্থ যদি শ্রোতার কাছে বোধগম্য না হয় তাহলে শব্দপ্রমাণ অর্থবহ হবে না।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সাধারণ মতে শব্দ দ্বারা বাচনিক জ্ঞানকে নির্দেশ করলেও ন্যায় দর্শনে শব্দ হলো কোনো বিশ্বাসযোগ্য যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তির বচন। কোনো বিষয় সম্পর্কে যখন প্রত্যক্ষণ, অনুমান কিংবা উপমান দ্বারা জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয় না তখন শব্দপ্রমাণের সাহায্যে সে বিষয়ের জ্ঞান অর্জন সম্ভবপর হয়ে থাকে। এই ন্যায় দার্শনিদের আলোচনা থেকে শব্দপ্রমাণের স্বরূপ প্রসঙ্গে আরও বলা যায়,

> ন্যায় দর্শন অনুযায়ী শব্দ গুণবিশেষ। সংযোগ ও বিভাগ জন্য বহির্জগৎ হইতে ধ্বনির আকারে, কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা প্রভৃতি উচ্চারণ স্থানের অভিঘাতে উৎপন্ন অপরের বর্ণবোধজনিত অভিব্যক্তি শোত্র গ্রহণ করে। ধ্বনি ও অভিব্যক্তি এক প্রকার অনুমিতির করণ হইলেও শব্দপ্রমাণ ও অনুমানপ্রমাণের মধ্যে পার্থক্য আছে। শব্দপ্রমাণের প্রামাণ্য, অর্থ, তাৎপর্য, যোগ্যতা, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির উপলব্ধিজাত।[২৯]

এই শব্দপ্রমাণের শ্রেণিবিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। বাৎসায়নের মতে আমরা দু'ধরনের শব্দপ্রমাণের আলোচনা পাই। যথা: (১) দৃষ্টার্থ এবং (২) অদৃষ্টার্থ শব্দপ্রমাণ। দৃষ্ট বস্তু মূলত জগতের

মধ্যে প্রত্যক্ষিত হয়। আর এরকম দৃষ্ট বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, মুনি-ঋষি বা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য বা বচনকে দৃষ্টার্থ শব্দপ্রমাণ বলে। অন্যদিকে যা প্রত্যক্ষ করা যায় না এমন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির যে বাক্য বা বচন তাই হলো অদৃষ্টার্থ শব্দপ্রমাণ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বৈজ্ঞানিকদের গবেষণালব্ধ বিষয়সমূহঃ অণু-পরমাণু, খাদ্য-কণা, প্রাণ, জীবাণু, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি সম্পর্কিত অথবা মুনি-ঋষি তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিদের ঈশ্বর, পাপ, পুণ্য, আত্মা, পরকাল, পুনর্জন্ম প্রভৃতি সম্পর্কে যে বাক্য বা বচন সেগুলো হলো অদৃষ্টার্থ শব্দপ্রমাণ।[৩০]

নব্য নৈয়ায়িকগণ শব্দপ্রমাণের আরো দুটি শ্রেণি বিভাগ দেখিয়েছেন সেটি হলো: লৌকিক এবং বৈদিক শব্দপ্রমাণ। সাধারণ মানুষের বাক্য বা কথাকে লৌকিক শব্দপ্রমাণ বলা হয়। সাধারণ মানুষ কর্তৃক বিবৃত হওয়ায় লৌকিক বাক্য সবসময় গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা লৌকিক বাক্য সবসময় সঠিক নাও হতে পারে। সাধারণ মানুষ সম্পৃক্ত থাকায় এই জাতীয় বাক্য বা বচন কখনো সত্য আবার কখনো মিথ্যা হতে পারে। অন্যদিকে বৈদিক শব্দপ্রমাণ অভ্রান্ত। কেননা বেদের বাক্যই হলো বৈদিক শব্দপ্রমাণ। এ প্রসঙ্গে চন্দ্রধর শর্মার বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন, "The Vaidika testimony is perfect and infallible because the Vedas are spoken by God; secular testimony, being the words of human beings who are liable to error, is not infallible."[৩১] আর এই বেদ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে, বেদের অভ্যন্তরীণ সকল বাক্যই ঈশ্বরের বাক্য। ফলে বেদের বাক্যসমূহ অভ্রান্ত ও নির্ভুল।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় শব্দপ্রমাণের বেশ গুরুত্ব রয়েছে। ভারতীয় সকল শাস্ত্রেই গুরু-শিষ্যের সেতুবন্ধন রচিত হয়েছে শ্রবণ বা শ্রুতির মাধ্যমে। আর বেদের অপর নামই তো শ্রুতি। ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষণকে প্রধান প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করলেও বিচার-বিশ্লেষণ, শব্দের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে অকপটে স্বীকার করা হয়েছে। আধুনিক পাশ্চাত্যদর্শনে আমরা এই শব্দ সংক্রান্ত আলোচনা দেখতে পাই, তবে ভারতীয় দর্শনে খ্রিষ্টপূর্ব যুগেই এই আলোচনা দেখা যায়। বিশেষ করে ঋগ্বেদের যুগে এই শব্দ প্রমাণের আলোচনার সূত্রপাত দেখা যায়।

ন্যায় মতে উৎপত্তিগত দিক থেকে ত্রিবিধ শব্দের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো: সংযোগজ, বিভাগজ ও শব্দজ। দুটি দ্রব্যের সংযোগ বা অভিঘাত থেকে উৎপন্ন শব্দকে সংযোগজ শব্দ বলে। আর কোনো একটি দ্রব্যের বিভাগ থেকে যে শব্দ পাওয়া যায় তাকে বিভাগজ শব্দ বলা হয়। আবার যখন

কোনো একটি শব্দ থেকে অপর একটি শব্দ উৎপন্ন হয় তখন তাকে শব্দজ শব্দ বলা হয়ে থাকে। সহজ করে বলতে গেলে বলা যায় – শ্রোতা তার কর্ণকুহরে যে শব্দ গ্রহণ করে থাকে তাই শব্দজ শব্দ।

ন্যায় দর্শন মনে করে আমরা চারটি উপায়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারি: প্রত্যক্ষণ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। এই চারটি কারণের যে-কোনো একটি কারণ থেকে আমরা জ্ঞান পেতে পারি। তবে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি তা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হলো শব্দ। জ্ঞান প্রকাশের ক্ষেত্রে বক্তা শব্দসমূহ উচ্চারণ করে থাকেন, আর শ্রোতাকে উদ্দেশ করেই কোনো শব্দ উচ্চারিত হয়। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শব্দের ব্যবহার কখনো শ্রোতাকেন্দ্রিকতাকে উপেক্ষা করতে পারে না। বক্তা শব্দ ব্যবহার দ্বারা জগৎসম্পর্কিত তথ্যসমূহ উপস্থাপনের মাধ্যমে শ্রোতার অনুভূতিকে জাগ্রত করে থাকেন। যদি অনুভূতি জাগ্রত হয় তাহলে শব্দের ব্যবহার সার্থকতা লাভ করে। তবে এই শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বক্তা তার পূর্বার্জিত জ্ঞানই শ্রোতার কাছে উপস্থাপন করে থাকেন। ফলে শব্দ ব্যবহারকালে বক্তা এখানে নতুন কোনো জ্ঞান লাভ করে না। এখানে শুধু শব্দ শুনে শ্রোতার জ্ঞান লাভ হয়। শ্রোতার যে জ্ঞান এখানে পরিলক্ষিত হয় তা বক্তা পূর্বেই অর্জন করেছে।

শব্দ থেকে উৎপন্ন সকল ধরনের জ্ঞানকে আমরা যথার্থ জ্ঞান বলতে পারি না। কেননা অনাপ্তব্যক্তির শব্দকে আমরা শব্দপ্রমাণ বলতে পারি না। এই শব্দপ্রমাণের সমালোচনায় আমরা আরো বলতে পারি,

> … testimony cannot be a basic source of knowledge, since one can not know something on the basis of testimony unless the attester knows it. This is why testimony does not, as such, generate knowledge though it may be described as transmitting it.[৩২]

আধুনিককালে ভাষাদর্শনেও এই শব্দ নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা ও গবেষণা চলমান রয়েছে। ভাষাদর্শনে অবশ্য শব্দের অর্থের স্পষ্টতা, প্রাঞ্জলতা এবং এর সঠিক প্রয়োগ নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়। শব্দের বিভিন্ন দূবোধ্য বিষয়সমূহ নিয়ে ভাষাদর্শন নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা করে যাচ্ছে। শব্দ প্রথমে নিজ থেকেই জ্ঞাত হয়ে থাকে তারপর নিজ অর্থের জ্ঞাপন ঘটিয়ে থাকে। পরবর্তী সময়ে এই শব্দ তার নিজ অর্থের স্মারক হয়ে থাকে। তবে শব্দকে ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানের উৎস হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ দর্শন ভিন্নমত পোষণ করেছে। বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদের মতে (Logicians), "... *Sabda* is not an independent source of knowledge, but a form of perception or

inference,"[৩৩] বৈশেষিক এবং জৈন দার্শনিকগণও শব্দপ্রমাণ প্রসঙ্গে প্রায় একই কথা বলেছেন।[৩৪] পরিশেষে এই শব্দপ্রমাণ প্রসঙ্গে বলা যায়,

> As a source of knowledge and justification, testimony depends both epistemically and psychologically on other sources. This is entirely consistent, however, with its playing an incalculably important role in the normal development of our justification and knowledge.[৩৫]

উপমান (Comparison)

উপমান সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ের কাছে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত নয়। উপমান মূলত শব্দপ্রমাণের অন্তর্গত। তাই অনুমানের অন্তর্গত বিষয় হিসেবে উপমানকে গণ্য করা হয়। সাদৃশ্য জ্ঞান থেকে অপরিচিত বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে আমাদের যে অনুভূতি হয়ে থাকে তার মূলে মূলত কাজ করে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বিবৃত বর্ণনা। নৈয়ায়িক দার্শনিকদের মতো মীমাংসক দার্শনিকগণও উপমানকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে মীমাংসকদের ব্যাখ্যার সাথে নৈয়ায়িকদের ব্যাখ্যার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মীমাংসা দার্শনিকগণও মনে করেন পূর্বে প্রত্যক্ষ করা বস্তুর সঙ্গে বর্তমানে প্রত্যক্ষীভূত বস্তুর যে সাদৃশ্য জ্ঞান দেখা যায় তাই উপমান। এই উপমান জ্ঞানের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো ব্যক্তি তার বাড়িতে দেখা গরুর সাথে যখন বনে বা অন্য কোথাও গরু দেখে লক্ষ করেন যে সাদৃশ্য রয়েছে তবে সেই জ্ঞানকে উপমানজ্ঞান বলা হয়। উপমানের স্বরূপ সম্পর্কে মীমাংসা দার্শনিকদের অভিমত সম্পর্কে বলা যায় যে,

> Analogy (*upamana*) is accepted by *mimamsa* in a sense which is different from that in which Nyaya took it. The man who has seen a cow (*go*) goes to the forest and sees a wild ox (*gavaya*), and apprehends the similirity of the gavaya with the *go*, and then cognizes the similarity of the *go* (which is not within the limits of his perception then) with the *gavaya*. The cognition of this similarity of the *gavaya* in the go, as it follows directly from the perception of the similarity of the *go* in the *gavaya* is called *upamana* (analogy).[৩৬]

এখানে পূর্বস্মৃতি থেকে বর্তমান দেখা গরুর সাথে সাদৃশ্য অন্বেষণ করা হয়। তবে উপমানকে স্মৃতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। দুটি গরুর সাদৃশ্য থেকে এখানে যে জ্ঞান হয় তা নিয়ত সম্পর্কের জ্ঞান। তবে উপমান শব্দ কিংবা কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত কোনো জ্ঞান নয়। তাই উপমানকে মীমাংসাংকগণ স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে নৈয়ায়িকগণ উপমানকে স্বতন্ত্র

প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করতে চান না। অন্যদিকে আমরা দেখি যে প্রভাকর মীমাংসা দার্শনিকরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দকে প্রমাণরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। ভাট্ট মীমাংসক এবং অদ্বৈত বেদান্ত প্রত্যক্ষণ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধিকে আবার প্রমাণরূপে গ্রহণ করেছেন। তবে রামানুজ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমকে জ্ঞানের উৎস বলে স্বীকার করেন।

একটি বস্তুকে দেখে যখন একই সাদৃশ্য বস্তুকে চিহ্নিত করা হয় তখন এই ধরনের প্রমাকে 'উপমিতি' বলা হয়। উপমান প্রমাণ এই জাতীয় জ্ঞানের উৎস। এটি একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত। নৈয়ায়িক, মীমাংসক এবং বৈদান্তিক মত বিশ্লেষণ করলে উপমানকে অনুমান হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। আর অনুমিতির ন্যায় এখানে ব্যাপ্তিজ্ঞান একান্ত আবশ্যক কোনো বিষয় নয়। তবে অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মনে করেন বৈসাদৃশ্যগত জ্ঞান ও উপমানের মাধ্যমে পাওয়া যায়।[৩৭] ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে – 'উপ' অর্থ 'সাদৃশ্য' এবং 'মান' অর্থ 'জ্ঞান'। অর্থাৎ 'উপমান' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় সাদৃশ্যজ্ঞান। মহর্ষি গৌতম এ সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন প্রসিদ্ধ পদার্থের সঙ্গে যখন সাদৃশ্য পাওয়া যাবে তখন সাধ্য পদার্থের যথার্থ নিশ্চয় উপায় হবে উপমানপ্রমাণ। পূর্বে অবগত কোনো বিষয়ের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে যখন কোনো শব্দের বাচ্যার্থ সিদ্ধ হয় তখন এক ধরনের অনুভূতি উপলব্ধি হয়। এই অনুভূতিকে বলে উপমিতি। এই উপমিতির যা কারণ তাই উপমান হিসেবে বিবেচিত। এরূপ বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর মধ্যে যে সম্বন্ধ জ্ঞান তাকে উপমিতি বলা হয়ে থাকে।[৩৮] এই উপমিতিজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার আগে বাধ্যতামূলকভাবে দুটি জ্ঞান থাকতে হবে। তাদের একটি হলো - (১) সাদৃশ্যজ্ঞান এবং অন্যটি হলো: (২) অতিদেশ বাক্যার্থজ্ঞান। এই দুটি বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থীরা মনে করেন অতিদেশ বাক্যার্থের স্মৃতিই উপমিতির কারণ আর সাদৃশ্যজ্ঞান সহকারী কারণ হিসেবে কাজ করে।[৩৯] অবশ্য এ বিষয়টি নিয়ে প্রচীনগণ এবং নবীনদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে কোনো উপমার সাহায্যে আমরা যখন কোনো জ্ঞান লাভ করে থাকি তখন সেই জ্ঞান লাভের পদ্ধতিটিকে উপমান বলে। অধ্যাপক সাইয়েদ আবদুল হাই তাঁর *ভারতীয় দর্শন* গ্রন্থে উপমানের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেন, " উপমান বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সাদৃশ্য জ্ঞান নয়, একটি নামের সঙ্গে তার বস্তুর সম্বন্ধের জ্ঞান। প্রসিদ্ধ বস্তুর সাদৃশ্য দ্বারা অপ্রসিদ্ধ বস্তুকে জানার নাম হলো উপমান। উপমার সাহায্যে জ্ঞান লাভ করার প্রণালিকে উপমান বলা হয় এবং এই প্রণালি দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় অর্থাৎ উপমানলব্ধ জ্ঞানকে উপমিতি বলা হয়।"[৪০] এখানে সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর মধ্যকার যে সম্বন্ধ তাকে উপমিতি বলা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে কোনো সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য থাকে যে কোনো

বিষয় বা বস্তুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা। আর এই উপস্থাপিত বিস্তারিত বিবরণ থেকে সংজ্ঞী যে জ্ঞান লাভ করে সেই জ্ঞানকে উপমান বলে।

ন্যায় দর্শনে আমরা যে চারটি যথার্থ জ্ঞান লাভের প্রমাণ দেখতে পাই তার মধ্যে উপমান অন্যতম। নৈয়ায়িকগণ মনে করেন পূর্বে দেখা বা পরিচিত কোনো বস্তুর সাথে যখন কোনো নতুন বস্তুর সাদৃশ্য অবলোকন করি এবং ঐ নতুন বস্তু সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করি তখনই তাকে উপমান বলে। অর্থাৎ পরিচিত বস্তুর সাদৃশ্য থেকে অপরিচিত বস্তুবিষয়ক জ্ঞানকে উপমান জ্ঞান বলা হয়। ন্যায় দর্শনের উপমান সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যায়,

> *Upamana* is the third source of valid knowledge accepted by the Nyaya. It is the source of our knowledge of the relation between a name and things so named or between a word and its denotation (*sanjnasanjni sambandha*).[৪১]

নৈয়ায়িকগণ এই উপমানের জন্য দুটি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা : (১) উপমানের সাহায্যে আমরা যে বিষয় বা বস্তুকে জানবো তা পূর্বে প্রত্যক্ষীভূত হলে হবে না অর্থাৎ অপরিচিত হতে হবে। (২) তবে পূর্বে প্রত্যক্ষীভূত না হলেও বস্তুটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো বস্তুর জ্ঞান আমাদের থাকতে হবে এবং উপমানের ক্ষেত্রে পূর্বে প্রত্যক্ষীভূত বস্তুটির সাথে পরিচিত বস্তুটি সাদৃশ্যপূর্ণ – এই জ্ঞানও আমাদের থাকতে হবে। নৈয়ায়িকগণ মনে করেন, উল্লিখিত দুটি বিষয় না হলে উপমান হবে না।

ন্যায় মতে পূর্ব পরিচিত বস্তুর সদৃশ্য জ্ঞান থেকে জ্ঞান পাওয়ার কথা বলেছে। ন্যায় দর্শনের উপমান সম্পর্কিত বক্তব্যের বিষয়টি পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যার আলোচনায়ও আমরা দেখতে পাই। ন্যায় মতে যাকে উপমান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যায় তাকে সাদৃশ্যমূলক আরোহ অনুমান বলে। এই সাদৃশ্যমূলক অনুমানে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা হয়। তবে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ করলে ন্যায় মত এবং সাদৃশ্যানুমানের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়। উপমানের ক্ষেত্রে আমরা সংজ্ঞা লাভ করি। সাদৃশ্যানুমানে এ ধরনের কোনো বিষয় নেই। তাছাড়া উপমানজ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে আপ্তব্যক্তির পূর্ব প্রত্যক্ষীভূত বিবরণের ওপর নির্ভর করতে হয় কিন্তু সাদৃশ্যানুমানের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো বিষয় নেই। শ্রীকানাইলাল পোদ্দার অনূদিত ***তর্কসংগ্রহ দীপিকাসহ*** গ্রন্থে তিন প্রকার উপমানের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা: (১) সাদৃশ্যবিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান, (২) অসাধারণ ধর্ম-বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান এবং (৩) বৈসাদৃশ্য-বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান।[৪২] অর্থাৎ উপমান হলো নামের সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধের জ্ঞান। প্রভাকর মিশ্র প্রত্যক্ষীভূত বস্তুর সাথে স্মৃতিতে রক্ষিত বস্তুর সাদৃশ্যগত জ্ঞান হিসেবে উপমানকে গ্রহণ করেছেন।[৪৩] প্রভাকর

মিশ্রের চিন্তার সাথে কুমারিল ভট্টের চিন্তার অনেকাংশে মিল লক্ষ করা যায়। তবে তাঁদের মধ্যে সামান্য পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। কুমারিল ভট্ট যেখানে একাধিক বস্তুতে একই গুণাবলি থেকে গঠিত সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। অন্যদিকে প্রভাকর মিশ্র এই সাদৃশ্যকে স্বতন্ত্র প্রকার বা শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৪৪]

মীমাংসাদর্শনে উপমান নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মীমাংসকগণও মনে করেন উপমান হলো পূর্ব প্রত্যক্ষীভূত কোনো বস্তুর সাথে বর্তমানে প্রত্যক্ষীভূত কোনো বস্তুর সাদৃশ্যগত জ্ঞান। তবে তাঁরা উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে মানেননি। তাঁরা মনে করেন উপমানে যে জ্ঞান হয় তা পূর্ববর্তী জ্ঞান থেকে নিঃসৃত এক ধরনের অনুমান ছাড়া কিছু নয়। এরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। তবে বেদান্ত দর্শনে উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তবে এই জ্ঞানের যথার্থতা প্রসঙ্গে বলা যায়, "We may point out, however, that though this *pramana* is not syllogistic inference, it reduces itself to what in modern logic is described as immediate inference by reciprocal relations."[৪৫]

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায় উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করেননি। কেননা, "উপমানের প্রয়োগক্ষেত্র সীমিত। লোকে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দকে যতটা উপযোগী মনে করে উপমানকে ততটা করে না।"[৪৬] তাছাড়া চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, বৈশেষিক এবং সাংখ্য দার্শনিকগণ উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেননি। অন্যদিকে মীমাংসা, বেদান্ত এবং ন্যায় দর্শন উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে মর্যাদা প্রদান করলেও উপমানের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে বিশেষ করে মীমাংসা এবং ন্যায় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্লেষণগত পার্থক্য দেখা যায়।

অর্থাপত্তি (Presumption/ Postulation)

অর্থাপত্তি একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত। আমরা দৈনন্দিন জীবনের প্রায়ই অর্থাপত্তি প্রমাণকে ব্যবহার করে থাকি। আমরা যখন কোনো বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যৌক্তিক বা জ্ঞাত কোনো কারণ খুঁজে পাই না তখন অজ্ঞাত কোনো কারণকে আমরা কল্পনা করে থাকি। এই অজ্ঞাত কল্পনানির্ভর কারণকেই অর্থাপত্তি বলা হয়ে থাকে। এম হিরিয়ানার ভাষায়, "This is postulating something to account for what apparently clashes with experience and is therefore in the nature of a hypothesis."[৪৭] এই অর্থাপত্তি প্রত্যক্ষণ, অনুমান এবং শব্দ প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয় নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সমীর না খেয়ে কলেজে গিয়েছে যখন বলা হয় তখন সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে সে ভাত না খেয়ে কলেজ গিয়েছে। এখানে ভাত শব্দটার কল্পনাকে অর্থাপত্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিষয়টি খুব সহজ করে বললে বোঝায়, অনিবার্য কোনো অজ্ঞাত কোনো বিষয়ের কল্পনাকে

গ্রহণ না করলে আপাত বিরোধের ক্ষেত্রে আমরা কোনো ধরনের সমাধান খুঁজে পাই না। আর এ জাতীয় অজ্ঞাত বিষয়ের কল্পনাকে অর্থাপত্তি বলা হয়। D. M. Datta এই অর্থাপত্তির স্বরূপ প্রসঙ্গে তাঁর *The Six Ways of Knowing* গ্রন্থে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন তা এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন,

> WHEN a Known fact cannot be accounted for without another fact, we have to assume or postulate the existence of that other fact. This process, in which knowledge of the fact to be explained leads to the knowledge of the fact that explain it, is called arthaputti.[৪৮]

ভাট্ট সম্প্রদায় এটিকে পঞ্চম প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মানমেয়োদয়কার নারায়ণভট্ট অর্থাপত্তির স্বতন্ত্র কোনো লক্ষণকে স্বীকার করেননি। তবে তিনি মনে করেন, অন্য কোনো কারণে অনুপপত্তি ঘটল তা মীমাংসা বা সমাধানকল্পে যে উপপাদকের কল্পনা করা হয় সেটাই অর্থাপত্তি। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা যায়, "উপপাদ্য-জ্ঞান যে প্রমাণে উপপাদক-জ্ঞানের করণ উহাকে অর্থাপত্তি-প্রমাণ বলা হয়।"[৪৯] 'অর্থ' শব্দ দ্বারা 'বাস্তব কোনো বিষয়' এবং 'আপত্তি' শব্দ দ্বারা 'কল্পনা'কে বোঝায়। অর্থাৎ বাস্তব বিষয়ের কোনো কল্পনা। বাক্যের অর্থ দ্বারা কোনো অবগত অর্থ অনুপপন্ন হয়ে থাকে তখন আমাদেরকে অন্য কোনো অর্থের কল্পনা করতে হয়, এক্ষেত্রে অভিহিতানুপপত্তি ঘটে থাকে।[৫০]

এখানে একটি অসাধারণ প্রমাণের সঙ্গে যখন একটি সাধারণ প্রমাণের বিরোধ দেখা দেয় তখন সেই অবিরুদ্ধ অংশে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাকে অর্থাপত্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়। মীমাংসা দার্শনিকগণ এই অর্থাপত্তিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা : দৃষ্টার্থাপত্তি এবং শ্রুতার্থাপত্তি।[৫১] দৃষ্টিগোচরীভূত কোনো বিষয়ের অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যখন অর্থাপত্তি প্রয়োগ করা হয় তখন সেটি হলো দৃষ্টার্থাপত্তি। আর যখন শ্রুত কোনো বিষয়ের অর্থ জ্ঞাপন করার জন্য অর্থাপত্তি প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে শ্রুতার্থাপত্তি বলা হয়। এই শ্রুত অর্থাপত্তিকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : অভিধানানুপত্তি এবং অভিহিতানুপত্তি। এই অভিধানানুপত্তিতে সাধারণত বাক্যের এক অংশ শুনলে অন্য অংশ কল্পনা করা যায়। আর যখন বাক্যের অর্থ দ্বারা কোনো অবগত অর্থ অনুপপন্ন হয়ে থাকে তখন আমাদেরকে অন্য কোনো অর্থের কল্পনা করতে হয়, এক্ষেত্রে অভিহিতানুপত্তি ঘটে থাকে। পরিশেষে এই অর্থাপত্তি প্রসঙ্গে আরও বলা যায়,

> As arthapatti arises out of a demand for explanation, it is different from a syllogistic inference the object of which to conclude from given facts, and not to explain given facts. Arthapatti is a search for grounds, whereas an inference is a search for consequents.[৫২]

অনুপলব্ধি (Non-Cognition)

ঐীমাংসা দর্শনের অন্যতম ভাষ্যকার কুমারিল ভট্ট অনুপলব্ধি নামক স্বতন্ত্র প্রমাণের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কোনো বিষয় বা বস্তুর অভাবজনিত জ্ঞানের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে কুমারিল ভট্ট এই অনুপলব্ধি নামক স্বতন্ত্র প্রমাণের উল্লেখ করেছেন।[৫৩] ধরা যাক, ফ্লাটের কোনো একটি কক্ষে ঢুকে আমরা যখন বলি, "এই কক্ষে কোনো পাখা নেই', তখন আমরা কিভাবে জানি, উক্ত কক্ষে কোনো পাখা নেই?" এখানে প্রত্যক্ষণ কিংবা অনুমানের সাহায্যে এই জ্ঞান লাভ করা যায় না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাথে কোনো বিষয়ের সংযোগ ছাড়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না। আর অভাব পদার্থের অস্তিত্বহীনতার কারণে এর সাথে ইন্দ্রিয়সংযোগ সম্ভবপর হয় না। তাই আমরা বলতে পারি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে এখানে অভাব বিষয়ের জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়। এই জ্ঞান আবার অনুমানলব্ধ নয়, কেননা অপ্রত্যক্ষ ও অভাবের মধ্যে কোনো ব্যাপ্তি সম্পর্ক লক্ষ করা যায় না। এই জ্ঞান আবার উপমানলব্ধও নয়। কেননা এখানে কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির অভাবের কথা বলা হয়নি। এম হিরিয়ানা তাঁর *Outlines of Indian Philosophy* গ্রন্থে এই অনুপলব্ধি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন যা নিম্নরূপ :

> The word anupalabdhi means the 'absence of apprehension,' i. e. the absence of knowledge derived through any of the five foregong Pramanas. This means that, as knowledge got trough any of the pramanas points to the existence (bhava) of objects, the absence of such knowledge indicates, other conditions remaining the same, their non existence (abhava).[৫৪]

এখানে আরও উল্লেখ করা যায় যে, আমরা যখন কোনো পদার্থের উপস্থিতি দেখি না তখন তার অভাব অনুপলব্ধি হয়। এই অনুপলব্ধিকেই ঐ পদার্থের অভাবজ্ঞানের করণ বলে এবং ঐ পদার্থের উপলব্ধির যে যোগ্যতা তাকে সহকারী কারণ বলে। আর প্রমার করণকেই বলা হয়ে থাকে প্রমাণ। অনুপলব্ধির ক্ষেত্রে যেহেতু অভাবজ্ঞানের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় সেজন্য ভাট্টমীমাংসকগণ এই অনুপলব্ধিকে অভাব প্রমাণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। ভাট্টমীমাংসকদের চিন্তার স্বরূপ সম্পর্কে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জী ও অধ্যাপক ধীরেন্দ্র মোহন দত্ত তাঁদের *An Introduction to Indian Philosopy* গ্রন্থে বলেন, "According to the Bhatta Mimamsa and the Advaita vedanta, non-perception (anupalabdhi) is the source of our immediate cognition of the non existence of an object."[৫৫] অদ্বৈতবেদান্ত দার্শনিকগণও অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কুমারিল ভট্ট এবং শবরস্বামীর মতে, অনুপলব্ধি হলো প্রকৃত অভাবের অনুভূতি।[৫৬] তবে

প্রভাকর মীমাংসকগণ অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র কোনো প্রমাণ হিসেবে মর্যাদা দেননি। তাঁরা মনে করেন, অভাব কোনো স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। তাই একে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে গণ্য করার কোনো দরকার পড়ে না। তাঁরা অনুপলব্ধিকে অনুমান ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে নারাজ। অনুপলব্ধি সবসময় বস্তুর অভাবের কারণ হিসেবে কাজ করে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অন্ধকার কোনো রুমে প্রবেশ করার পর আমরা সেখানে ফ্যান নাও দেখতে পারি। আবার অতিন্দ্রিয় কোনো বিষয়ের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। সেজন্য তাদের অস্তিত্ব নেই সেকথা প্রমাণ হয় না। তাই আমরা বলতে পারি, "যে অবস্থায় যে বস্তু প্রত্যক্ষীভূত হয়, সে অবস্থায় যদি সেই বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা না যায়, তাহলে তার অভাব আছে, এ কথা বলা যায়। এই জাতীয় অনুপলব্ধিকে যোগ্যানুপলব্ধি বলা হয়। যোগ্যানুপলব্ধিই প্রমাণ, সব অনুপলব্ধিই প্রমাণ নয়।"[৫৭]

মীমাংসা দার্শনিকগণ দুই প্রকারের অভাবপ্রমাণের কথা বলেছেন। যথা: প্রমাণাভাব ও স্মরণাভাব। প্রমাণের দ্বারা যখন কোনো প্রত্যক্ষণযোগ্য পদার্থের অভাব আমাদের কাছে অনুপলব্ধ হয় তখন তাকে প্রমাণাভাব বলে। আবার যখন কোনো স্মৃতি দ্বারা আমাদের কোনো পদার্থের অভাব অনুপলব্ধ হয় তখন সেই অভাব প্রমাণকে স্মরণাভাব বলা হয়ে থাকে। অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁর *ভারতীয় দর্শন* গ্রন্থে বেদান্ত-পরিভাষাকারের মতকে উদ্ধৃত করে অনুপলব্ধি প্রমাণের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যা এখানে হুবহু তুলে ধরা হলো :

[ক] কোন দেশ-কালে বস্তুর অভাবের অনুভূতি;

[খ] এই প্রকার অনুভূতি অপরোক্ষ এবং উপস্থাপনামূলক;

[গ] অনুপলব্ধির উৎপত্তি সাধারণ কারণে ঘটে না।[৫৮]

এই অনুপলব্ধির বিষয় হিসেবে আমরা চার প্রকার অভাবের (Non-existence) উল্লেখ দেখতে পাই। এগুলো হলো : প্রাগ্‌ভাব, প্রধ্বংসাভাব, অন্যোন্যাভাব এবং অত্যন্তাভাব। নির্দিষ্ট আকৃতি প্রকাশ করার আগে তার উপাদানে কোনো বস্তুর অনস্তিত্বগত বিষয়কে 'প্রাক্-অভাব' বলে। এই জাতীয় অভাব অনাদি হলেও এর শেষ আছে। অর্থাৎ বস্তুটি যখন সৃষ্টি হবে তখন আর তার প্রাগ্‌ভাব দেখা যাবে না।[৫৯] কোনো বস্তুর ধ্বংসাশেষের পরে তার চূর্ণ অংশের যে অনস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত হয় তাই 'প্রধ্বংসাভাব'। এই ধ্বংসাশেষ অনন্ত নয়, নতুন করে আবার আরম্ভ হয়, সৃষ্টি হয়।[৬০] একটি বস্তুর ক্ষেত্রে যখন অন্য আরেকটি বস্তুর অনুপলব্ধি হয় তখন এ জাতীয় অভাবকে আমরা অন্যোনাভাব বলি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় – 'পাত্রটি মৃন্ময় বস্তু নয়'।[৬১]

এই জগৎ নিত্য নয়, অনিত্য। অদ্বৈতবেদান্ত মতে এই অত্যন্তাভাব অনিত্য।[৬২] ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সব ধরনের অভাবের যে-কোনোটি অনুপলব্ধিগত বিষয় হিসেবে গণ্য হতে পারে। আবার ন্যায়বৈশেষিক মতে দুই প্রকার অভাবের কথা বলেছে যথা : সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। তাঁরা মনে করে প্রাগ্‌ভাব, ধ্বংসাভাব এবং অত্যন্তাভাব – এই তিনটিকে একত্রিতভাবে অন্যোন্যাভাব বলে।

পরিশেষে ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বের উৎস সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে অনুপলব্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলা যায়,

> When therefore all the five *Pramanas* fail to present an object (though it may be practically far from easy to know when this happens), Kumarila holds that the absolute non-existence of it may be deduced, This is the significance of "non-apprehension" as a separate *pramana* for knowing what are called "Negative facts" (abhava),[৬৩]

তবে জৈন দর্শনে জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত মূল প্রমাণ হিসেবে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষণ, অনুমান এবং শব্দকে মানা হলেও ভিন্নভাবে বিষয়টির ব্যাখ্যা আমরা দেখতে পাই। তবে জৈনদর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রত্যক্ষণের যে ব্যাখ্যা আমরা পাই তা অন্য সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন। জৈনরা পাঁচটি প্রমার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা: (১) মতি, (২) শ্রুতি, (৩) অবধি (৪) মনঃপর্যায় এবং (৫) কেবল। জৈন দার্শনিকগণ জ্ঞানকে মূলত পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। মতি ও শ্রুতি জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। আর অবধি মনঃপর্যায় এবং কেবল অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মতি জ্ঞান লাভ হয়। মন এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ছাড়া এই জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। শ্রুতজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি বা শাস্ত্রবাক্য পাঠ করে যে জ্ঞান হয় তাকে জৈন দার্শনিকগণ শ্রুতজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। জৈনশাস্ত্র এবং সিদ্ধপুরুষদের আপ্তবচন শ্রুতজ্ঞানের উৎস। মতিজ্ঞানে বস্তুর প্রকৃতি আমাদের কাছে যেভাবে প্রতিভাত হয় শ্রুতজ্ঞানে তা ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়। *সর্বদর্শনসংগ্রহে* মাধবাচার্য শ্রুতজ্ঞানকে তুলনামূলকভাবে মতিজ্ঞান থেকে উচ্চতর হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। আর অবধি, মনঃপর্যায় এবং কেবল জ্ঞান সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়, "যা কেবল সাধনা ও অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাবে জানা যায় তাকে 'অবধি' বলা হয়। যখন কোনো ব্যক্তি সরাসরি অপরের মানসিক অবস্থাগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, তখন তার জ্ঞানকে 'মনঃপর্যায় জ্ঞান' বলা হয়। সর্বকালের সর্বদেশের এবং সর্বপদার্থের সাক্ষ্যজ্ঞানকে 'কেবল জ্ঞান' বলা হয়।"[৬৪]

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের পরিসর বিস্তৃত এবং বিশাল। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে প্রকৃতপক্ষে উদারতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। জ্ঞানের উৎসের ক্ষেত্রে ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় একাধিক প্রমাণকে স্বীকার করে নিয়েছেন। আমরা সাধারণত ছয়টি উৎসের সন্ধান পাই। যথা : প্রত্যক্ষণ, অনুমান, শব্দ, উপমান অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে মূলত প্রগতিবাদী প্রায়োগিক একটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ফুটে উঠেছে একাধিক জ্ঞানের উৎসকে স্বীকার করার মধ্য দিয়ে। কেননা জীবন চলার পথে নির্বিচারবাদী একটি বা দু'টিউৎসের মধ্যে জ্ঞানের সন্ধান করলে জীবনের প্রয়োজনীতার পথ অনেকটা সীমিত হয়ে পড়ে, বন্ধ হয়ে যায় নতুনত্বের অনুসন্ধান। আমরা যদি পাশ্চত্যদর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখবো যে পাশ্চাত্যজ্ঞানতত্ত্বে বুদ্ধিবাদ শুধুমাত্র বুদ্ধিকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। অন্যদিকে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ শুধুমাত্র অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁরা অভিজ্ঞতার বাইরে কোনোকিছুকে স্বীকার করতে চান না। পাশ্চত্যদর্শনে বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ পরস্পর বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছে যাকে আমরা নির্বিচারবাদ হিসেবে অভিহিত করি। পরবর্তীতে অবশ্য বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদকে নির্বিচারবাদের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট বিচারবাদের কথা বলেন। কান্ট বুদ্ধিবাদের আকার এবং অভিজ্ঞতাবাদের উপাদান বা নতুনত্বকে একত্রিত করে এদরে মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন যা পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে বিচারবাদ হিসেবে অভিহিত। ভারতীয় জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা এদিক থেকে একটি সুসংহত রূপ লাভ করেছে। মানবজীবনের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে যে সেতুবন্ধন রচিত হয়েছে সেখানে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব। তাই বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় যে বিভিন্ন সমস্যা, সংকট পরিলক্ষিত হচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের চর্চা, অনুশীলন ও প্রয়োগ জরুরি। তাছাড়া মানবজীবনের মূল্যবোধ ও আদর্শ, নৈতিকতার উন্মেষ ঘটাতে হলে জ্ঞানচর্চার বিকল্প নেই। কেননা জ্ঞানচর্চা ও নৈতিকতার বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক মহামতি সক্রেটিসও মনে করতেন জ্ঞান ও নৈতিকতা অভিন্ন বিষয়। তাঁর নীতিতত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে জ্ঞানতত্ত্বের ওপর। এই পর্যবেক্ষণ থেকে বলা যায় মানুষের মহৎ, মানবোচিত নৈতিক জীবনে প্রবেশ করতে হলে জ্ঞানচর্চার কোনো বিকল্প নেই। আর এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব। তাই পরিশেষে একথা বলা যায় যে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের অনুশীলন এবং প্রয়োগ নিঃসন্দেহে আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করবে। সেজন্য ভারতীয় দর্শন তথা জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার পরিধি এবং প্রয়োগ আমাদের একাডেমিক পাঠ্যসূচিত অন্তর্ভুক্ত

করতে হবে। বিশেষ করে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এর প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে দেশ, জাতি তথা বিশ্ব উপকৃত হবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. S.N. Dasgupta, *A History of Philosophy*, Vol.1, (London : Cumbridge at the University Press, 1922), p. 330

২. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, পু.মু., (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ. ২৯৭

৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৮

৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৭

৫. S.N. Dasgupta, *op.cit.*, p. 382

৬. F. Thilly, *A History of Philosophy*, (Allahabad: Central Book Depot., 1978), p.56

৭. কালী প্রসন্ন দাস, *ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা: চার্বাক ও হিউম*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ১

৮. C.D. Bijalwan, *Indian Theory of Knowledge*, (New Delhi : Heritage Publishers, 1977), p. 38-39

৯. R.N. Sharma, *Indian Philosophy Problems & Theories*, (Delhi: Surjeet Publications, 2005), p. 36

১০. *Ibid*, p. 36

১১. সাইয়েদ আবদুল হাই, *ভারতীয় দর্শন*, (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭), পৃ. ৭

১২. মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শনে তত্ত্ববিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্ব*, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৯), পৃ. ৫০

১৩. Bertrand Russell, *An Inquiry into Meaning and Truth*, Reprinted, (Australia: Penguin Books Pvt. Ltd., 1963), p 115

১৪. S.N. Dasgupta, *op.cit.*, p. 338

১৫. M. Hiriyanna, *Outlines of Indian Philosophy, (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2000), p. 346*

১৬. S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol. 2, Fifteenth impression (New Delhi : Oxford University Press, 2006), p. 72

১৭. B.N. Seal, *The Positive Sciences of the Ancient Hindus*, (London : Longmans, Green and Co., 1915), p. 250

১৮. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

১৯. Chandrodaya Bhattacharya, *The Elements of Indian Logic and Epistemology*, (Calcutta : Modern Book Agency Private Ltd., 1975), p. 56

২০. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

২১. D. M. Datta, *The Six Ways of Knowing : A Critical Study of the Advaita Theory of Knowledge*, First MLBD Edition, (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2017), p. 209

২২. S.N. Dasgupta, *op.cit.*, p. 394

২৩. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫

২৪. Chandrodaya Bhattacharya, *op.cit.*, p. 192

২৫. *Ibid*, p. 192

২৬. Chandradhar Sharma, *A Critical Survey of Indian Philosophy*, (U.S.A.: Barnes & Noble Inc., 1962), p. 192

২৭. Chandrodaya Bhattacharya, *op.cit.*, p. 158

২৮. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

২৯. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৬

৩০. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

৩১. Chandradhar Sharma, *op.cit.*, p. 192

৩২. Robert Audi, *Epistemoloy : A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge*, Second Edition, (New York and London : Routledge, 2003) p. 140

৩৩. S.C. Chatterjee, *The Nyaya Theory of Knowledge : A Critical Study of Some Problems of Logic and Metaphysics*, (Calcutta : University of Calcutta, 1978), p. 320

৩৪. *Ibid*, p. 320

৩৫. Robert Audi, *op.cit.*, p. 148

৩৬. S.N. Dasgupta, *op.cit.*, p. 391

৩৭. অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, *পরিভাষা-প্রকাশিকা*, (কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৭), পৃ. ১৭৬

৩৮. অন্নম্ভট্ট, *তর্কসংগ্রহ দীপিকাসহ*, অনুবাদ, কানাইলাল পোদ্দার, (কলকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৮৮), পৃ. ২০৯

৩৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০

৪০. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২

৪১. S.C. Chatterjee and D.M. Datta, *An Introduction to Indian Philosophy*, (Calcutta : University of Calcutta, 1984), p.196

৪২. অন্নম্ভট্ট, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১

৪৩. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

৪৪. S.N. Dasgupta, *op.cit.*, p. 391

৪৫. M. Hiriyanna, *The Essentials of Indian Philosophy*, (London : George Allen & Unwin Ltd., 1949), p. 141

৪৬. মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

৪৭. M. Hiriyanna, *Outlines of Indian Philosophy, op.cit.*, p. 320

৪৮. D. M. Datta, *op.cit.*, p. 199

৪৯. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯০

৫০. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩

৫১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

৫২. S. C. Chatterjee and D. M. Datta, *op.cit.*, p. 327

৫৩. S.N. Dasgupta, *op.cit.*, p. 397

৫৪. M. Hiriyanna, *op.cit.*, p. 321

৫৫. S. C. Chatterjee and D. M. Datta, *op.cit.*, p. 327

৫৬. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৪

৫৭. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩

৫৮. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৫

৫৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৬

৬০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৬

৬১. *প্রাগুক্ত*, ৩৯৬

৬২. D. M. Datta, *Six Ways of Knowing : A Critical Study of the Advaita Theory of Knowledge*, (Calcutta : University of Calcutta, 1972), p. 180

৬৩. M. Hiriyanna, *The Essentials of Indian Philosophy, op.cit.*, p. 142

৬৪. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে প্রত্যক্ষণ

তৃতীয় অধ্যায়
ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে প্রত্যক্ষণ

দর্শনের জ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষণ, ধারণাগত জ্ঞান, স্বজ্ঞালব্ধ বিষয়সমূহের জ্ঞানের পাশাপাশি যৌক্তিক অনুমান, অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা দেখতে পাই। দার্শনিক জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সত্যের বিচারমূলক বা যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটনা বা বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বা নির্যাস উপস্থাপন করা। কেননা জ্ঞানতত্ত্ব তথা দর্শনের কাজ হলো সত্যের সাক্ষাৎ প্রতীতিকে যুক্তি এবং বিচারের মাধ্যমে তুলে ধরা। তাই যেকোনো দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে যুক্তি-বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সত্যের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। জ্ঞান বা প্রজ্ঞার অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শনের সকল অগ্রগতি এবং প্রগতি সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রাচ্যদর্শনের ভারতীয় দর্শন তার জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন ব্যাপকতার স্বাক্ষর রেখেছে অন্যদিকে তেমনি উদারতার মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় সব সময় বস্তুর বাহ্য এবং অন্তর রূপের স্বরূপের সন্ধান করেছে। তাঁরা অন্তর সত্তার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বাইরের জগৎকে বোঝার চেষ্টা করেনে। প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের চিন্তার কেন্দ্রে ছিল 'আত্মজিজ্ঞাসা' বা 'আত্ম-অন্বেষণ' যা ছিল একদিকে তাত্ত্বিক এবং অন্যদিকে প্রায়োগিক। ভারতীয় দর্শন তথা জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে তত্ত্ব এবং প্রয়োগের যে সম্বন্বয় আমরা দেখতে পাই পাশ্চাত্য দর্শনে তেমনটি দেখা যায় না। দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তৃত প্রেক্ষাপট এবং চিন্তার গভীরতা, উদারতা ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বকে স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করেছে। এই দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, একটি সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের আলোচনা বা মতবাদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। গুরুত্বসহকারে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের আলোচনা খণ্ডন এবং পর্যালোচনা করে নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থেকেছেন। অপরের চিন্তা এবং মতের প্রতি শ্রদ্ধা, গুরুত্ব, সহনশীলতা ভারতীয় জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনাকে করেছে সমৃদ্ধ এবং ঐতিহ্যবাহী। তাই ভারতীয় জ্ঞনতাত্ত্বিক আলোচনা নিজস্ব গুণে হয়ে উঠেছিল বিস্তৃত, সমৃদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য। তাই ভারতীয় জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা এবং এর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোনো উপয় নেই। প্রয়োজন রয়েছে এর বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণপূর্বক বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি উপস্থাপন করা। দর্শনের সাথে মানবজীবনের যে নিগূঢ় সম্পর্কে রয়েছে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করাই জ্ঞানতত্ত্বের অন্যতম কাজ। তাছাড়া দর্শনের জ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করতে সহয়তা করে। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা যে দুটি ভাগ দেখতে পাই সেখানে দার্শনিকগণ তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জ্ঞানতত্ত্ব

সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় দর্শনকে আস্তিক এবং নাস্তিক– এ দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হয়, তবে আস্তিক এবং নাস্তিক শব্দ দুটি ভারতীয় দর্শনে আবর্তিত হয়েছে বেদকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ বেদে বিশ্বাসী হলে এবং বেদকে প্রামাণ্য শাস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করলে আস্তিক হিসেবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হলেও চলে। অন্যদিকে যারা বেদে বিশ্বাসী নয় এবং বেদের প্রাধান্যকে মানতে নারাজ তাঁরা নাস্তিক হিসেবে পরিচিত। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের সাথে বিষয়টি এখানে সম্পর্কিত নয়। ভারতীয় দর্শনের অন্যতম সম্প্রদায় সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা এবং বেদান্ত বেদকে প্রামাণ্য এবং অভ্রান্ত হিসেবে গ্রহণ করার কারণে আস্তিক সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে চার্বাক, জৈন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় বেদের প্রাধান্য এবং কর্তৃত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করার কারণে সম্প্রদায় তিনটি নাস্তিক হিসেবে গণ্য। উল্লেখ্য যে, প্রায় সকল দার্শনিক সম্প্রদায় তাঁদের দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে নিজস্ব পথ এবং পদ্ধতি অনুসরণ করেনে। নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা নিজস্ব যুক্তি পদ্ধতি প্রণয়নের মধ্য দিয়ে নিজেদের মতামত এবং সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেনে। তবে উভয় দার্শনিক সম্প্রদায় তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় জ্ঞানের উৎসের ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে প্রত্যক্ষণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। বলতে গেলে এই প্রত্যক্ষণকে কেন্দ্র করেই যেন আবর্তিত হয়েছে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যা। তাই আলোচ্য অধ্যায়ে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রমাণ হিসেবে প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে বিচারমূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হবে। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমে আমরা প্রত্যক্ষণের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ এবং এর পরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আলোচনার বিচারমূলক দিকসমূহ তুলে ধরবো।

প্রত্যক্ষণ

ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেকটি সম্প্রদায় কোনোরূপ দ্বিধা এবং সন্দেহ ছাড়াই প্রত্যক্ষণের প্রামাণিক বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে প্রত্যক্ষণ বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জিত কোনো বিষয়ের জ্ঞানকে। প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষণের সন্ধি বিচ্ছেদ হলো প্রতি + অক্ষ = প্রত্যক্ষ। প্রতি দ্বারা কোনো বিষয়কে এবং অক্ষ দ্বারা ইন্দ্রিয়কে বোঝানো হয়ে থাকে। তাই আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি কোনো বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের গমনজন্য যে জ্ঞান তাকে প্রত্যক্ষণ বলা হয়। এখানে প্রত্যক্ষণ পদ দ্বারা কোনো বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের যে গমন তাকে ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয়ও বলা হয়ে থাকে। বিপরীতভাবেও বিষয়টিকে গ্রহণ করা হয়েছে।[১] যেহেতু বিষয়ের প্রতি এখানে ইন্দ্রিয় গমনও ঘটে তাই তাকে সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ও বলা হয়ে থাকে। তাই 'প্রত্যক্ষণ' পদ দ্বারা এখানে ইন্দ্রিয়কেও নির্দেশ করা হয়ে থাকে। তাহলে আমরা দেখছি যে, 'প্রত্যক্ষণ পদ দ্বারা তিনটি অর্থ এখানে নির্দেশিত হচ্ছে। বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য *ন্যায়সম্মত প্রমাণতত্ত্বের রূপরেখা* গ্রন্থ থেকে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, "প্রথমত,

'প্রত্যক্ষ' শব্দটির দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞানকে বোঝানো হয়। দ্বিতীয়ত, 'প্রত্যক্ষ' শব্দটির দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণকে বোঝানো হয়। তৃতীয়ত, 'প্রত্যক্ষণ শব্দটির দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়কে বোঝানো হয়। প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রসঙ্গে এই শব্দটিকে প্রত্যক্ষজ্ঞান অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।"[২] পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা লেখক Robert Audi তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *Epistemology* তে স্পষ্টতই প্রত্যক্ষণের এই প্রকার এবং উপাদানকে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন,

> There are apparently at least four elements in perception, all evident in our example : (1) the perceiver, me; (2) the object, the field I see; (3) the sensory experience, say my visual experience of colors and shapes; and (4) the relation between the object and the subject, commonly taken to be a causal relation by which the object produces the sensory experience in the perceiver.[৩]

ভারতীয় দার্শনিকগণ তাঁদের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনায় এই জাতীয় কথা বহু আগে বলে গেছেন। শুধু তাই নয় অনুমান, উপমান এবং শব্দপ্রমাণকে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব পরোক্ষ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করলেও তা মূলত প্রত্যক্ষ নির্ভর বিষয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক, "চারটি প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ শ্রেষ্ট। প্রত্যক্ষ যে অনুভব জন্মায় তার প্রমাণ্য নিয়ে সংশয় হয় না। তাছাড়া, অন্যান্য প্রমাণের মূলেও থাকে প্রত্যক্ষ।"[৪] ন্যায়দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম প্রত্যক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নম্ জ্ঞানম্ অব্যপদেশ্যম্ অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকম্ প্রত্যক্ষম্।"[৫] অর্থাৎ মহর্ষি গৌতম বলতে চেয়েছেন যে ইন্দ্রিয়ের সাথে যখন বিষয়ের সংযোগ ঘটে তখন আমরা সুনিশ্চিত জ্ঞান পাই যা ত্রুটিমুক্ত, অভ্রান্ত। আর এই জ্ঞানই হলো প্রত্যক্ষণ জ্ঞান। মহর্ষির এই ব্যাখ্যাকে যথার্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরবর্তীতে অন্নংভট্ট, বিশ্বনাথ এবং অন্যান্য নৈয়ায়িকগণও মহর্ষি গৌতমকে অনুসরণ করে প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তর্কসংগ্রকার অন্নংভট্ট এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্।"[৬] অর্থাৎ অন্নংভট্টের মতে ইন্দ্রিয়ের বিষয় বা অর্থের সংযোগ ঘটলে প্রত্যক্ষণ জ্ঞান হয়। এখানে ইন্দ্রিয় বলতে মূলত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং অর্থ বা বিষয় বলেতে ঘট, পট, বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের সাথে অর্থের সন্নিকর্ষের ফলে এখানে জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে। এখানে সন্নিকর্ষ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সাথে অর্থের সম্বন্ধকে বোঝানো হয়ে থাকে।[৭] অর্থাৎ,

কোন ব্যক্তির চোখের সামনে একটি ঘট আছে, এবং তিনি ঐ ঘটটি দেখিতেছেন। ঐ ব্যক্তির চক্ষু ইন্দ্রিয়, অর্থ ঘট এবং চক্ষুর সহিত ঘটের সংযোগ সন্নিকর্ষ হওয়াতে তিনি ঘটের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করিতেছেন। সুতরাং ঘট সম্বন্ধে তাঁহার এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমা।[৮]

এই প্রত্যক্ষণ জ্ঞানের আবার সমালোচনাও আমরা দেখতে পাই। যেমন: ঈশ্বর জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় কাজ করে না, এদিক থেকে বিবেচনা করলে ঈশ্বরের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ প্রমা বলা চলে না। অথচ সমস্ত পদার্থ সম্পর্কে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষজ্ঞান পরিলক্ষিত হয়। অন্নংভট্ট তাঁর *তর্কসংগ্রহ দীপিকসহ*-তে বলেন, ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।[৯] এছাড়া প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের মাঝে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়, যাকে প্রত্যক্ষণের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন এল. পলক এবং হ্যাম্পশায়ার কলেজের অধ্যাপক জোসেফ ক্রুজ তাঁদের *Contemporary Theories of Knowledge* গ্রন্থে। প্রত্যক্ষণের সমস্যা প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন,

> This is the problem of explaining how we can acquire knowledge of our physical surroundings through sense perception. For instance, we might judge that an object is red because it looks red to us. What justifies our reasoning in this way?[১০]

এই সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও পরিশেষে আমরা বলতে পরি যে, সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যকোনো ধরনের জ্ঞান করণ হয় না, তাকে প্রত্যক্ষণ জ্ঞান বলা হয়।

এখন পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত মতের বিচারমূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

সাংখ্য দর্শনে প্রত্যক্ষণ

ভারতীয় বৈদিক ষড়দর্শনের মধ্যে অন্যতম হলো সাংখ্য দর্শন। প্রাচীনতম চিন্তাধারার মধ্যে অন্যতম প্রতিনিধিত্বকারী দর্শন হলো এই সাংখ্য দর্শন। সাংখ্য দর্শনের প্রাচীনতা সম্পর্কে পণ্ডিতগণ দ্বিমত পোষণ করেননি। এই দর্শনের উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর বিজ্ঞানসম্মত এবং যুক্তিবাদী চিন্তাধারা। মহর্ষি কপিল ছিলেন এই যুক্তিবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রবর্তক। তাই কপিলের নামানুসারে এই দর্শনকে আবার "কপিলদর্শন" ও বলা হয়ে থাকে। মহর্ষি কপিলের চিন্তাধারা সম্পর্কে Richard Garbe গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যা এখানে উল্লেখ করা হলো :

"In Kapila's Doctrine, for the first time in the history of the world, the complete independence and freedom of human mind, its full confidence in it's own powers, were exhibited."[১১]

সাংখ্য দর্শনে সাংখ্য শব্দের ক্ষেত্রে আমরা দুটি অর্থ দেখতে পাই একটি হলো 'সম্যক জ্ঞান" এবং অন্যটি হলো "সংখ্যাবোধক তত্ত্ব" বা সংখ্যার ধারণাতত্ত্ব।[১২] এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য উল্লেখ করা যায়, "সংখ্যাবাচক অর্থেও এই দর্শনটির নামকরণকে ব্যাখ্যা করা যায়। জ্ঞানের সঙ্গে সংখ্যাবাচক ব্যাখ্যার মূলত কোনো পার্থক্য থাকে না। সাংখ্য দর্শনের সংখ্যা ছাড়া কথা নাই। সমস্ত সাংখ্য দর্শনটি সংখ্যাজ্ঞান দ্বারা বিন্যস্ত।"[১৩] এই সাংখ্য দর্শন তত্ত্ববিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, কার্যকারণবাদ, নীতিবিদ্যা, আত্মাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেও জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া, উপায় এবং কারণের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। এখন নিম্নে সাংখ্য দর্শনের জ্ঞানবিদ্যক আলোচনার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রধান বিষয় প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

সাংখ্য জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে মোক্ষোপযোগী ছাড়াও এক ধরনের ব্যবহারিক জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। এই জ্ঞান হলো দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন হওয়ার ব্যবহারিক জ্ঞান। সাংখ্য দার্শনিকরা জ্ঞানকে সবিষয়ক জ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেছেন। এখানে জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের কর্তাকে জ্ঞাতা হিসেবে ধরা হয়। সাংখ্য দর্শন মনে করে একমাত্র পুরুষই জ্ঞাতা হিসেবে বিবেচিত। কেননা পুরুষ ছাড়া অন্য সকল তত্ত্বই অচেতন প্রকৃতির তাই তা কেবলমাত্র জ্ঞেয় হিসেবে পরিগণিত। সাংখ্যকাররা মনে করেন এই জ্ঞেয়বস্তু একাধিক জ্ঞাতা কর্তৃক জ্ঞাত হতে পারে। তবে একটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জ্ঞাতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ জ্ঞান হতে পারে। সাংখ্য মতে মন বা বুদ্ধি চেতনহীন পদার্থ, শুধুমাত্র পুরুষের চৈতন্য আছে। তাই পুরুষের পক্ষে জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। তবে এই পুরুষের পক্ষে সরাসরিভাবে জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না, তবে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিয়ে পুরুষ জ্ঞান লাভ করে থাকে। সাংখ্য দার্শনিকরা মনে করেন যে-কোনো বিষয় বা ঘটনার জ্ঞান লাভ করতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। এগুলো হলো: জ্ঞাতা বা প্রমাতা, জ্ঞেয় বা প্রমেয় এবং প্রমাণ (জ্ঞান লাভের উপায়)। সাংখ্য দর্শন ত্রিবিধ বা তিনটি প্রমাণকে স্বীকার করেছে। যথা: প্রত্যক্ষণ, অনুমান এবং শব্দ।[১৪] অন্যকোনো প্রমাণকে সাংখ্য দর্শন স্বীকার করেনি। ভারতীয় প্রাচীন চিন্তাধারাপন্থী এই দর্শন মূলত বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে অনুসরণ করেছে। সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি কপিল বৈধজ্ঞানের স্বরূপ প্রসঙ্গে পূর্বে জ্ঞাত হয়নি এমন কোনো বিষয় বা বস্তুর সবিকল্প জ্ঞানকে নির্দেশ

করেছেন।[১৫] বৈধ জ্ঞান হয় নির্দিষ্ট এবং সবিকল্প। তাছাড়া নতুনত্ব, সুনির্দিষ্টতা এবং যথার্থতা হলো এই জ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাংখ্যমতে প্রত্যক্ষণ হচ্ছে জ্যেষ্ঠ ও প্রধান প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষণই অন্যান্য প্রমাণের উপজীব্য বিষয় হিসেবে কাজ করে, তাই সাংখ্য দার্শনিকরা এই প্রত্যক্ষণ প্রমাণকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কোনো বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয় সংযোগের ফলে যে সাক্ষাৎ বা সরাসরি জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে তাকে 'প্রত্যক্ষণ' জ্ঞান বলা হয়ে থাকে। এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুটি আমাদের চোখের সামনে থাকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষকারীর চোখ এবং বস্তুর মাঝখানে বাঁধা সৃষ্টিকারী কোনো বস্তু থাকে না। ফলে তখন সাক্ষাৎভাবে স্পষ্টত জ্ঞান লাভ হয়। এখানে প্রত্যক্ষকারীর চোখের মধ্যে এক প্রকার সংবেদন তৈরি হয় আর আমাদের মন সেই সংবেদনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ঘটলে অন্তঃকরণ বিষয়াকার ধারণ করে, আর এর ফলে অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণের আধিক্য পরিলক্ষিত হয় যাকে অন্তঃকরণবৃত্তি বা জ্ঞান বলে। আর এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত।[১৬] সাংখ্য দার্শনিকরা মনে করেন আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ কারণ হিসেবে কাজ করে। সাংখ্যকাররা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহংকার ও মনকে একত্রিতভাবে জ্ঞানের করণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মোটকথা সাংখ্যকাররা বলতে চেয়েছেন প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় ইন্দ্রিয় দ্বারা যথার্থ জ্ঞান পেয়ে থাকি। কিন্তু বাচস্পত্তি মিশ্র সাংখ্যকারদের এই বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি মনে করেন, ইন্দ্রিয়গুলো মাঝে মাঝে যথার্থ বা সঠিক জ্ঞান উৎপন্ন করলেও সকল সময় আমাদেরকে নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না। ফলে ইন্দ্রিয়গুলোকে করণ বলে অভিহিত করতে পারি না। বাচস্পতি মনে করেন, কোনো বিষয় বা বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান তখনই হয় যখন, ঐ বিষয় বা বস্তু আকারে আকারিত বুদ্ধিতে চৈতন্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। অন্যদিকে বিজ্ঞান ভিক্ষুর মত ভিন্ন। তিনি মনে করেন, বুদ্ধিবৃত্তি শুধুমাত্র বুদ্ধিরই বৃত্তি। এটি মনোবৃত্তি বা অহংবৃত্তি নয়। কেননা তাঁর মতে সংশয় এবং অভিমান হলো মনের এবং অহংকারের বৃত্তি। আর অভিমানের অর্থ হচ্ছে আত্মজ্ঞান। তাই অনাত্মায় আত্মজ্ঞান কিংবা সংশয় কখনো প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।[১৭] বাচস্পতি মিশ্র আবার ভিক্ষুর এ মতের সাথে একমত নন। তিনি মনে করেন মনোবৃত্তিও নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। অন্তঃকরণ বৃত্তিকে বাচস্পতি মিশ্র 'বুদ্ধিবৃত্তি' হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সাংখ্য মত পূর্ববর্তী জানা কোনো বিষয় থেকে উৎপন্ন হয়নি। এ ধরনের যে নিশ্চিত ধারণা তাকে যথার্থ জ্ঞান মানে। সাংখ্যকাররা মনে করেন জ্ঞানের যথার্থতা অন্যকোনো জ্ঞান বা অন্যকিছুর ওপর নির্ভর করে না। সেজন্য জ্ঞান হলো স্বতঃপ্রমাণ। তাঁরা

মনে করেন ভ্রান্তি জ্ঞান হলো স্বতঃই ভ্রম। অর্থাৎ যেখানে যে বস্তু নেই সেখানে যদি আমরা সে ধরনের কোনো বস্তুর ধারণা করে থাকি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দঁড়ি দেখে যেমন সাপের ভ্রম হয়ে থাকে। তাই সাংখ্য মতে কোনো বস্তু কোনখানে যে অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে যদি সঠিক ধারণা হয় তাহলে সেটি যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা।

প্রত্যক্ষণের শ্রেণিবিভাগ

প্রত্যক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা এর বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ দেখতে পাই। উপায়গত ভিন্নতার দিক থেকে প্রত্যক্ষণ দুই প্রকারের। যথা: লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষণ। আবার প্রকৃতিগত দিক থেকেও প্রত্যক্ষণ দুই ধরনের। যথা: সবিকল্প প্রত্যক্ষণ ও নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ।[১৮] এখন এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

যে প্রত্যক্ষণে বাহ্যবস্তুর সাথে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সরাসরি সংযোগ ঘটে তাকে লৌকিক বা বাহ্য প্রত্যক্ষণ বলে। এখানে মূলত: আমাদের চোখ, কান, নাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাথে বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষণ ঘটে। এখানে মূলত: আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান অর্জন করে থাকি। অন্যদিকে অলৌকিক প্রত্যক্ষণে অন্তরিন্দ্রিয় এবং স্বজ্ঞাজাত বিষয়ের অর্জিত জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। এই অলৌকিক প্রত্যক্ষণে মূলত যোগী, ঋষি, মনীষী, সন্ন্যাসীদের অলৌকিক চিন্তনশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। এই মুনি-ঋষি, সন্ন্যাসীরা তাঁদের মানসচক্ষু দ্বারা সুদূর অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানকে দেখতে পান। তাঁদের মানসচক্ষুতে ধরা পড়ে ক্ষুদ্র বস্তু, বিষয় এবং ঘটনাবলি। তাঁদের অন্তরাত্মার বোধজাত এই উপলব্ধিকে অলৌকিক প্রত্যক্ষণ বলা হয়।

প্রত্যক্ষণের প্রকৃতিগত দিক থেকে আমরা পাই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষণকে। একে আবার কেউ কেউ বাহ্য প্রত্যক্ষণের ভাগ হিসেবে অভিহিত করেছেন। যে প্রত্যক্ষণের সাহায্যে আমরা কেবলমাত্র বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি তাকে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ বলে। এই প্রত্যক্ষণে আমরা কোনো বস্তুকে শুধুমাত্র বস্তু বলে জানি এখানে আমাদের কেবলমাত্র বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। বস্তুটির জাতি, ধর্ম, সংজ্ঞা প্রভৃতি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নির্বিকল্পে প্রত্যক্ষণে হয় না। তাই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের জ্ঞান বস্তু সম্পর্কে অস্পষ্ট জ্ঞান। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি বই এর সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের এই জ্ঞান হয় যে এটা একটা বস্তু। কিন্তু এর আকৃতি, রং, কার্যকারিতা প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান হয় না। বই সম্পর্কে আমাদের এই প্রাথমিক জ্ঞানকে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ বলে। সংক্ষেপে বলা যায় বস্তুর সহজ উপলব্ধি হলো নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ। এই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের জ্ঞান ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।[১৯] কোনো বস্তু সম্পর্কে শিশুরা যে ধরনের

জ্ঞান লাভ করে তাকে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করলে বিষয়টির স্পষ্ট রূপ বুঝতে পারা যায়। তবে বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং বিস্তৃত জ্ঞান পাওয়া যায় সবিকল্প প্রত্যক্ষণে।

পক্ষান্তরে, সবিকল্প প্রত্যক্ষণে আমরা বস্তুর নাম, ধর্ম, লক্ষণ, জাতি, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সঠিক জ্ঞান লাভ করি। এখানে বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সুনির্দিষ্ট রূপ পায়। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট সংবেদনজাত বিষয়গুলো মানবমনের বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণী প্রক্রিয়ায় এখানে সংখ্যাখ্যাত হয়ে থাকে। এই সবিকল্প প্রত্যক্ষণকে ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায়। অধ্যাপক সাইয়েদ আবদুল হাইয়ের বক্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, "যে প্রত্যক্ষণে বস্তুর নাম, লক্ষণ, জাতি প্রভৃতি যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞান হয় তা সবিকল্প প্রত্যক্ষণ। সবিকল্প প্রত্যক্ষণে বিশ্লেষণ, সাদৃশ্য, তুলনা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে বস্তু সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান হয়।"[২০] এই সবিকল্প প্রত্যক্ষণকে আমরা ভাষা দ্বারা প্রকাশ করতে পারি। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণে যে অস্পষ্ট রূপটি পরিলক্ষিত হয় তা সবিকল্প প্রত্যক্ষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণকে বলা হয় প্রথম স্তর, আর সবিকল্প প্রত্যক্ষণকে বলা হয় দ্বিতীয় স্তর। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের অপরিপক্ব রূপটি সবিকল্প প্রত্যক্ষণে এসে পরিপক্বতা লাভ করে।

সাংখ্য দর্শন প্রত্যক্ষণ জ্ঞানের যে চতুর্বিধ প্রকরণ এবং এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। সাংখ্যকারদের বিশ্লেষণধর্মী যৌক্তিক চিন্তায় যে কার্যকারণ দিক আমরা দেখি তা আমাদেরকে সামনের প্রগতির পথে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। তাই বলা যায় সাংখ্যকারদের জ্ঞানতাত্ত্বিক চিন্তা জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসকে করেছে আরো সমৃদ্ধ। আর এর ফলে মানবজাতি পেয়েছে প্রগতি ও কল্যাণের পথ।

যোগ দর্শনে প্রত্যক্ষণ

ভাববাদী দর্শন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম দর্শন হলো যোগদর্শন। ভারতবর্ষের প্রাচীন একটি দর্শন হলো যোগ দর্শন। সাংখ্য এবং যোগ দর্শনকে সমসাময়িক বলা হয়ে থাকে। এই যোগ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রবর্তক হিসেবে আমরা মহর্ষি পতঞ্জলির নামকে জানতে পারি। তাই পতঞ্জলির নাম অনুসারে অনেকে যোগ দর্শনকে 'পতঞ্জলদর্শন' নামেও অভিহিত করে থাকে। সেজন্য সাংখ্য এবং যোগকে একই দর্শনের ভিন্ন দুটি দিক হিসেবে মনে করা হয়। সাংখ্য দর্শনের ব্যবহারিক দিকনির্দেশনাই যোগ দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ সাংখ্যতে আমরা পাই তত্ত্বগত দিক আর যোগদর্শনে দেখি এর প্রায়োগিক দিকটি। তবে যোগ দর্শনের মূলগ্রন্থ 'যোগসূত্র' পতঞ্জলির রচিত। পতঞ্জলির এই 'যোগসূত্রে' আমরা ১৯৪টি সূত্রের সন্ধান পাই। এই সূত্রগুলো আবার চারটি পরিচ্ছেদে

বিভক্ত। যথা : (১) সমাধিপাদ, (২) সাধনপাদ, (৩) বিভূতিপাদ এবং (৪) কৈবল্যপাদ। এই প্রথম পরিচ্ছেদের সমাধিপাদেই যোগ দর্শনের স্বরূপ, প্রকৃতি, প্রকার, জ্ঞানতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়।

জন্ম, মৃত্যু এবং জগৎ সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সাধনাই ছিল যোগ দর্শনের মূলমন্ত্র। বৈরাগ্য এবং ধ্যানকে তারা মুক্তির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে।[২১] সাংখ্য দর্শন এবং যোগ দর্শনের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হলেও ঈশ্বর বিষয়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি, কিন্তু যোগ দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। তবে পতঞ্জলি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করলেও তা তাঁর দর্শনে অপরিহার্য বিষয় নয়। সাংখ্য দর্শনে তত্ত্বালোচনা তথা জ্ঞানের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। আর যোগ দর্শনে এর প্রয়োগবিধিই প্রধান্য পেয়েছে। সাংখ্য অধিবিদ্যা এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের বেশির ভাগ যোগ দর্শন গ্রহণ করেছে। তাই জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার দিক থেকে সাংখ্য এবং যোগ দর্শনের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। সাংখ্য দার্শনিক সম্প্রদায় যেমন তাঁদের জ্ঞানতত্ত্বে প্রত্যক্ষণ, অনুমান এবং শব্দকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তেমনি যোগ দর্শনও প্রত্যক্ষণ, অনুমান এবং আগম বা শব্দকে প্রমাণ হিসেবে মেনেছেন। যোগ দর্শন জ্ঞানের এবং কর্মের ওপর সমানভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। এই দর্শনে জ্ঞান, ধ্যান এবং কর্মকে মোক্ষ লাভের উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মোক্ষলাভের উপায়ের ক্ষেত্রে এই দর্শন জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছে।[২২] কেননা পতঞ্জলি নিজে জ্ঞানযোগকেই 'রাজযোগ' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[২৩] মানবমনের সংযমের নির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে যোগ দর্শন মানুষের চিত্তের বিশ্লেষণ দেখিয়েছে। যোগ দর্শনে বুদ্ধি, অহংকার এবং মন - এই তিনটি তত্ত্বকে একত্রে চিত্ত হিসেবে অভিহিত করেছে। যোগ দর্শন মনে করে মন কর্তৃক চিত্ত বিষয়রূপ ধারণ করে, আর তখন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ যোগ দর্শন মতে, মানবমন দ্বারা চিত্ত কোনো বিষয়ের সাথে যুক্ত হলে তা সেই বিষয়ের আকার ধারণ করে, ফলে তখন সেই বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়। আর চিত্তের এই বিষয়াকার গ্রহণ করাকেই চিত্তবৃত্তি বলে অভিহিত করা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে জ্ঞান হলো চিত্তের বৃত্তি বা বিকার। আর এই চিত্তের বিকার বা বৃত্তির কারণেই আমাদের আত্মার মধ্যে বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। যোগ দর্শন পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তির কথা বলেছে। যথা: প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি।

প্রমাণের মাধ্যমেই যথার্থ জ্ঞান অর্জিত হয়। এই প্রমাণ হলো সত্য জ্ঞান (True Cognition) বা বৃত্তি। সাংখ্য দর্শনের মতো যোগ দর্শনও প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ

করেছে। আমাদের আলোচ্য বিষয়ানুযায়ী এখন যোগ দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

প্রত্যক্ষণ

আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের সাথে বাইরের বস্তুর যখন সংযোগ ঘটে তখন আমাদের চিত্তে ঐ বস্তুর অনুরূপ এক ধরনের বৃত্তি সৃষ্টি হয়, এই বৃত্তিকেই প্রত্যক্ষণ বলা হয়।[২৪] যোগ দর্শন মতে আমাদের ইন্দ্রিয় প্রণালির সাহায্যে বাহ্য এবং মানসিক বিষয়ের প্রত্যক্ষণ ঘটে। এই দর্শনে প্রত্যক্ষণ বলতে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ যখন বাহ্যবস্তুর দ্বারা উপরঞ্জিত হয় তখন ইন্দ্রিয় প্রণালী থেকে আগত বিষয়ের চিত্তে এক ধরনের বৃত্তি উৎপন্ন হয় যাকে প্রত্যক্ষণ প্রমাণ বলে। যোগ দর্শন সার্বিক এবং বিশেষ দুই ধরনের বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা বললেও বিশেষ বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছে। কেননা বিশেষ বিষয় হল বাস্তব গুণসমূহ আর সার্বিক বিষয় হল জাতি, সত্তা প্রভৃতি। আর প্রত্যক্ষণ জ্ঞানের এই বৈশিষ্ট্যই তাকে অনুমান থেকে পৃথক করেছে। কেননা অনুমানগত জ্ঞানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সামান্য লক্ষণের জ্ঞান হয়ে থাকে। যোগ দর্শন সাংখ্য দর্শনের বাহ্য ও আন্তর প্রত্যক্ষণকে স্বীকার করে নিয়েছে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাথে বাহ্য বস্তুরসমূহের সরাসরি সন্নিকর্ষ বা সংযোগের ফলে যে জ্ঞান সৃষ্টি হয় তাকে বাহ্য প্রত্যক্ষণ বলে। এই বাহ্য প্রত্যক্ষণ পাঁচ ধরনের হয়ে থাকে। যথা: চাক্ষুষ, শ্রবণ, ঘ্রাণজ, স্বাদ এবং স্পর্শন প্রত্যক্ষণ।[২৫] অন্যদিকে আমাদের মনের সাথে মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার সংযোগের ফলে যে বৃত্তি লাভ বা জ্ঞান হয় তাকে আন্তর প্রত্যক্ষণ বলে। এখানে আমাদের মনের সাথে ইচ্ছা, অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক বিষয়সমূহের সংযোগ সৃষ্টি হয়। মন এখানে সুখ, দুঃখ, বেদনা, হিংসা, জ্ঞান প্রত্যক্ষণ করে থাকে। এই প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে মন গুরুত্বপূর্ণ, মন ছাড়া প্রত্যক্ষণ হবে না। তবে এই বাহ্য প্রত্যক্ষণে ইন্দ্রিয়ের সাথে মনঃসংযোগ তৈরি হলে প্রত্যক্ষণ সম্ভবপর হয়ে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, যোগ দর্শন তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রত্যক্ষণকে গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যদিও যোগ দর্শনে অনুমান এবং শব্দেরও আলোচনা আমরা দেখি তবে প্রত্যক্ষণগত জ্ঞানের স্বীকৃতি এবং স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান সাংখ্য এবং ন্যায় দর্শনের অনুরূপ। সেজন্য প্রত্যক্ষণগত জ্ঞানের যে বিশেষ গুরুত্ব তাঁরা প্রদান করেছে তা মানবজীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাকে করেছে আরো কার্যকরী এবং সমৃদ্ধ। তাই যোগ দর্শনের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনা সময়ের বিবেচনায় সেরা আলোচনা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই যোগ দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যক্ষণগত জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষ আত্মশুদ্ধি, মনঃসংযম এবং চিত্তে প্রশান্তি লাভ করবে। অর্থাৎ যোগ দর্শন মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হিসেবে মোক্ষ

বা মুক্তি লাভের যে পথ নির্দেশ করেছে তা আসবে মূলত জ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে। আর এই যোগ দর্শনের মতে এই জ্ঞান সাধনার জন্য প্রায়োগিক দিক ধ্যান, ধারণা এবং ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষণ

আস্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত দর্শন হিসেবে ন্যায় দর্শনের পরিচিতি। বেদকে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করার কারণে এই দর্শনকে আস্তিক দর্শন বলা হয়। জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্তুর স্বাধীন সত্তাকে স্বীকার করার কারণে এই দর্শন বস্তুবাদী। এই দর্শন স্বাধীন চিন্তা, যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং বিচার প্রক্রিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তর্কবিদ্যা এবং জ্ঞানবিদ্যাগত প্রশ্নসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা দেখতে পাই এই ন্যায় দর্শনে। বৌদ্ধিক, যৌক্তিক এবং বিশ্লেষণী ধারা এই দর্শনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত। তাই এই দর্শনকে তর্কশাস্ত্র, প্রমাণশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র হেতুবিদ্যা, আন্বীক্ষিকীবিদ্যা বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। এই দর্শনে বিশেষ করে যুক্তি প্রণালির আকার প্রকারগত আলোচনার পাশাপাশি জ্ঞানতত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[২৬] জার্মান পণ্ডিত হারম্যান জ্যাকবির মতে এই ন্যায় দর্শনের আবির্ভাবকাল ২০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৪৫০ খ্রিষ্টাব্দ এর মধ্যে।[২৭]

মহর্ষি গৌতম এই ন্যায় দর্শন তথা ন্যায় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। মহর্ষি গৌতমের আরেক নাম অক্ষপাদ। তাই তাঁর নামানুসারে এই দর্শনকে আবার অক্ষপাদদর্শনও বলা হয়ে থাকে। মহর্ষি গৌতম প্রণীত *ন্যায়সূত্র* ন্যায়দর্শনের প্রথম গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম ন্যায়জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, "জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্র বিশ্বের প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বিকশিত, সূক্ষ্ম এবং বিস্তারিত বলে বিবেচনা করা হয়।"[২৮] বস্তুবাদী এই দর্শন মানুষকে সঠিক চিন্তার পথ নির্দেশ করে। এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যায়,

> This Philosophy is primarily concerned with the condition of correct thinking and the means of acquiring a true knowledge of reality. It is very useful in developing the powers of logical thinking and rigorous criticism in its students.[২৯]

ন্যায় দর্শনের অনুশীলন অনুসারীদের জন্য চিন্তার উৎকর্ষতা সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিজীবনে যথার্থ জ্ঞান অর্জনে এই দর্শন বেশ সহায়ক। ব্যক্তিজীবনে চিন্তা প্রণালির প্রয়োগ এবং কার্যকারিতার প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা আমরা এই দর্শনে দেখতে পাই। এই ন্যায়দর্শনের গুরুত্ব এবং যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেন, "...The Nyaya and the vaisesika represent

the analytic type of Philosophy, and uphold common sense and seience, instead of dismissing them as "moonbeams from the larger lunacy,"[৩০]

এই ন্যায় দর্শনে অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের ন্যায় জ্ঞানতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, জীবাত্মার মুক্তি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র যেহেতু ন্যায় জ্ঞানতত্ত্বে প্রত্যক্ষণ তাই আমাদের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ থাকবে।

ন্যায় দর্শনে বস্তুর জ্ঞান নিরপেক্ষ, মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। ন্যায় দর্শন মনে করে জ্ঞান হলো বিষয়ের প্রকাশ। জ্ঞান এবং বুদ্ধিকে নৈয়ায়িকরা সমর্থক বলে মনে করেন।[৩১] জ্ঞানের কাজ হলো বস্তুকে আমাদের সামনে প্রকাশ করা। প্রদীপের মতো জ্ঞানও স্বতন্ত্র বস্তু বা পদার্থকে আলোকিত করে, প্রকাশ করে। আর জ্ঞাতা যখন এই পদার্থকে জানে তখন এই পদার্থ জ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয় হিসেবে ধরা দেয়। ন্যায় দর্শনে আত্মাকে 'জ্ঞাতা' হিসেবে এবং পদার্থকে 'বিষয়' হিসেবে গণ্য করার পাশাপাশি মন, ইন্দ্রিয়সমূহকে করণ হিসেবে দেখা হয়েছে। ন্যায় মতে জ্ঞানের স্বরূপের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে জ্ঞান হলো **ত্রি-ক্ষণস্থায়ী**। এখানে প্রথমক্ষণে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি লাভ করে এবং তৃতীয়ক্ষণে তার বিনাশ সাধিত হয়। তবে দ্বিতীয়ক্ষণের স্থিতি বা স্থায়িত্ব কতটুকু পরিমাণ কালকে নির্দেশ করে তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। ন্যায় দর্শনে জ্ঞান নির্ভর করে বস্তুর অস্তিত্বের ওপর। আর ইন্দ্রিয়জাত বাহ্যবস্তুর সংযোগে জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে। জ্ঞান হলো এখানে বিষয়ের উপলব্ধি। তাই এই দর্শনের সংক্ষিপ্ত সুরে আমরা বলতে পারি, যা দিয়ে বিষয়ের প্রকাশ হয়ে থাকে তাই জ্ঞান। ন্যায় দর্শনে পদার্থের জ্ঞানকে অনুভব বলে। এই অনুভব আবার দুধরনের– যথার্থ অনুভব এবং অযথার্থ অনুভব। বিষয়ের অনুরূপ হলে তাকে অযথার্থ অনুভব বলে। উল্লেখ্য যে 'যথার্থ' শব্দটির দ্বারা প্রকৃত (যথা) এবং বিষয়কে (অর্থ) বোঝানো হয়েছে। নৈয়ায়িকগণ এই যথার্থ অনুভবকে প্রমা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই প্রমা হলো নিঃসন্দিগ্ধ এবং নিশ্চিত জ্ঞান। অন্যদিকে কোনো বিষয় যদি স্বভাবের অনুরূপ অনুভব না হয়ে যদি ভিন্ন ধরনের অনুভব হয় তাহলে তাকে অপ্রমা বলে। যেমন : দঁড়ি দেখে সাপ মনে করলে অযথার্থ অনুভব হয়। কেননা দঁড়িতে সাপের জ্ঞান হলো এক ধরনের ভ্রম। ন্যায় দর্শনে প্রমা এবং অপ্রমার শ্রেণিবিভাগ লক্ষ করা যায়। এই দর্শনে আমরা প্রমার চারটি ভাগ দেখতে পাই। যথা: প্রত্যক্ষণ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ।[৩২] অপ্রমার ক্ষেত্রেও আমরা চারটি ভাগ দেখতে পাই। যথা: স্মৃতি, সংশয়, বিপর্যয় বা ভ্রম এবং তর্ক। ন্যায় দার্শনিকদের জ্ঞান সম্পর্কীয় অভিমত প্রসঙ্গে ড. নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের কিছু জ্ঞানতাত্ত্বিক ও অধিবিদ্যাগত সমস্যা* শীর্ষক গ্রন্থে এই প্রমা ও অপ্রমা সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা এখানে খুব প্রাসঙ্গিক, "নৈয়ায়িকগণ মনে করেন, একটি জ্ঞান গুণবশত 'প্রমা' হয় এবং দোষবশত 'অপ্রমা' হয়। জ্ঞানের কারণ সামগ্রী যখন প্রমাণ গুণউৎপাদক হয় তখন তাকে আমরা 'প্রমা' বলি। অপরদিকে জ্ঞানের

কারণ সামগ্রী যদি জ্ঞানের দোষ উৎপাদক হয় তাহলে জ্ঞানটিকে 'অপ্রমা' বলি। সুতরাং জ্ঞানের গুণ বা দোষবশতই জ্ঞানটি প্রমা ও অপ্রমা হয়ে থাকে।"[৩৩]

এখন উল্লিখিত ন্যায়জ্ঞানতত্ত্বের প্রকারভেদের বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো :

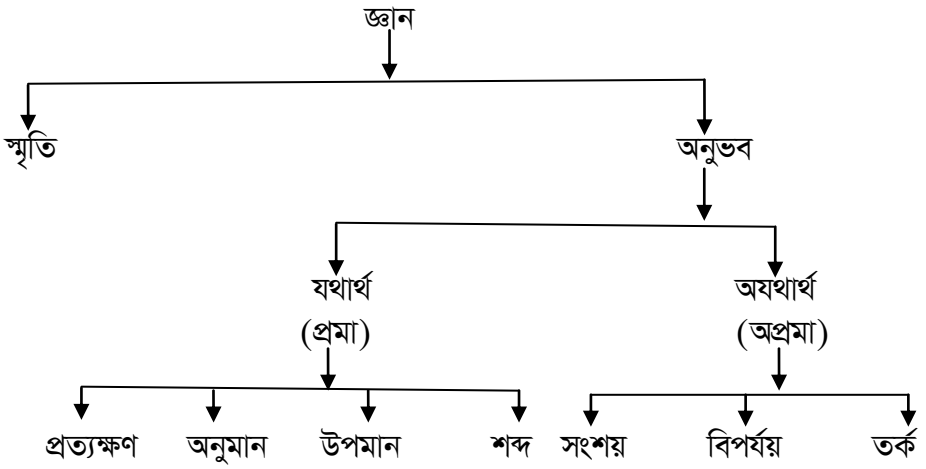

চিত্র : ন্যায় জ্ঞানতত্ত্ব

ন্যায় দার্শনিগণ তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রত্যক্ষণকে সর্বপ্রথমে স্থান দিয়েছেন। প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে ন্যায়মত ছিল এরূপ, "The *NyS* definition of perception mentions sense organ/object connection, which becomes a general condition for certification of perceptual knowledge of all sorts."[৩৪] তাঁরা প্রত্যক্ষণকে একমাত্র সিদ্ধ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা অনুমান, উপমান এবং শব্দজ্ঞান এই প্রত্যক্ষণের ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করতেন। কোনো বস্তু আমদের ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা সরাসরি পর্যবেক্ষণের ফলে যে জ্ঞান হয় তাকে প্রত্যক্ষণজাত জ্ঞান বলে। এই প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে ন্যায় দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি গৌতমের *ন্যায়সূত্র* গ্রন্থেও স্পষ্টকরে বলা হয়েছে বস্তুসমূহ যখন আমাদের ইন্দ্রিসমূহের সংস্পর্শে আসে তখন এদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। এর এর থেকে তখন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ মহর্ষি গৌতম প্রত্যক্ষণ জ্ঞান বলতে ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সংযোগে উৎপন্ন অভ্রান্ত ও নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকে নির্দেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা অন্নংভট্টের কথাও বলতে পারি। তিনি তাঁর *তর্কসংগ্রহ*'-তে উল্লেখ করেছেন, "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্।" তিনিও সরাসরি ইন্দ্রিয় এবং বস্তুর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার কথা বলেছেন। এখানে আমাদের বহিরিন্দ্রিয় চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন 'ইন্দ্রিয়' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের মধ্যে এখানে এক ধরনের সম্বন্ধ তৈরি হয়, যার ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে। উল্লিখিত ছয়টি ইন্দ্রিয়ের যে-কোনো একটির সাথে যে-কোনো বস্তু বা পদার্থের সন্নিকর্ষ বা সংযোগ ঘটলে প্রত্যক্ষণ উৎপন্ন হয়ে থাকে। আর একে প্রত্যক্ষণ জ্ঞান বলে। নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁর *তত্ত্বচিন্তামনিতে* বলতে চেয়েছেন সাক্ষাৎ জ্ঞানই হলো প্রত্যক্ষণ। বিশ্বনাথও তাঁর *মুক্তাবলিতে* অনুরূপ

মন্তব্য করেছেন, "ইন্দ্রিয়জন্যম্ জ্ঞানম্ প্রত্যক্ষম্।" প্রত্যক্ষণের উল্লিখিত সংজ্ঞা এবং এর বিশ্লেষণ অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিক মেনে নিলেও কিছু নৈয়ায়িক এবং বৈদান্তিক ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে ঈশ্বরের কোনো ইন্দ্রিয় না থাকলেও তিনি সকল কিছু প্রত্যক্ষণ করেন। আবার মুনি-ঋষিরাও অনেক ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় ছাড়া অনেক নৈয়ায়িকদের মতের সাথে তাঁরা একমত নন, তবে প্রত্যক্ষগত জ্ঞান যে সাক্ষাৎ জ্ঞান সে বিষয়ে তাঁরা দ্বিমত পোষণ করেননি।

এই প্রত্যক্ষণ জ্ঞানের বিশ্লেষণে এর নানা শ্রেণিবিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। এখন এই শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

ন্যায় জ্ঞানতত্ত্বে প্রথমত প্রত্যক্ষণের দুটি শ্রেণিবিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। যথা : লৌকিক প্রত্যক্ষণ এবং অলৌকিক প্রত্যক্ষণ। এই লৌকিক প্রত্যক্ষণের আবার দুটি ভাগ আছে। যথা : বাহ্য ও আন্তর প্রত্যক্ষণ। অন্য আর একদিক হতে ন্যায় জ্ঞানতত্ত্বে লৌকিক প্রত্যক্ষণকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : নির্বিকল্প, সবিকল্প এবং প্রত্যভিজ্ঞা। অন্যদিকে অলৌকিক প্রত্যক্ষণেও আবার তিনটি ভাগ দেখা যায়। যথা : সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষণ, জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষণ এবং যোগজ প্রত্যক্ষণ। নিম্নোক্ত চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি আরো সহজ করে দেখানো যায়

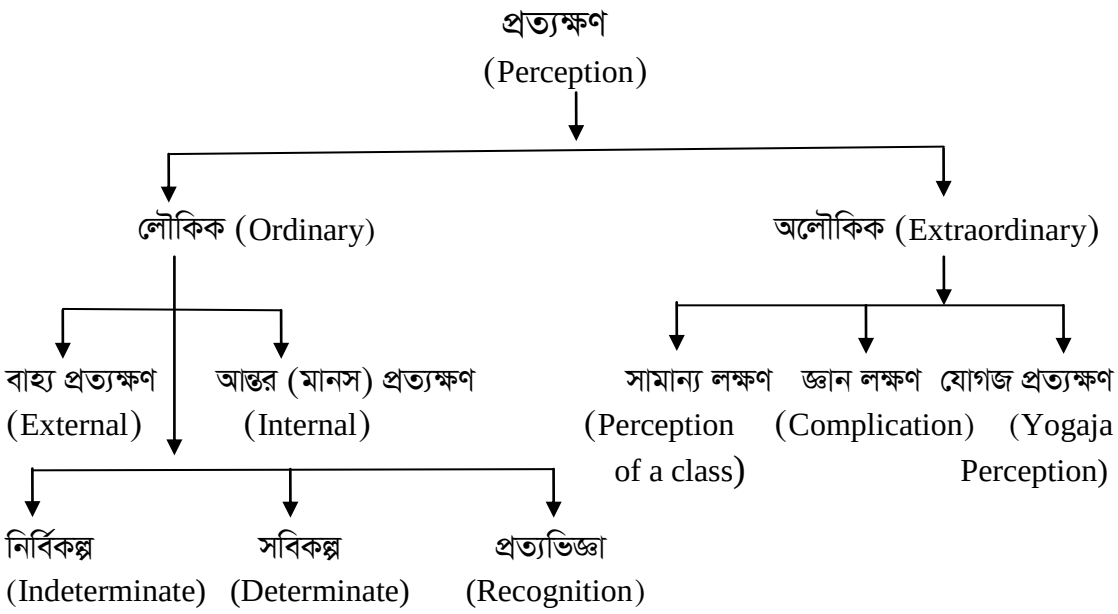

চিত্র : প্রত্যক্ষণের শ্রেণিবিভাগ

লৌকিক প্রত্যক্ষণ (Ordinary Perception)

আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাথে বস্তুর সরাসরি সংযোগ ঘটার ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে প্রত্যক্ষণ জ্ঞান বলে। আর চোখ, কান, নাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাথে সংযোগ ঘটলে যে প্রত্যক্ষণ হয় তাকে বলে

লৌকিক প্রত্যক্ষণ। আমাদের বাহ্য এবং আন্তর নামে দুটি ইন্দ্রিয় রয়েছে। তাই লৌকিক প্রত্যক্ষণে বাহ্য এবং আন্তর নামে দুই ধরনের প্রত্যক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

বাহ্য ও আন্তর প্রত্যক্ষণ (External and Internal Perception)

যে প্রত্যক্ষণে আমরা পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান পেয়ে থাকি তাকে বাহ্য প্রত্যক্ষণ বলে। এখানে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের সাথে বাইরের বস্তুর সংযোগ ঘটার ফলে প্রত্যক্ষণ হয়। যেমন চোখ দিয়ে সবুজ প্রকৃতি দেখা, কান দিয়ে গান শোনা, নাক দিয়ে রান্নার ঘ্রাণ গ্রহণ করা ইত্যাদি।

আর যে প্রত্যক্ষণে আমরা অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান পেয়ে থাকি তাকে আন্তর প্রত্যক্ষণ বলে। আমাদের মন বা অন্তরিন্দ্রিয়ের সাথে যখন ইচ্ছা, অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার সংযোগ ঘটে তখন তাকে আন্তর বা মানস প্রত্যক্ষণ বলে। এখানে আমরা মূলত মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। যেমন: আমাদের দুঃখ, যন্ত্রণা, সুখ, শান্তি প্রভৃতি অনুভব করা হচ্ছে মানস বা আন্তর প্রত্যক্ষণ। অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ ঘোষ বিষয়টি তুলে ধরেছেন এভাবে: "মন বা অন্তঃকরণের দ্বারা নিজের মনের ভিতরকার অনুভূতি, আবেগ এবং অন্যান্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যথা-বেদনার ব্যাখ্যা করা হয়, কার্য-কারণগত বা হেতুগত উপলব্ধি হয়।"[৩৫] এই বাহ্য এবং মানস উভয় প্রকার প্রত্যক্ষণের মানবজীবনে প্রয়োজন রয়েছে। এদের কোনো একটিকে বাদ দিলে আমাদের জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই এদের সমন্বয়ে জীবন সামনে অগ্রসর হয়।

অন্য আরেকটি নীতি অনুসারে আমরা লৌকিক প্রত্যক্ষণের ভিন্নতর শ্রেণিবিভাগ দেখতে পাই। যথা: নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ, সবিকল্প প্রত্যক্ষণ এবং প্রত্যভিজ্ঞা। এখন এ সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো:

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ (Indeterminate Perception)

নির্বিকল্প লৌকিক প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে কেবল কোনো বস্তু বা বিষয়কে শুধুমাত্র বস্তু বা বিষয় হিসেবে জানা হয়। এখানে শুধুমাত্র বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। বস্তুটির বিশেষ লক্ষণ কিংবা অন্যান্য গুণাবলি সম্পর্কে এখানে জানা যায় না। শুধু তাই নয় অনান্য বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষিত বস্তুর পার্থক্য বা সম্পর্ক এখানে জানা যায় না। অর্থাৎ বস্তুর, জাত, ধর্ম, গুণ, সম্ভাব্যতা, নিশ্চয়তা ইত্যাদি নির্বিকল্পে প্রত্যক্ষণে আমরা জানতে পারি না। এখানে শুধুমাত্র বস্তুর সহজ উপলব্ধি (Simple apprehension) হয়ে থাকে। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণে আমাদের বস্তুর জ্ঞান হলেও বস্তুর প্রকার এবং নাম সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান হয় না। এই জাতীয় প্রত্যক্ষণে প্রকার ও বিশেষ্যের জ্ঞান হয় না। বিশেষ্য এবং বিশেষণের মধ্যকার সম্বন্ধের ফলে

যে বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, সেটিও এখানে পরিলক্ষিত হয় না। এই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণে বস্তুর প্রাথমিক ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ জ্ঞান হয়, নিশ্চয়াত্মক কোনো জ্ঞান এখানে হয় না।[৩৬] উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একটি ফুল যখন আমার চোখ নামক ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে, তখন প্রাথমিকভাবে ফুলটিকে আমি কেবল বস্তু হিসেবে জানি। এখানে ফুলটির নাম, রঙ, গন্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান হয় না, হয় কেবল ফুলের অস্তিত্বজাত জ্ঞান। এই প্রত্যক্ষণে প্রকার বা বিশেষণ বিষয় হয় না। তবে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণে যে বিষয়টি অস্পষ্ট ও অব্যাখ্যাত থাকে সবিকল্প প্রত্যক্ষণে তা স্পষ্ট এবং ব্যাখ্যাত হয়।[৩৭] নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে জ্ঞানকে আমরা কোনো বচনের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারি না। বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বললে এরূপ দাঁড়ায়, কোনো বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে শিশুরা যে ধরনের জ্ঞান লাভ করে থাকে তাই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ। বিষয়টির আরো সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যার জন্য প্রখ্যাত নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টের মত উল্লেখ করা যায়, "... দ্রব্য, গুণ, কর্ম এবং সব সার্বিক প্রত্যয়কে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ পরস্পর সম্বন্ধ-রহিত এবং অবিন্যস্ত উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে; সবিকল্প প্রত্যক্ষ এই সব অস্পষ্ট উপাদানকে এক-একটি নাম ও সংজ্ঞা দেয় এবং সমগ্রভাবে বস্তুটির নাম এবং অর্থের সঙ্গে উহাকে সম্পৃক্ত করে।"[৩৮]

নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও মনে করেন নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণে কোনো প্রকার সম্বন্ধ জ্ঞান পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি অনুষঙ্গী সম্বন্ধের কোনো ধরনের উপলব্ধিও দেখা যায় না। তাছাড়া অন্নংভট্ট এবং কুমারিল ভট্টকে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে উল্লিখিত মতকে সমর্থন করতে দেখা যায়। উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ যদি প্রথম স্তর হয়, তাহলে দ্বিতীয় স্তর হলো সবিকল্প প্রত্যক্ষণ। অর্থাৎ নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ পূর্ণতা পায় সবিকল্প প্রত্যক্ষণে। তাই এখন আমরা সবিকল্প প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করবো:

সবিকল্প প্রত্যক্ষণ (Determinate Perception)

যে লৌকিক প্রত্যক্ষণে আমরা বস্তুর গুণ, ধর্ম, প্রকৃতি, নাম, জাতি, প্রকার, পার্থক্য প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করে থাকি তাকে সবিকল্প প্রত্যক্ষণ বলা হয়। এই প্রত্যক্ষণে বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত জ্ঞান অর্জিত হয়ে থাকে যার ফলে মানবজ্ঞান একটি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। এই সবিকল্প প্রত্যক্ষণকে উপস্থাপনমূলক পুনরুজ্জীবনমূলক প্রক্রিয়াও (Presentative Representative Process) বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি রজনীগন্ধা ফুলের সঙ্গে যখন আমার ইন্দ্রিয় সংযোগ হয় তখন আমি বলি ফুলটি রজনীগন্ধা। এর রং সাদা, এর গন্ধ সুগন্ধযুক্ত তখন সেটি হচ্ছে সবিকল্প প্রত্যক্ষণ। সবিকল্প প্রত্যক্ষণকে বচন দ্বারা প্রকাশ করা যায়। তবে মূক ব্যক্তির প্রত্যক্ষজ্ঞান

ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়, কেননা সেখানে পদজ্ঞান থাকে না। আর পদজ্ঞান না থাকলে কোনো অনুভবকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই প্রত্যক্ষণে বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব থাকে যা নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণে দেখা যায় না। এই প্রত্যক্ষণের স্বরূপ প্রসঙ্গে অন্নম্ভট্টের *তর্কসংগ্রহের* ব্যাখ্যায় অধ্যাপক শ্রীকানাইলাল পোদ্দার বলছেন, "যে প্রত্যক্ষ সপ্রকারক জ্ঞান, তাহাই সবিকল্প প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষ প্রমাতে বিশেষ্যতা, বিশেষণতা, সংসর্গতা– এই তিনটি বিষয়তাই থাকে, তাহাই সবিকল্পক প্রত্যক্ষ।"[৩৯] প্রকারবিশিষ্ট এই সবিকল্প প্রত্যক্ষণে বিশেষণ ও বিশেষ্যের সম্বন্ধকে বিষয় জ্ঞান বলা হয়ে থাকে। নব্য নৈয়ায়িকরা মনে করে একমাত্র সবিকল্প প্রত্যক্ষণজ্ঞানে যথার্থতা নির্ণয় করা যায়। মহর্ষি গৌতম সবিকল্প প্রত্যক্ষণকে **ব্যবসায়াত্মক** প্রত্যক্ষণ হিসেবেও অভিহিত করেছেন। এই প্রত্যক্ষণ আবার 'বিশিষ্টবুদ্ধি' নামেও সুপরিচিত।

এই সবিকল্প প্রত্যক্ষণের বিরোধিতা বা সমালোচনা লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ দার্শনিকরা এই প্রত্যক্ষণকে স্বীকার করেননি। তাঁরা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষণকে প্রমাণ মেনেছেন। স্বলক্ষণ এবং সামান্যলক্ষণ নামে দুই প্রকার প্রমাণের কথা তাঁরা বলেছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকরা স্বলক্ষণকে পরমার্থ সৎ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণে স্বলক্ষণ বিষয় প্রতিভাত হয়। সেজন্য নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণই একমাত্র প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত।[৪০] সবিকল্প প্রত্যক্ষণে বস্তুর যে পঞ্চবিধ বিষয় জাতি, গুণ, নাম, ক্রিয়া এবং দ্রব্য কল্পিত হয়, তার ভেদ কল্পনা করা হয়। বৌদ্ধ দার্শনিকরা এই ভেদ অস্বীকার করে। ফলে সবিকল্প প্রত্যক্ষণ অযথার্থ বা অপ্রমা কোনো বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।[৪১] অন্যদিকে শাব্দিক সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিক ভর্তৃহরি নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণকে অস্বীকার করে সবিকল্পক প্রত্যক্ষণ স্বীকার করে নিয়েছেন। এমনকি শাব্দিক সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকরা নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের অস্তিত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। নব্য নৈয়ায়িকগণ নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষণের যে স্বরূপগত বিশ্লেষণ দেখিয়েছেন তা মীমাংসা দার্শনিকদের নির্বিকল্প ও সবিকল্প মতের সাথে মিল আছে।

তবে উপরের আলোচনা-সমালোচনা এবং বিশ্লেষণ থেকে আমরা বলতে পারি পূর্ণাঙ্গ এবং প্রকৃত জ্ঞানের জন্য নির্বিকল্প এবং সবিকল্প এই উভয় প্রত্যক্ষণই আবশ্যক। কেননা জ্ঞানের প্রাথমিক ক্ষেত্রে আমাদেরকে সহযোগিতা করে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ। আর সেই জ্ঞানের পূর্ণতাদানে সহযোগিতা করে সবিকল্প প্রত্যক্ষণ। তাই বলা যায় নির্বিকল্প এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষণ একে অন্যের পরিপূরক। পরিশেষে বলা যায়, নৈয়ায়িক জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার প্রকরণের ক্ষেত্রে নির্বিকল্প এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষণের যে ব্যাখ্যা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকর্য। এখন নৈয়ায়িকদের তৃতীয় লৌকিক প্রত্যক্ষণ প্রত্যভিজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition)

ন্যায় দার্শনিকগণ তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রত্যভিজ্ঞা নামক বিশেষ এক ধরনের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা বলেছেন। এই প্রত্যক্ষণে পূর্বে দেখা কোনো বস্তু বা বিষয়কে পরবর্তীতে দেখার পর চিনতে পারার কথা বলা হয়েছে। যদি চিনতে পারা যায় তাহলে এক ধরনের প্রত্যক্ষণ হয়, ন্যায় মতে এই ধরনের প্রত্যক্ষণকে প্রত্যভিজ্ঞা বলা হয়েছে। এই প্রত্যক্ষণের স্থলে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকে। এই প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে পূর্ব স্মৃতি রোমন্থন হলেও বিষয় বা বস্তুকে বর্তমানেও হাজির হতে হয়। তবে একে স্মৃতি বলা যাবে না, কেননা স্মৃতির ক্ষেত্রে শুধু অতীত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা হয়। তবে প্রত্যভিজ্ঞার ক্ষেত্রে স্মৃতি এবং বর্তমান প্রত্যক্ষণ একত্রিত হয়ে জ্ঞান হয়ে থাকে। পূর্ব পরিচিতির স্মরণ না হলে কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞা হবে নয়। মোটকথা বস্তুকে জানা নয়, পূর্ব পরিচিত হিসেবে চিনতে পারাকে প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান বলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো এক ব্যক্তিকে দেখে যখন আমি বলি এই সেই ব্যক্তি যাকে আমি গতকাল বিমানবন্দরে দেখেছিলাম। এখানে এই পূর্বে দেখা অভিজ্ঞতাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলা হচ্ছে। তবে এই প্রত্যক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– সবিকল্প প্রত্যক্ষণ অপরিহার্য।[৪২] সবিকল্প প্রত্যক্ষণ ছাড়া প্রত্যভিজ্ঞা অসম্ভব। অর্থাৎ, "সবিকল্পক প্রত্যক্ষে সমবায় সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়। সবিকল্পক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) হয়।"[৪৩] তবে গঙ্গেশ উপাধ্যায় নানা যুক্তির সাহায্যে প্রত্যভিজ্ঞাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চেয়েছেন এটি সবিকল্প প্রত্যক্ষণের অন্তর্গত বিষয়, প্রত্যক্ষণের কোনো প্রকার হতে পারে না।

ন্যায় জ্ঞানতত্ত্বের লৌকিক প্রত্যক্ষণের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে নির্বিকল্প, সবিকল্প এবং প্রত্যভিজ্ঞা সম্পর্কে যে আলোচনা আমরা দেখি তা ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বকে করেছে একদিকে সমৃদ্ধশালী এবং অন্যদিকে বৈচিত্র্যময়। তাই ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে নির্বিকল্প, সবিকল্প এবং প্রত্যভিজ্ঞা সম্পর্কিত প্রত্যক্ষণ জ্ঞান জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসকে একদিকে যেমন করেছে উন্নত, অন্যদিকে তেমনি মানবজীবনের কল্যাণের পথকে করেছে তরান্বিত। কেননা জ্ঞানগত বিষয়ের উন্নয়ন এবং বহুমুখীতা ব্যতীত মানুষ জগৎসভায় তার কাঙ্ক্ষিত ফল আশা করতে পারে না। আর এক্ষেত্রে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের উদারতা এবং বহুমাত্রিকতা মানবসভ্যতাকে দিয়েছে নতুন পথনির্দেশ। তাই নৈয়ায়িকগণের এই জ্ঞানগত আলোচনার সুফল যুগ যুগ ধরে বিশ্বসভায় অবদান রাখবে। এখন আমরা নৈয়ায়িকদের অলৌকিক প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো:

অলৌকিক প্রত্যক্ষণ (Extraordinay Perception)

অলৌকিক প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের কোনো ধরনের সংযোগ পরিলক্ষিত হয় না, তবে বিশেষ বা অসাধারণ উপায়ে এখানে প্রত্যক্ষণ ঘটে থাকে।[৪৪] আমাদের কোনো ইন্দ্রিয় যখন নিজের বিষয় বাদ দিয়ে অন্যকোনো বিষয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তখন অলৌকিক সন্নিকর্ষ ঘটে থাকে। এই অলৌকিক সন্নিকর্ষ থেকে যে প্রত্যক্ষণ উৎপন্ন হয় তাকে অলৌকিক প্রত্যক্ষণ বলে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যদি স্বাভাবিক সম্বন্ধের বাইরে গিয়ে নতুন কোনো প্রত্যক্ষ করতে সাহায্য করে তখন তাকে আমরা অলৌকিক প্রত্যক্ষণ হিসেবে অভিহিত করতে পারি। ন্যায় জ্ঞানতত্ত্বে অলৌকিক প্রত্যক্ষণের আবার তিনটি শ্রেণিবিভাগ লক্ষ করা যায়। যথা : সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষণ এবং যোগজ প্রত্যক্ষণ।[৪৫] এখন এই ত্রিবিধ প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষণ (Perception of a Class)

যে অলৌকিক প্রত্যক্ষণে কোনো বস্তু, বিষয় বা ব্যক্তির মধ্যে থেকে তার জাতির সামান্য ধর্মের প্রত্যক্ষণ থেকে সমগ্র জাতিকে প্রত্যক্ষ করা হয় তখন তাকে সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষণ বলে। ন্যায়মতে এই সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, কোন একটি বস্তুর সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ ঘটে তখন সামান্য ধর্মের জ্ঞান লাভ হয় এবং ঐ সামান্য ধর্মের সকল আশ্রয় বাক্যের যে প্রত্যক্ষণ পরিলক্ষিত হয় তাই সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষণ। এখানে কোনো একটি বস্তু কিংবা ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করে তার সমগ্র জাতিকে অবলোকন বা প্রত্যক্ষ করা হয়। এই প্রত্যক্ষণের সংজ্ঞা আরো স্পষ্ট করতে হলে আমাদের বুঝতে হবে সামান্য ধর্ম বলতে কী বোঝায়?

সামান্য ধর্ম হলো এমন একটি গুণ বা লক্ষণ যা একটি জাতির অন্তর্গত সকল সদস্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। শুধু তাই নয় এই গুণ বা লক্ষণ একটি জাতির সাথে অন্য জাতির পার্থক্যও নির্দেশ করে। যেমন: মানবজাতির সামান্য ধর্ম হলো- 'মনুষ্যত্ব'। এই গুণ সকল মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। আর এজন্য মানুষ অন্যান্য জাতির প্রাণী থেকে থেকে পৃথক প্রাণী হিসেবে পরিচিত। নৈয়ায়িকরা মনে করেন কোনো একজন মানুষকে দেখে আমরা যখন বলি– একজন মানুষ, তখন আসলে আমরা মনুষ্যত্বরূপ সামান্য ধর্ম বা লক্ষণের সাহায্যে সকল মানুষকে প্রত্যক্ষ করে থাকি। আর এই সামান্য ধর্ম বা লক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষিত বিষয়ই হচ্ছে সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষণ। এই প্রত্যক্ষণে বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষিত হয় না বিধায় একে অলৌকিক সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষণ বলে। মনুষ্যরূপ ধর্ম বা লক্ষণ দ্বারা সবমানুষ বা মানবজাতিকে অলৌকিক বা মানসিক উপায়ে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। এই প্রত্যক্ষণে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যথা: (১) সামান্য বা সার্বিক ধর্ম বা লক্ষণের

অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির লৌকিক বিষয় সম্পর্কিত উপস্থিতি (২) লৌকিকভাবে সামান্য ধর্মের অন্যান্য সদস্যের অনুপস্থিতি এবং (৩) ঐ অনুপস্থিতি সদস্যদের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করা।

জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষণ (Acquired Perception)

অলৌকিক প্রত্যক্ষণের অপর একটি প্রকার হলো জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষণ। সামান্য ধর্ম বা লক্ষণের কারণে আমাদের যেমন একই ধরনের সকল বস্তুর একটি অলৌকিক প্রত্যক্ষণ হয়ে থাকে। তেমনি পূর্বলব্ধ জ্ঞান দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এক ধরনের অলৌকিক প্রত্যক্ষণ হয়ে থাকে। বিষয় জ্ঞান এ ধরনের প্রত্যক্ষের কারণ, তাই এরূপ প্রত্যক্ষণকে জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষণ বলে। যখন আমাদের কোনো একটি ইন্দ্রিয় দিয়ে যদি সেই ইন্দ্রিয় বহির্ভূত অন্য ইন্দ্রিয়ভুক্ত গুণকেও প্রত্যক্ষ করা যায়, আর তখন যে প্রত্যক্ষ লক্ষ করা যায় তাকে জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষণ বলে।[৪৬] এখন অতীত জ্ঞানের স্মৃতিকে ব্যবহার করে এক ইন্দ্রিয়ের নির্দিষ্ট বিষয়কে অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা হয়। এক ইন্দ্রিয়ের নির্দিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে অন্য ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হয় না, হয়ে থাকে অলৌকিক প্রক্রিয়ায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা যখন কোনো বরফ বা চন্দন কাঠ দেখি তখন বলি ঠাণ্ডা ও সুগন্ধিযুক্ত এবং সুগন্ধির কথা বলছি, আসলে কী চোখ দিয়ে এ সকল জ্ঞান সম্ভব? চোখ কিন্তু সাধারণভাবে আমাদের এ ধরনের জ্ঞান দিতে পারেনা। এ সকল ক্ষেত্রে মূলত পূর্বের ত্বক ইন্দ্রিয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় কর্তৃক প্রাপ্ত স্পর্শ এবং গন্ধের স্মৃতি থেকে একথা বলছি যে বরফ ঠাণ্ডা এবং চন্দন কাঠ সুগন্ধিময়।[৪৭] কেননা পূর্বে চন্দন কাঠ এবং বরফের সন্নিকর্ষকালে স্মৃতি থেকে গন্ধ এবং স্পর্শ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে। চন্দন কাঠের এই জ্ঞান এখানে লৌকিক কিন্তু সুগন্ধির ক্ষেত্রে অলৌকিক। আর যেহেতু এখানে পূর্বলব্ধ জ্ঞান সন্নিকর্ষের সহায়ক হিসেবে কাজ করে তাই এই জ্ঞানকে একত্রে অলৌকিক জ্ঞান লক্ষণ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিষয়টির সহজীকরণে আরো বলা যায়, "কোন ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সংযোগের সময় যদি উক্ত বিষয় সম্পর্কিত কোনো পূর্ব প্রত্যক্ষিত জ্ঞানের স্মৃতি জাগ্রত হয় তবে তাকে জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে।"[৪৮]

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সামাণ্য লক্ষণ এবং জ্ঞান লক্ষণ এই উভয় ধরনের প্রত্যক্ষণে সন্নিকর্ষ ঘটে এবং তা কোনো না কোনো জ্ঞানের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ফলাফল ভিন্ন হয়। অর্থাৎ ভিন্ন ধরনের জ্ঞান আমরা পেয়ে থাকি সামান্য লক্ষণ এবং জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষণ থেকে। নৈয়ায়িকরা বিভিন্ন যুক্তি দ্বারা জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন। তাঁরা মনে করেন এই সন্নিকর্ষ স্বীকার না করলে বাইরের বিষয়সমূহের মানস প্রত্যক্ষ এবং অভাব প্রত্যক্ষের জ্ঞান উৎপন্ন সম্ভব নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানেও জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষণের

বিষয়টির আলোচনা দেখা যায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞান বিষয়টিকে কমপ্লিকেশন (Complication) হিসেবে অভিহিত করেছে। মনোবিদ স্টাউট এই ধরনের প্রত্যক্ষকে একটি পরোক্ষ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, স্মৃতি আমাদের দেখা বস্তুসমূহের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ধরনের প্রত্যক্ষগুলো পরস্পর সংশ্লিষ্ট অবস্থায় থাকে।[৪৯] দার্শনিক বার্কলি এই জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষণকে 'অর্জিত প্রত্যক্ষ' (Acquired perception) বলে অভিহিত করেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সামান্য লক্ষণ এবং জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষণের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাই– সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষণের অনুমিত শ্রয় বাক্যগুলির সাথে সন্নিকর্ষ স্থাপনের মধ্য দিয়ে তার আশ্রয়ের জ্ঞান জন্মাতে দেখা যায়, অন্যদিকে জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষণে শুধুমাত্র যার বিষয়ে জ্ঞান তার সাথেই সন্নিকর্ষ ঘটে থাকে। তাছাড়া এই সন্নিকর্ষ স্থাপনের ক্ষেত্রে জ্ঞান লক্ষণে ব্যক্তিজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষণে 'জাতিজ্ঞান' বা 'সার্বিকজ্ঞানের' কথা বলা হয়েছে।

যোগজ প্রত্যক্ষণ (Yogaja Perception)

যোগজ হলো তৃতীয় প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষণ। নৈয়ায়িকগণ মনে করেন এই যোগজ অলৌকিক প্রত্যক্ষণ শুধুমাত্র যোগীদের হয়, অযোগীদের দ্বারা এই প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয়। কেননা অযোগী বা সাধারণরা নিকটস্থ এবং সম্মুখস্থ বর্তমান স্থূল বিষয়াদি প্রত্যক্ষ করতে পারেন। অন্যদিকে যোগিগণ তাঁদের যোগ সাধনা দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে অতীত, বর্তমান এবং দূরবর্তী ভবিষ্যতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুও অবলোকন করতে পারেন। যোগীরা এখানে স্বাজ্ঞিক উপায়ে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং অতিন্দ্রিয় বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করে থাকেন। অর্থাৎ যোগীরা সকল পদার্থের জ্ঞান অর্জন করে থাকেন। যেহেতু এই প্রত্যক্ষণ স্বজ্ঞাজাত তাই এটা অলৌকিক। স্মৃতি ও পুরাণ অনুযায়ী যোগ সাধনার দ্বারা যোগীরা অলৌকিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মানস প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হন। এই প্রত্যক্ষণে যোগীর অন্তর অনুভূতির মাধ্যমে সত্য পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়। বিরামহীন সাধনায় যোগীদের অতিপ্রাকৃত দৃষ্টিশক্তি অর্জন করতে সহায়তা করে। ফলে তাঁদের প্রত্যক্ষণ স্বতঃস্ফূর্ত, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নিত্য।[৫০] এই যোগজ প্রত্যক্ষণের দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায় এবং সে অনুযায়ী যোগীদের দুটি প্রকার লক্ষ করা যায়। যথা: যুক্ত এবং যুঞ্জান। যে সমস্ত যোগীরা নিজস্ব সাধনা দ্বারা পূর্ণতা এবং ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করেন তাদেরকে যুক্তযোগী বলে। এই যোগীদের অলৌকিক প্রত্যক্ষণ সরকালীন এবং স্বাভাবিক হয়ে থাকে। এই যুক্তযোগীরা অস্টসিদ্ধি লাভ করে থাকেন। তাঁরা অণু-পরামাণুর বিষয়ও অনায়াসে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। অন্যদিকে যুঞ্জান যোগীদের সাধনায় স্বতঃস্ফূর্ততা এবং নিত্যতা থাকে না।[৫১] কেননা এর সর্বঅবস্থায় গভীর মনোযোগ নিবিষ্ট করতে পারেন না। শ্রবণ,

মনন এবং নিদিধ্যাসনের কঠোর তপস্যা এখানে লক্ষ করা যায় না। এই যোগীদের প্রত্যক্ষ তাই সাময়িক এবং অনিত্য হয়ে থাকে। নৈয়ায়িকদের সাথে সাংখ্যা এবং বেদান্ত দর্শন যোগজ প্রত্যক্ষণকে স্বীকার করলেও জৈন এবং অদ্বৈতবাদীরা অলৌকিক সন্নিকর্ষকে স্বীকার করেননি।

উপসংহার

ন্যায় দর্শনের আলোচনায় বিভিন্ন বিষয় স্থান পেয়েছে। তবে তাঁদের দার্শনিক আলোচনায় জ্ঞানতত্ত্ব ও যুক্তিশাস্ত্রের আলোচনা অনবদ্য স্থান দখল করে নিয়েছে। স্টিফেন ফিলিপস ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের ঐতিহ্য প্রসঙ্গে নৈয়ায়িকদের চিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এভাবে, "…Classical Indian Philosophy includes a rich tradition of thinking about knowledge, which Nyaya represents in its own realist and common-sense fashion."[৫২] ন্যায়জ্ঞানতত্ত্ব প্রত্যক্ষণ, অনুমান, উপমান এবং শব্দকে যথার্থ প্রমা হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁরা যে শাখা এবং প্রশাখার ভাগ দেখিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। মানবজীবন যে কখনো বাহ্য এবং মানসপ্রত্যক্ষণের বাইরে নয় তা নৈয়ায়িকদের লৌকিক প্রত্যক্ষণের এই আলোচনায় সহজে বোঝা যায়। তাছাড়া নির্বিকল্প, সবিকল্প এবং প্রত্যভিজ্ঞার মাধ্যমে নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানের যে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা আমাদের জীবনব্যবস্থাকে উন্নততর দিকে পরিচালিত করে। বস্তুবাদী এই দর্শন অলৌকিক প্রত্যক্ষণ এবং এর প্রকার নিয়েও আলোচনা করেছে। কেননা মানবজীবনে যে শুধু লৌকিক নয় অলৌকিক বিষয়াদিও আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ এবং আরো বেশি পরিশীলিত করতে পারে তা তাঁরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। কেননা বাস্তবজীবনে মুনি, ঋষি এবং যোগীদের পথ নির্দেশ এবং আদর্শকে আমাদের জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করি। আধুনিককালের প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে দর্শনে যেসব জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় যেসব বিষয়সমূহের প্রকরণ এবং বিশ্লেষণ আমরা দেখি তা বহুপূর্বে নৈয়ায়িকগণ তাঁদের জ্ঞানতত্ত্বের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনায় বিস্তারিত বলে গেছেন। তাই নৈয়ায়িকদের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনার গুরুত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য কোনোভাবেই অস্বীকার যায় না।

বৈশেষিক দর্শনে প্রত্যক্ষণ

আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের অন্যতম হলো বৈশেষিক সম্প্রদায়। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম দর্শনসমূহের মধ্যে বৈশেষিক দর্শন অন্যতম। মহর্ষি কণাদ হলেন এই বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা। মহর্ষি কণাদই ছিলেন এই দর্শনের আদি প্রবক্তা। বুদ্ধের জন্ম গ্রহণের প্রায় ৮০০ বছর পূর্বে (কেউ কেউ মনে করেন ৪০০ বছর) তাঁর আর্বিভাব। এই মহর্ষি কনাদের *বৈশেষিক সূত্র* সম্পর্কিত আলোচনায়

সুস্পষ্টতার প্রমাণ মেলে। কানাদ এই *বৈশেষিক সূত্রকে* ১০টি অধ্যায়ে ৩৭০টি সূত্রে বিন্যস্ত করেছেন। এই ১০টি অধ্যায়ের প্রত্যেকটি অধ্যায়কে আবার দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদকে আবার আহ্নিক গতি বলা হয়। তাই স্বাভাবিকভাবে ১০টি অধ্যায়ে ২০টি আহ্নিকে কনাদ তাঁর দর্শন আলোচনা করেছেন। বৈশেষিক দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায়, বিশেষ এবং অভাব নামে মোট সাতটি পদার্থকে স্বীকার করা হয়েছে। এই দর্শনকে প্রমেয় শাস্ত্র হিসেবেও অভিহিত করা হয়। ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়। সেজন্য ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনকে সমানতন্ত্রও বলা হয়। উভয় দর্শন জীবাত্মা, জড়জগৎ, পরমাত্মা, দেশ-কাল, পরমাণু প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছে। তবে ন্যায় দর্শন তর্কবিদ্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন অধিবিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।[৫৩] এছাড়াও ন্যায় দর্শনের সাথে বৈশেষিক দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ন্যায় দর্শন চার প্রকার প্রমাণ বা জ্ঞানের উৎসের কথা স্বীকার করেছে। যথা: প্রত্যক্ষণ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। অন্যদিকে বৈশেষিক দর্শন শুধুমাত্র প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বীকার করেছে। বৈশেষিকরা উপমান এবং শব্দ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানের অন্তর্গত বিষয় বলে মনে করে। তবে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান সম্পর্কিত বৈশেষিক মত ন্যায় মতের অনুরূপ। বৈশেষিক দর্শন মনে করে শুধুমাত্র যৌগিক পদার্থগুলো প্রত্যক্ষণযোগ্য। দ্রব্য, গুণ ও কর্মকে বৈশেষিক মত অনুযায়ী প্রত্যক্ষণ করা যায়। এই বৈশেষিক মত অনুযায়ী প্রত্যক্ষণ করা যায় না, তবে ত্র্যণুক ও অন্যান্য জড় দ্রব্যকে প্রত্যক্ষণ করা যায়। অবশ্য বৈশেষিক দার্শনিকরা মনে করেন যোগজ প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে পরমাণুর প্রত্যক্ষণ সম্ভব। বৈশেষিক দর্শন মনে করে উপমান এবং শব্দের কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নেই। এরা অনুমানের অন্তগর্ত। শ্রুতিকেও তাঁরা অনুমানের অংশ বলে মনে করে। তাই বৈশেষিকগণ মনে করেন প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান ব্যতীত আর কোনো প্রমাণ নেই। বৈশেষিক দর্শনে জ্ঞানের আলোচনায় দুইপ্রকার জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। যথা: স্মৃতি এবং অনুভব। অনুভব যথার্থ হতে পারে, আবার অযথার্থও হতে পারে। এই যথার্থ অনুভবই প্রত্যক্ষণ। এই প্রত্যক্ষণ জ্ঞানে বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সংযোগ সাধনের ফলে সরাসরি জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ঘটে থাকে। এই প্রত্যক্ষণ বাহ্য বা আন্তর উভয় হতে পারে। বাহ্য প্রত্যক্ষণে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান অর্জিত হয়ে থাকে। আর আন্তর বা মানস প্রত্যক্ষণে মুনি, ঋষি, যোগীদের অলৌকিক চিন্তনশক্তির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হয়ে থাকে। এই প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে বৈশেষিক সম্প্রদায়ের বিস্তারিত মতামত ন্যায় দার্শনিকদের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনার হুবহু অনুরূপ।

জ্ঞানের প্রামাণ্যের ক্ষেত্রে বলা যায় ন্যায় দার্শনিকগণের মত বৈশেষিক সম্প্রদায়ও জ্ঞানের পরতপ্রামাণ্য স্বীকার করে নিয়েছে। উল্লেখ্য যে জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানের বাইরের শর্তের ওপর নির্ভর করে থাকে। ন্যায় দর্শনের মতোও বৈশেষিক দর্শনও জীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে মোক্ষকে গ্রহণ করেছে। আর মানবজীবনে যথার্থ জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে আমরা দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি। আর সেজন্য বৈশেষিক দর্শন জ্ঞানবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনার ওপর এত গুরুত্ব প্রদান করেছে। ন্যায় দর্শনের সাথে বৈশেষিক দর্শনের বিভিন্ন বিষয় মিল থাকলেও জ্ঞানের উৎস বা প্রমাণের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা বৈশেষিক দর্শনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকেই নির্দেশ করে।[৫৪]

মীমাংসা দর্শনে প্রত্যক্ষণ

ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে বেদের প্রামাণ্য কঠোরভাবে যাঁরা মেনেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম মীমাংসা দর্শন। একান্তভাবেই এই দর্শন বেদনির্ভর। বেদের মাহাত্ম্য ও মহিমা তুলে ধরাই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। বেদের দুটি ভাগ পরিলক্ষিত হয়। যথা: (১) 'পূর্বকাণ্ড' বা 'কর্মকাণ্ড' (২) 'উত্তরকাণ্ড' বা 'জ্ঞানকাণ্ড'। বেদের প্রথম অংশে কর্মকাণ্ড পূর্বকাণ্ডের আলোচনা দেখা যায়। আর শেষাংশে দেখা যায় উত্তরকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা। মূলত মীমাংসা এবং বেদান্ত সম্পূর্ণভাবে বেদ বা শ্রুতিনির্ভর দর্শন। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে মীমাংসা দর্শন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে নিজস্ব অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। তাই এই দর্শনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলা যায়, "শ্রুতিতে বিচারপূর্বক তত্ত্বাবধারণ অর্থে মীমাংসা শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। যে বিচার পদ্ধতির অনুসরণে সূক্ষ্মতম অর্থের যথার্থ নির্ণয় হয়ে থাকে, সেই পদ্ধতিকেই দর্শনশাস্ত্রে বলা হয়েছে মীমাংসা।"[৫৫] বেদের যে অংশে যাগ, যজ্ঞ, অনুষ্ঠানাদির বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে কর্মকাণ্ড বলে। মোটকথা বৈদিক কর্মকাণ্ডেকে দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার একটা প্রচেষ্টা মীমাংসকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। মহর্ষি জৈমিনি হলেন মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। জৈমিনির নাম অনুসারে এই দর্শনকে আবার 'জৈমিনিদর্শন'ও বলা হয়ে থাকে। মীমাংসা দর্শনের আদি গ্রন্থ *মীমাংসা সূত্র*। এই *মীমাংসা সূত্রের* প্রণেতা হলেন মহর্ষি জৈমিনি। ঐতিহাসিকদের বিবেচনায় ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে জৈমিনি *মীমাংসা সূত্র* রচনা করেছিলেন। এতে পাঁচশ'র বেশি সূত্র আছে বলে মনে করা হয় এবং এটিকে মীমাংসা দর্শনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই মীমাংসাসূত্রের খ্যাতনামা ভাষ্যকার ছিলেন শবর স্বামী। তিনি জৈমিনি সূত্রের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। শবর স্বামীর পরে জৈমিনি সূত্রের অন্যতম ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার ছিলেন প্রভাকর মিশ্র এবং কুমারিল ভট্ট।[৫৬] এই দুজন প্রায় সমসাময়িক ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁরা দুজনই মীমাংসাসূত্রের ওপর ভাষ্য রচনা করলেও তাঁদের ভাষ্যের মধ্যে মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে পরবর্তীতে এই

মতবিরোধকে কেন্দ্র করে দুটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে যার একটি হলো: প্রভাকর মীমাংসক এবং অন্যটি হলো ভাট্ট মীমাংসক। উল্লেখ্য যে প্রভাকরের অনুসারীদেরকে প্রভাকর মীমাংসক এবং কুমারিল ভট্টের অনুসারীদেরকে ভাট্ট মীমাংসক বলা হয়। এই মীমাংসা দর্শনের আলোচনা থেকে দেখা যায় ব্যাখ্যাকার বা আলোচকরা এই দর্শনকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা: (১) জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology), (২) তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics) এবং (৩) নৈতিকতা ও ধর্ম (Ethics and Religion)।

পূর্বেই বলা হয়েছে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এই দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য। কাজেই বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে মীমাংসকরা জ্ঞানের স্বরূপ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য আলোচনার পাশাপাশি জ্ঞানের বিভন্ন সমস্যা, যথার্থ এবং অযথার্থ জ্ঞানের পার্থক্য, জ্ঞানের উৎস প্রভৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মীমাংসা দর্শনে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, অজ্ঞাত কিংবা অপরিচিত কোনো বস্তু বা বিষয়ের সম্পর্কে ধারণা লাভ হলে তাকে জ্ঞান বলে। বস্তুবাদী মীমাংসা দার্শনিকরা জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর গুরুত্বকে অবলীলায় স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, জ্ঞান বলতে বস্তুর জ্ঞানকে বোঝায়। আর জ্ঞান হতে গেলে অবশ্যই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তু থাকতে হবে। মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসা দর্শনে তিন প্রকার প্রমাণের কথা বলেছেন। যথা: প্রত্যক্ষণ, অনুমান এবং শব্দ। তবে মহর্ষি জৈমিনি তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় শব্দপ্রমাণ বা আপ্তবাক্যকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তথাপি আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনা যেহেতু প্রত্যক্ষণকেন্দ্রিক তাই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে মীমাংসা দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনায়। এখন এই দর্শনের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

মীমাংসকরা দুপ্রকার জ্ঞানের কথা বলেছেন। যথা: প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং পরোক্ষজ্ঞান। যখন আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের সাথে কোনো বস্তু বা বিষয়ের সরাসরি সংযোগ ঘটে তখন সেই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। অন্যদিকে কোনো বস্তু বা বিষয়ের সাথে আমাদের ইন্দ্রিয়ের যখন কোনো সরাসরি সাক্ষাৎ ঘটে না তখন তাকে পরোক্ষজ্ঞান বলে। মহর্ষি জৈমিনির মীমাংসাসূত্র থেকে প্রত্যক্ষণ, অনুমান এবং শব্দ এই তিন প্রকার প্রমাণের সন্ধান মেলে। তবে জৈমিনি পরবর্তী মীমাংসক প্রভাকর প্রত্যক্ষণ, অনুমান, শব্দ, উপমান ও অর্থাপত্তি এই পাঁচ প্রকার প্রমাণের কথা বলেছেন। আবার কুমারিল ভট্ট এই পাঁচ প্রকারের সাথে আরো এক প্রকার প্রমাণের কথা বলেছেন। তিনি অনুপলব্ধি নামক আরো এক ধরনের প্রত্যক্ষণের কথা বলেছেন।[৫৭] তবে সকল মীমাংসকগণ নির্ভুল এবং নির্দোষ জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পূর্বমীমাংসা দর্শনে আমরা যথার্থ জ্ঞানের চারটি শর্ত দেখতে পাই। এই চারটি শর্ত সম্পর্কে অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায়। এই যথার্থ জ্ঞানের ক্ষেত্রে

কোনো– "১) কারণদোষ থাকিবে না, ২) অন্য কোনো বৈধজ্ঞানের দ্বারা ইহা খণ্ডিত হইবে না, ৩) জ্ঞান হিসেবে ইহার কিছু নূতনত্ব থাকিতে হইবে এবং ৪) বিষয়টির সঠিক উপস্থাপনা হইবে।"[৫৮]

মীমাংসকগণ মনে করেন যে, কোনো অস্তিত্বশীল বস্তু বা বিষয়ের সাথে যখন আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে তখন তাকে প্রত্যক্ষণ বলে। মহর্ষি জৈমিনি বস্তু এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সঠিক সংযোগের ফলে উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রত্যক্ষণ জ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। মোটকথা বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের সঠিক সংযোগ ঘটতে হবে। সঠিক সংযোগ ছাড়া যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন সম্ভব নয়। এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথমে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের, পরে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন এবং মনের সাথে আত্মার সংযোগ পরিলক্ষিত হয়। বিষয়, জ্ঞাতা এবং জ্ঞানীয় অনুভূতি প্রত্যক্ষণজনিত জ্ঞানে উপস্থিত থাকা আবশ্যক।[৫৯] অর্থাৎ এ মতানুসারে, "জ্ঞান উৎপত্তির সময় আত্মা মন নামক অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের সাথে সম্পর্কিত হয়; মন বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত হয় এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাথে বাহ্য বস্তুর সঠিক সংযোগ ঘটে।"[৬০] প্রভাকর মিশ্রও জৈমিনির অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেছেন। প্রত্যক্ষণ বলতে তিনি সাক্ষাৎ প্রতীতিকে নির্দেশ করেছেন। তিনি মনে করেন, প্রত্যক্ষণের সময় বস্তু, আত্মা এবং মন একত্রে সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষণে আত্মা, জ্ঞান এবং বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা হয়। এই তিনটি বিষয়ের প্রত্যক্ষের কারণে একে প্রভাকরের ত্রি-প্রত্যক্ষণ নীতি বলেও অভিহিত করা হয়।[৬১]

মীমাংসা দার্শনিকদের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত মতের শ্রেণিবিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। জ্ঞানের প্রকৃতিগত ভিন্নতার কারণে আমরা এই ভাগ দেখতে পাই। তাছাড়া প্রভাকর মিশ্র এবং কুমারিল ভট্ট দুই ধরনের শ্রেণিবিভাগের কথা বলেছেন। যথা: নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষণ।[৬২] এখন এই নির্বিকল্প এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে:

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ (Indeterminate Perception)

মানবইন্দ্রিয়ের সাথে বস্তুর যে প্রাথমিক সংযোগ ঘটে তাকে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ বলে। অর্থাৎ "The nirvikalpa perception of a thing is its perception at the first moment of the association of the senses and their objects."[৬৩] এই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণে বস্তু সম্পর্কে শুধুমাত্র অনুভূতি লাভ হয়। এই প্রত্যক্ষণে বস্তু সম্পর্কে অস্পষ্ট চেতনার উদ্রেক হয়। এখানে শুধুমাত্র বস্তুর অস্তিত্বজাত জ্ঞান লাভ হয়। তবে বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান হয় না। বস্তুর নাম, জাতি, গুণ, বৈশিষ্ট্য কোনো কিছুই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণে আমরা জানতে পারি না। সুনিশ্চিত, সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভ এখানে সম্ভব নয়। বস্তু সম্পর্কে কোনো রকম অনির্দিষ্ট, প্রাথমিক জ্ঞান আমরা পাই এই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণে।

ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সন্নিকর্ষ ঘটার অব্যবহিত পরে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ বলে। কুমারিল ভট্ট মনে করেন নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ হলো বস্তুসম্পর্কিত এক ধরনের সরল অনুভূতি। এখানে শুধুমাত্র আমরা স্বতন্ত্র বস্তুর অনুভূতি পাই। অন্যদিকে প্রভাকর মিশ্র নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ বলতে বস্তুর প্রকৃতিগত অনুভূতিকে বুঝিয়েছেন।[৬৪] তিনি মনে করেন, "ইন্দ্রিয় ও বস্তুর সংযোগের ফলে বস্তুর অস্তিত্ব বহনকারী একটি দ্রব্য, একটি গুণ এবং একটি জাতি অনুভূত হয়।"[৬৫] তবে এখানে বস্তু ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যকার যে সম্পর্ক তা কিন্তু অনুভূত হয় না। উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, কুমারিল ভট্ট এবং প্রভাকর মিশ্রের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য থাকলেও তাঁরা একমত পোষণ করে বলেন যে, নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ কিংবা জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে স্বরূপে চেনা বা জানা যায় না।[৬৬] নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণজাত জ্ঞানকে ভাষা বা বচনের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। এই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের উদাহরণে আমরা বলতে পারি যে, কোনো বস্তু সম্পর্কে একটি শিশুর অর্জিত জ্ঞান। অর্থাৎ শিশু অর্জিত জ্ঞানকে আমরা কখনো পূর্ণাঙ্গ, নিশ্চিত জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না।

সবিকল্প প্রত্যক্ষণ (Determinate Perception)

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের পথ ধরে কোনো বস্তুকে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করলে বস্তুটির গুণ, ধর্ম, জাত, স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, স্থায়িত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জ্ঞান পেয়ে থাকি। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে বস্তুটির যে অস্পষ্টরূপ পরিলক্ষিত হয় সবিকল্প প্রত্যক্ষণে তা স্পষ্ট রূপ ধারণ করে থাকে। এই সবিকল্প প্রত্যক্ষণকে আমরা সহজে ভাষা কিংবা বচনের সাহায্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারি। কুমারিল ভট্ট এবং প্রভাকর মিশ্রের মতপার্থক্য সবিকল্প প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। উভয়েই প্রত্যক্ষণের প্রকৃতি এবং স্বরূপের যে বর্ণনা করেন তা একই রূপ। তাঁরা উভয় প্রকার প্রত্যক্ষণকে বৈধ বলে মনে করেন। তবে কুমারিল এই মত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছেন যে, সবসময় সবিকল্প প্রত্যক্ষণের পূর্বে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ আসে।[৬৭] অন্য আরেক মীমাংসা ভাষ্যকার পার্থসারথী মিশ্র মনে করেন, নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ ব্যতীত সবিকল্প প্রত্যক্ষণের কল্পনা করা যায় না।[৬৮] তাই বলা হয়, নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ হলো প্রাথমিক স্তর এবং সবিকল্প হলো দ্বিতীয় স্তর। আর এই দ্বিতীয় স্তরে এসে সবিকল্প প্রত্যক্ষণ পরিণত রূপ লাভ করে। তবে এই প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে বৌদ্ধ ও বৈদান্তিকেরা কিছুটা দ্বিমত পোষণ করেছেন। সবিকল্প প্রত্যক্ষণে গুণাবলি, স্বরূপ এবং বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে উপলব্ধি বাস্তব, কল্পিত নয়। কিন্তু বৌদ্ধ ও বৈদান্তিকরা তা কল্পিত বলে গণ্য করেছেন। ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের আলোচনায়ও প্রত্যক্ষণের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নির্বিকল্প এবং সবিকল্পে প্রত্যক্ষণের প্রকারভেদ সংক্রান্ত আলোচনা

মীমাংসা এবং ন্যায় দর্শনে দেখা গেলেও এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষণের স্বরূপ নিয়ে উভয় সম্প্রদায় এবং এর অন্তর্গত দার্শনিকদের চিন্তায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ্যে বিশেষণের সম্বন্ধকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিশিষ্ট জ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয় না, শুধুমাত্র বস্তুর স্বরূপের উপলব্ধি হয় তাই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ। আর যে প্রত্যক্ষণে নাম, জাতি, গুণ, বৈশিষ্ট্যসহ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষণ ঘটে তাকে সবিকল্প প্রত্যক্ষণ বলে।[৬৯]

মোটকথা মীমাংসা দার্শনিকগণ যথার্থ বা সঠিক জ্ঞান পাওয়ার লক্ষ্যে জ্ঞানের অন্যতম উৎস প্রত্যক্ষণকে বেছে নিয়েছেন। তাঁরা এই প্রত্যক্ষণের দুটি ভাগের মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জনের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রসংশার দাবিদার। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন করে মানবকল্যানমুখী বৈশ্বিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনের মীমাংসকদের এই প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনার গুরুত্ব সর্বাধিক।

বেদান্ত দর্শনে প্রত্যক্ষণ

ভারতীয় আস্তিক দর্শনসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যতম স্থান দখল করে আছে বেদান্ত দর্শন। বেদের দুটি ভাগ লক্ষ করা যায়– (১) পূর্বকাণ্ড বা কর্মকাণ্ড এবং (২) উত্তরকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড। এই উত্তরকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত দর্শন। এই জ্ঞানকাণ্ডের আবার দুটি ভাগ লক্ষ করা যায়– আরণ্যক এবং উপনিষদ। বেদান্ত দর্শন এই উপনিষগদকেই কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তাই স্বাভাবিকভাবে উপনিষদকেই বেদান্ত দর্শন হিসেবে অভিহিত করা হয়। তবে এটিই 'বেদান্ত' শব্দের একমাত্র অর্থকে নির্দেশ করে না। বেদান্ত শব্দের অর্থ হলো 'বেদ'+'অন্ত' অর্থাৎ বেদের অন্ত। এই অন্ত শব্দ দ্বারা শ্রেষ্ঠ অর্থকেও নির্দেশ করে। অর্থাৎ বেদান্ত দর্শন যে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেকথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। মাধবাচার্য তাঁর *সর্বদর্শন* সংগ্রহ গ্রন্থে বেদান্ত দর্শনের গুরুত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে বলেন, এই দর্শন হলো 'সর্বদর্শনশিরোমনি'।

আধ্যাত্মবাদী প্রাচীন বৈদিক চিন্তাধারার পূর্ণতা লক্ষ করা যায় এই বেদান্ত দর্শনে। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ভারতীয় দর্শনের সমগ্র ঐতিহ্যকে ধারণ করেছে এই বেদান্ত দর্শন। প্রাসিঙ্গকভাবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য উল্লেখ করা যায়, "বেদান্ত দর্শনে ভারতীয় দর্শনচিন্তা নানা বিশ্বতত্ত্বের বৈচিত্র্যে, জ্ঞানতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে, মৌলিক ভাবধারার নূতন সমন্বয় এবং বিন্যাসে একটি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।"[৭০]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়েছে কারণ বৈদিক চিন্তাধারার পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বোচ বিকাশ আমরা দেখতে পাই এই উপনিষদে। তবে এই উপনিষদ ছাড়াও বেদান্ত দর্শনের উল্লেখযোগ্য আরো দুটি ভিত্তির সন্ধান আমরা দেখতে পাই। ভগবদ্‌গীতা এবং ব্রহ্মসূত্র। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উপনিষদ, গীতা এবং ব্রহ্মসূত্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বেদান্ত দর্শনের সৌধ। উপনিষদ, গীতা এবং ব্রহ্মসূত্রকে একত্রে 'প্রস্থানত্রয়' বলা হয়। এর এই প্রস্থানত্রয়ই বেদান্ত দর্শনের মূলভিত্তি। ব্রহ্মই হচ্ছে এই দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয়। এই বেদান্ত দর্শন মনে করে জীবাত্মা এবং ব্রহ্ম এক এবং এই ব্রহ্মই রয়েছে জগতের মূলে। মহর্ষি বাদরায়ণ ছিলেন এই দর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা। বেদান্ত দর্শনের মূল গ্রন্থ হচ্ছে *ব্রহ্মসূত্র*। মহর্ষি বাদরায়ণ এটি রচনা করেন। ৫৫২ সূত্রের সমাহার দেখা যায় এই *ব্রহ্মসূত্রে*। এটি *বেদান্তসূত্র* নামেও পরিচিত ছিল। মহর্ষি বাদরায়ণ তিনি তাঁর *ব্রহ্মসূত্রে* সাংখ্য দার্শনিক মত খণ্ডনের পাশাপাশি বৈদিক ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টায় রত ছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনের প্রত্যক্ষবাদ এবং নাস্তিক্যবাদের বিপক্ষে জোরালো ভূমিকাও এখানে লক্ষ করা যায়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে এই *ব্রহ্মসূত্রের* সূত্রগুলো ছিলো খুবই সংক্ষিপ্ত যার কারণে এগুলোর ওপর ভাষ্য বা ব্যাখ্যা রচনা করার আবশ্যিকতা দেখা দেয়। আর এ সকল ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকারদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক একটি বেদান্ত দর্শন সম্প্রদায়। এই বেদান্ত দর্শনের উল্লেখযোগ্য এবং প্রভাবশালী ভাষ্যকার হিসেবে আমরা শঙ্কর, রামানুজ, মাধব, বল্লভ প্রমুখের নাম দেখতে পাই। তবে শঙ্কর এবং রামানুজের মতবাদ, চিন্তা বেশি প্রভাব এবং খ্যাতি বিস্তার করতে সক্ষম হয়। বেদান্ত দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই দুজন ভাষ্যকার শঙ্কর এবং রামানুজ তাঁদের নিজস্ব স্বকীয়তা এবং দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাই জ্ঞানতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে আমাদের আলোচনা আবর্তিত থাকবে বেদান্ত জ্ঞানতত্ত্বের প্রত্যক্ষণকে ঘিরে। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমে আমরা শঙ্করের মত এবং পরবর্তীতে রামানুজের মত নিয়ে আলোচনা করবো:

প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে শঙ্করের মত

প্রমাণ সম্পর্কিত আলোচনায় শঙ্করের যে চিন্তা আমরা দেখি তা ভাট্ট মীমাংসকদের সাথে প্রায় পুরোপুরি মিলে যায়। শঙ্করাচার্য ছয় রকম প্রমাণের কথা বলেছেন। যথা: প্রত্যক্ষণ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি।

প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে দার্শনিক শঙ্কর নির্দেশিত প্রত্যক্ষণের প্রকৃতির সাথে আমরা মীমাংসা দার্শনিক কুমারিলের মতের সাদৃশ্যই দেখতে পাই। বেদান্ত দর্শনে ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করি তাকে প্রত্যক্ষণ জ্ঞান বলে। বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়ের সরাসরি সন্নিকর্ষের ফলে

অন্তঃকরণ সৃষ্টি হয়ে সেই বস্তুটি আকারে পরিণত হয়ে থাকে। অন্তঃকরণের এই জাতীয় ফলাফলকে 'বৃত্তি' বলা হয়। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য প্রত্যক্ষণজ্ঞান হলো অন্তঃকরণের বৃত্তিমূলক জ্ঞান। শঙ্কর মনে করেন, বহিঃপ্রত্যক্ষের সময় আমাদের মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে বস্তুর আকারে আকারিত হয়ে থাকে এবং এর মানসিক ধরনকে বৃত্তি বলা হয়। এই বৃত্তিই প্রত্যক্ষণ জ্ঞান হিসেবে পরিচিত।[৭১]

শঙ্করের দার্শনিক আলোচনা থেকে আমরা প্রত্যক্ষণের বিভন্ন শ্রেণিবিভাগ দেখতে পাই। যেমন : প্রত্যক্ষণগত জ্ঞানের প্রকৃতির ভিন্নতা অনুযায়ী নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষণ। প্রত্যক্ষণের উপায়গত ভিন্নতার দিক থেকে ইন্দ্রিয়জাত এবং অনিন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষণ। আবার বিষয়গত প্রকৃতির দিক থেকে বিষয়গত প্রত্যক্ষণ এবং জ্ঞানগত প্রত্যক্ষণ।[৭২] এছাড়াও ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষণ করার দিক থেকে জীবসাক্ষী এবং ঈশ্বরসাক্ষী প্রত্যক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। এখন এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষণ

প্রত্যক্ষণগত জ্ঞানের প্রকৃতিগত ভিন্নতা অনুযায়ী প্রত্যক্ষণকে সবিকল্প এবং নির্বিকল্প হিসেবে ভাগ করা যায়। শঙ্করের এই নির্বিকল্প এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষণের ব্যাখ্যা মীমাংসাদর্শনের ভাট্টদের ব্যাখ্যাত বিষয়ের অনুরূপ। যে প্রত্যক্ষণের মধ্যে বিশেষ্য এবং বিশেষণ সম্বন্ধ দেখা যায় তাকে সবিকল্প প্রত্যক্ষণ বলা হয়। আর যে ধরনের প্রত্যক্ষণে বিশেষ্য-বিশেষণ এবং উভয়ের সম্বন্ধগত জ্ঞান পরিলক্ষিত হয় না তাকে সবিকল্প প্রত্যক্ষণ বলে। অর্থাৎ এখানে বিশেষণ বর্জিত জ্ঞান হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য-বিধেয়ের সম্বন্ধ এখানে দেখা যায় না। মীমাংসা দর্শনের কুমারিলের মত অনুযায়ী প্রথমে আসে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ এবং পরে আসে সবিকল্প প্রত্যক্ষণ। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত দার্শনিকগণ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন সবিকল্প প্রত্যক্ষণের পরে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণে যে ভেদজ্ঞান পরিলক্ষিত হয় তা নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণে লোপ পেয়ে থাকে। ফলে জীব এবং ব্রহ্মের ক্ষেত্রে অভিন্ন জ্ঞান জন্মে থাকে।[৭৩] অর্থাৎ সবিকল্প প্রত্যক্ষণে মনের ক্রিয়া দ্বারা সত্তার ভেদবিষয়ক জ্ঞান অর্জিত হয়ে থাকে। অদ্বৈত বেদান্ত দার্শনিকগণ ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সবিকল্প জ্ঞানকে স্বীকার করে নিলেও এই জ্ঞান তাঁদের কাছে মিথ্যা। কেননা পারমার্থিক দৃষ্টিবিচারে তাঁদের কাছে নির্বিকল্প জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান হিসেবে গ্রহণীয় বা স্বীকৃত।[৭৪]

ইন্দ্রিয়জ এবং অইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষণ

উপায়গত ভিন্নতার দিক থেকে প্রত্যক্ষণকে ইন্দ্রিয়জ এবং অইন্দ্রিয়জ এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষণ সংঘঠিত হয়ে থাকে তাকে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষণ বলে। আর মনের সাহায্যে সংঘঠিত প্রত্যক্ষণকে অইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষণ বলে। বেদান্ত দর্শনে মনকে ইন্দ্রিয়ভুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয়নি তাই মনোগত প্রত্যক্ষণকে অইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষণ বলা হয়েছে।[৭৫]

এছাড়াও শঙ্করাচার্য বিষয়গত এবং জ্ঞানগত প্রত্যক্ষণের পাশাপাশি জীবসাক্ষী, ঈশ্বরস্বাক্ষী প্রত্যক্ষণের কথা বলেছেন। যখন প্রত্যক্ষণের বিষয়গুলো মানসিক ধরনসমূহ দ্বারা প্রত্যক্ষিত হয়ে বিষয়ানুরূপ বৃত্তিজ্ঞানের জন্ম হয় তখন তাকে বিষয়গত প্রত্যক্ষণ বলে। পক্ষান্তরে, যে সকল মানসিক জাতীয় মাধ্যম রয়েছে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতীত আত্মা যখন কোনো জ্ঞানকে প্রত্যক্ষণ করে থাকে তখন তাকে জ্ঞানগত প্রত্যক্ষণ বলে। আর জীবসাক্ষী এবং ঈশ্বরসাক্ষী প্রত্যক্ষণ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়, "শাশ্বত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম যখন অন্তঃকরণের অবিদ্যাপ্রসূত উপাধি দ্বারা শর্তাবদ্ধ হয়ে প্রত্যক্ষিত বিষয়ের আকার ধারণ করে তখন তাকে জীবসাক্ষী প্রত্যক্ষ বলা হয়। অন্যদিকে, শাশ্বত চৈতন্যরূপ ব্রহ্ম যখন মায়াবৃত্তি দ্বারা শর্তাবদ্ধ হয়ে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয়ের আকার ধারণ করে তখন তা ঈশ্বস্বাক্ষী প্রত্যক্ষ।"[৭৬] তবে জীবসাক্ষী প্রত্যক্ষণে অনেকগুলো কারণ থাকলেও ঈশ্বরসাক্ষী প্রত্যক্ষণে মায়াই হলো একমাত্র কারণ। শঙ্করের চিন্তায় আমরা প্রত্যক্ষণের যে শ্রেণিবিভাজন দেখতে পাই তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। পরিশেষে বলা যায়, জীবনের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে হলে শংকরের চিন্তার সাথে আমরা যদি একাত্মতা অনুভব করি তবে আমাদের জীবন নিঃসন্দেহে আরো মসৃণ হবে। এ প্রসঙ্গে ড. রাধা কৃষ্ণাণের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি শঙ্কর প্রসঙ্গে বলেন, "Supreme as a philosopher and a dialectician, great as a man of calm judgement and wide toleration, Samkara taught us to love truth, respect reason and realise the purpose of life."[৭৭]

প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে রামানুজের মত

রামানুজের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ লক্ষ করা যায়। রামানুজ মনে করেন জ্ঞান হলো সবিষয়ক। এই জ্ঞান তার নিজ থেকে ভিন্ন ধরনের এবং এটি তার থেকে অতিরিক্তি কোনো বিষয়ের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। জ্ঞানের সাথে বিষয় সম্পৃক্ত। কেননা বিষয়হীন কোনো জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। রামানুজ মনে করেন স্বপ্রকাশমান বিষয় হিসেবে জ্ঞান বিষয়সমূহ প্রকাশের সাথে সাথে নিজেকেও প্রকাশ করে থাকে। আর বিষয় প্রকাশকারী জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে রামানুজ ছিলেন স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী।[৭৮] রামানুজ তিন ধরনের প্রমাণকে স্বীকার করে

নিয়েছেন। যথা: প্রত্যক্ষণ, অনুমান এবং আগম বা শব্দ। এখন প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে রামানুজের মত আলোচনা করা হল:

প্রত্যক্ষণ বলতে বোঝায় সাক্ষাৎ বা সরাসরি জ্ঞান। বিশিষ্ট বিষয়ের সত্তা প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে থাকে। প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে রামানুজের সংজ্ঞা ছিল এরূপ, "ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ-সম্বন্ধের ফলে লব্ধ সংবেদনের মাধ্যমে বিষয় সম্পর্কে যে প্রাথমিক বোধ উৎপন্ন হয় উহার সহিত সম্বন্ধসাপেক্ষ জাতিবাচক চৈতন্যের আকারযুক্ত হইয়া যখন বিষয়টির সবিশেষ জ্ঞান হয় উহাকে প্রত্যক্ষ বলা হয়।"[৭৯] প্রত্যক্ষণ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়, যে যথার্থ জ্ঞানের কেন্দ্রে অন্যকোনো জ্ঞান কারণরূপে বিরাজ করে না তাকে প্রত্যক্ষণ জ্ঞান বলা হয়। প্রত্যক্ষণ যথার্থ জ্ঞান হওয়ার কারণে এখানে কোনো ভ্রান্ত জ্ঞান হওয়ার সুযোগ নেই। রামানুজের মতে প্রত্যক্ষণ দুই প্রকার। যথা: নিত্য প্রত্যক্ষণ এবং অনিত্য প্রত্যক্ষণ। সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের যে জ্ঞান তাই হচ্ছে নিত্য প্রত্যক্ষণ। কেননা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সবসময় সববস্তু নিত্য প্রত্যক্ষণ করছেন। অন্যদিকে মানুষ তার ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষণ জ্ঞান লাভ করে তাকে অনিত্য প্রত্যক্ষণ বলে।[৮০] রামানুজের মতে এই অনিত্য প্রত্যক্ষণের আবার দুটি রূপ রয়েছে। যেমন: যোগজ প্রত্যক্ষণ এবং অযোগজ প্রত্যক্ষণ। যোগী, ঋষি এবং মুনিরা ইন্দ্রিয়জ শক্তির বাইরে তাঁদের দীর্ঘ সাধনালব্ধ জ্ঞান দ্বারা বস্তুসমূহের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করে থাকেন তাকে যোগজ প্রত্যক্ষণ বলে। আর সাধারণ মানুষ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক নামক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করে থাকে তাকে অযোগজ প্রত্যক্ষণ বলে।

এছাড়াও রামানুজ অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রদত্ত নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষণকেও স্বীকার করে নিয়েছেন। রামানুজ মনে করেন কোনো বস্তুকে যখন সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষণ করা হয় তখন তাকে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ বলে। অর্থাৎ বস্তু সম্পর্কে এখানে প্রাথমিক প্রত্যক্ষণ হয়। এই প্রত্যক্ষণে আমরা জ্ঞেয় বস্তুটির কয়েকটি গুণ বা ধর্ম সম্পর্কে সামান্য ধারণা লাভ করে থাকি। তবে সার্বিক ধর্ম বা গুণ এখানে অজ্ঞাত থাকে বলে বস্তুটি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান হয় না। পক্ষান্তরে, প্রথমে প্রত্যক্ষণ করা বস্তুকে যখন দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বার প্রত্যক্ষণ করা হয় তখন ঐ বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার পাশাপাশি উপলব্ধিবোধও জাগ্রত হয় এবং এ জাতীয় উপলব্ধিবোধ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়– এ ধরনের প্রত্যক্ষণকে সবিকল্প প্রত্যক্ষণ বলে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বেদান্ত দর্শনের অন্যতম প্রখ্যাত ভাষ্যকার শঙ্কর এবং রামানুজ তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রত্যক্ষণের যে বিশ্লেষণ এবং বিভাগ দেখিয়েছেন তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং যৌক্তিক। যদিও তাঁদের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনায় বেশ কিছু মতপার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। তবে

এই মতপার্থক্যের কারণে জ্ঞানের বহুমাত্রিকতা আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসে শঙ্কর এবং রামানুজের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। শুধু তাই নয় সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ, তাত্ত্বিক গভীরতা এবং যৌক্তিক বিন্যাসে সমৃদ্ধ তাঁদের চিন্তাচেতনা আমাদেরকে প্রগতির পথে অগ্রসর হতে বিশেষভাবে সহয়তা করেছে। তাই ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে ক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত চিন্তা এবং বিশ্লেষণের গুরুত্ব রয়েছে সমধিক।

চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষণ

সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা দুটি প্রধান ভাগ দেখতে পাই। যথা: বৈদিক এবং অবৈদিক। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা এবং বেদান্ত দর্শনকে বৈদিকপন্থী বলা হয়, কারণ এই ষড়দর্শন সম্প্রদায় বেদের কর্তৃত্ব এবং প্রামাণ্যকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে। তাই এদেরকে আস্তিক দর্শনও বলা হয়। অন্যদিকে চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন বেদের কর্তৃত্ব এবং প্রামাণ্য স্বীকার করে না। এই তিনটি দর্শন সম্প্রদায় বেদকে সঠিক বলে মনে করে না। তাই এঁরা নাস্তিক সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। উল্লেখ্য যে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার এবং অস্বীকার করার ওপর ভিত্তি করে ভারতীয় দর্শনে আস্তিক এবং নাস্তিক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দদ্বয় ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই এখানে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বা অবিশ্বাস করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়।[৮১]

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বেদবিরোধী যে তিনটি নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের দেখা আমরা পাই তার মধ্যে অন্যতম চার্বাক দর্শন। ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশে এই চার্বাক দর্শন জড়বাদী দর্শন হিসেবে পরিচিত। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে চার্বাক দর্শন সম্পর্কে জানা যায়। চার্বাকদের মতে জগতের মূল উপাদান হলো জড় এবং এ থেকেই জাগতিক সবকিছুর উৎপত্তি হয়ে থাকে। চার্বাকরা ছিলেন আধ্যাত্মবাদবিরোধী। চার্বাক দর্শনের যাত্রা শুরু হয় আধ্যাত্মবাদ এবং উগ্রব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধীতার মধ্যে দিয়ে। চার্বাকদের দৃষ্টিতে জড়ই ছিল চরম সত্তা। এই চার্বাক দর্শন মূলত তাঁদের জ্ঞানতত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাঁদের মতে সত্যকে জানার একমাত্র উপায় হলো প্রত্যক্ষণ।[৮২] চার্বাকদের চিন্তা প্রসঙ্গে *সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ*- এ উল্লেখ পাওয়া যায়, "চার্ব্বাক প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন, অনুমান প্রভৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না।"[৮৩] বেদ এবং উপনিষদে সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ, যদৃচ্ছাবাদ এবং স্বভাববাদে যে বিক্ষিপ্তরূপ পরিলক্ষিত হয় তার একটি সুসংহত এবং সমন্বিত দার্শনিক ব্যাখ্যা আমরা চার্বাক জড়বাদে দেখতে পাই।

এই চার্বাক দর্শনের ইতিহাস অন্বেষনে দেখা যায়, বেদ এবং বিভিন্ন উপনিষদে সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ, যদৃচ্ছাবাদ এবং স্বভাবাদের আলোচনা বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। আর এই সকল বিক্ষিপ্ত

চিন্তাভাবনার একটি সুন্দর ও পরিশীলিত দার্শনিক রূপ আমরা চার্বাক জড়বাদে দেখতে পাই। চার্বাক দর্শন বেদ, ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, ধর্ম, মোক্ষ প্রভৃতিকে অস্বীকার এবং বিরোধিতা করেছে। তাই এ সকল বিষয়ের আলোচনা চার্বাক দর্শনে কোনো স্থান পায়নি। আনুমানিক প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে সূচিত এই দর্শনে যে বস্তুবাদের উল্লেখ ছিল তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানকালের বস্তুবাদের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। চার্বাকদের চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো একদিকে বিশুদ্ধ বস্তুবাদ এবং অন্যদিকে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদ। এই চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষণকেই একমাত্র প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণের বাইরে কোনো কিছুকে তাঁরা স্বীকার করেননি।[৮৪] সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাপন পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস-সংস্কৃতি প্রভৃতির সাথে এই দর্শনের বেশ মিল থাকায় এই দর্শনকে আবার লোকায়ত দর্শন হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

চার্বাক দর্শনে মূলত জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং নীতিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা দেখা যায়। তবে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাই এ দর্শনে প্রাধান্য পেয়েছে। এই জ্ঞানতত্ত্বের মূল আলোচনাই হলো– প্রকৃত জ্ঞানের সংজ্ঞা কী এবং তাকে পাওয়ার উপায় বা কী? এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক দেবব্রত সেন– এর বক্তব্য উল্লেখ করা যায়, "চার্বাকগণ বলেন, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। 'প্রমাণ' মানে 'প্রকৃষ্টমান' বা 'সম্যক জ্ঞান'। 'সম্যক' মানে 'সংশয় ও বিপর্যয়শূন্য'। সংশয় ও বিপর্যয়শূন্য, অনধিগত বস্তুর জ্ঞানই সম্যক জ্ঞান বা প্রমা। প্রমার জনকই প্রমাণ।"[৮৫] অর্থাৎ প্রত্যক্ষণকেই তাঁরা একমাত্র বৈধজ্ঞান হিসেবে মেনেছেন।[৮৬]

চার্বাকদের জ্ঞানতাত্ত্বিক চিন্তার ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রত্যক্ষেতর প্রমাণসমূহের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে প্রত্যক্ষণকে তাঁরা জ্ঞান অর্জনের প্রধান এবং মৌলিক উৎস হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁদের কাছে বহিরিন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষণই মূলত গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁরা মনে করেন সঠিকভাবে বস্তুর প্রত্যক্ষণ জ্ঞাতাকে কখনও নিরাশ করে না। চার্বাকদের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে Davis and Elkins কলেজের ধর্ম ও দর্শন বিষয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক কিশোর কুমার চক্রবর্তী গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যা তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *Classical Indian Philosophy of Induction*-এ আমরা দেখতে পাই। তিনি বলেন, "In the Carvaka view, if something cannot be perceived by anyone at any time whatsoever, then, since perception is the only source of knowledge, it cannot be admitted to exist."[৮৭] তাঁদের দর্শনের এই প্রত্যক্ষণজনিত ব্যবহারিক উপযোগিতা সাধারণ লোকের কাছে বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। চার্বাকরা মনে করেন, প্রত্যক্ষণ ছাড়া আমরা অন্য কোনো উপায়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পরি না। মূলত চার্বাকদের দার্শনিক মতবাদ জ্ঞানতত্ত্বের উপরই দাঁড়িয়ে আছে।[৮৮]

ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে মীমাংসা, বেদান্ত এবং জৈন দর্শনে দেখা যায় তারা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অর্থাৎ ছয়টি প্রমাণ বা জ্ঞানের উৎসের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বস্তুবাদী চার্বাক সম্প্রদায় মাত্র একটি উৎসকে স্বীকার করেছেন আর তা হলো প্রত্যক্ষণ। শুধু তাই নয় এই প্রত্যক্ষণকে তারা একমাত্র বৈধ জ্ঞানের উৎস হিসেবে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করেছেন। ইন্দ্রিয়ের বাইরের কোনো কিছুকে তাঁরা মানতে নারাজ। আর এ দৃষ্টিকোণ থোকে তাঁরা জ্ঞানের অন্যান্য বৈধ উৎসকেও অস্বীকার করেছেন।[৮৯] ফলে চার্বাকদের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত চিন্তা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে লতিকা চট্টোপাধ্যায়ের চিন্তায় চার্বাকদের প্রত্যক্ষণের গুরুত্ব এখানে উল্লেখ করা যায়, "প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী হিসেবে চার্বাকী চিন্তা সাধারণের কাছে পরিচিত লাভ করেছে এবং বস্তুবাদের সঙ্গে একাত্মভাবে এই দর্শনের প্রচারের মূলে প্রমাণসম্বন্ধীয় যে ধারণা আছে এটাই দর্শনটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।"[৯০] প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত চার্বাকদের চিন্তা প্রসঙ্গে অধ্যাপক Ray Billington বলেন, "Perception is the sole basis or source of knowledge, and consequently only the object of perception are real."[৯১] এই প্রত্যক্ষণজনিত প্রমাণের কারণে তাঁদের দর্শনকে লোকায়ত দর্শনও বলে। ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুৎ এই চতুর্ভূতকে সঠিক সত্তা বলে গ্রহণ করে তারা সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করে থেকেছেন সাধারণ মানুষের কাছাকাছি।[৯২] চার্বাক প্রত্যক্ষণে পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা সরাসরি বাহ্য জগৎ থেকে অর্জিত জ্ঞানকেই একমাত্র বৈধ জ্ঞান বলে বিবেচনা করা হয়েছে। চার্বাক মতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কেবলমাত্র নির্ভুল এবং সংশয়হীন জ্ঞান আমরা পেতে পারি। এই চার্বাক দর্শনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে চার্বাকদের মধ্যে তিনটি শ্রেণি বা উপসম্প্রদায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা: বৈতণ্ডিক, ধূর্ত এবং সুশিক্ষিত শ্রেণি বা সম্প্রদায়। তবে আধুনিককালে চার্বাকদের মধ্যে মূলত দুটি শ্রেণির উল্লেখ দেখা যায়। যথা: ধূর্ত এবং সুশিক্ষিত শ্রেণি। ধূর্ত চার্বাকদের মতে প্রত্যক্ষণই একমাত্র জ্ঞান অর্জনের কেবলমাত্র উৎস। অর্থাৎ বিষটির আরো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বলা যায়, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাথে মনের সংযোগ না হলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনো অন্য জ্ঞান নির্ভর নয়। চার্বাকরা আরও মনে করেন, আমাদের ইচ্ছা, সুখ-দুঃখ, বুদ্ধি, অনুভূতি, দ্বেষ প্রভৃতি মানসিক অবস্থাকে মানস প্রত্যক্ষণের দ্বারা জানা যায়। তাই ধূর্ত চার্বাক মতে প্রত্যক্ষণকেই একমাত্র প্রমাণ বলা হয়েছে। এই প্রত্যক্ষণের দ্বিবিধ প্রকারভেদ লক্ষ করা যায়। যথা: নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষণ। বস্তুর প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে যখন আমরা ঐ প্রত্যক্ষিত বস্তুর নাম, গুণ, ধর্ম, জাতি, বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বস্তুর প্রাথমিক অবস্থাগত অস্তিত্ব বা বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান লাভ করি তখন তাকে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ বলে। অন্যদিকে যখন বস্তুর প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে বস্তুর জাতি, ধর্ম, গুণ এবং বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে অর্থাৎ বস্তুর বিশিষ্ট রূপ যখন প্রত্যক্ষণ করা হয় তখন তাকে সবিকল্প প্রত্যক্ষণ বলা হয়। চার্বাকরা মনে করেন অন্যান্য সকল

ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় অন্য প্রমাণ স্বীকার করলেও প্রত্যক্ষণকে তাঁরা সর্বপ্রথমে স্থান দিয়েছেন। তাই নির্দ্বিধায় চার্বাকরা প্রত্যক্ষণকে সকল প্রামাণ্যের জনক হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৯৩]

অন্যদিকে বিতণ্ডা চার্বাকরা কোনো ধরনের প্রমাণের অস্তিত্বকে তারা স্বীকার করেননি। তবে সুশিক্ষিত চার্বাকগণ ইন্দ্রিয়গাহ্য বস্তুর জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুমান স্বীকার করে নিয়েছেন। নব্যনৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট এবং বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তিরক্ষিত সুশিক্ষিত চার্বাকদের সম্পর্কে এমন কথা বলেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, চার্বাকরা নির্বিচারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষণকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসেবে স্বীকার করেছেন। প্রত্যক্ষণের বাইরে তাঁরা কোনো কিছু স্বীকার করতে চান না। অর্থাৎ চার্বাকদের জগৎ শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।[৯৪] তাই বলা যায় ইন্দ্রিয়কে স্বীকার করে তাঁরা মূলত মানুষের মানস জগৎকে অস্বীকার করেছেন, সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন মানুষের চিন্তার, বিশ্লেষণের জগৎ। ফলে মানবসভ্যতার উৎকর্ষতায় মানুষের দৈহিক এবং মানসিক দিকের সম্মিলনকে অস্বীকার করা হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে একপেশে চিন্তা। তাই প্রকৃত বিচারে তাঁদের এই একতরফা প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়কে মেনে নেওয়া যায় না। কেননা অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণের বাইরে আলোচনা, বিচার, বিশ্লেষণ, সমালোচনা, তত্ত্ব প্রভৃতিকে অস্বীকার করে। তাই এই দর্শন বেশ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, বস্তুর ধারণা নয়, আমরা বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে থাকি। তবে বস্তুর ধারণা এবং সংজ্ঞাকে আমরা অনুমানের মাধ্যমে সত্য বলে মেনে নিই। কেননা এটি ছাড়া জ্ঞান সম্ভব হয় না।

চার্বাকদের এই প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত মতের ক্ষেত্রে কিছুটা সমালোচনা পরিলক্ষিত হলেও, তাঁরা পঞ্চ জ্ঞানোন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে মানুষের অতিপ্রাকৃত সত্তা নির্ভরশীলতা কমাতে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন তা শুধু ভারতীয় দর্শন নয়, বিশ্ব দর্শনের ইতিহাসের এক নজিরবিহীন ঘটনা। বিংশশতাব্দীর পাশ্চাত্য দর্শনের যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মতো তাঁরাও মানুষকে অধিবিদ্যামুক্ত করে ইহজাগতিক বিষয়ের প্রতি যেভাবে আকৃষ্ট করেছেন তা সময়ের বিচারে যথার্থ। তাছাড়া তাঁরা তাঁদের এই জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ দ্বারা দর্শনকে জনপ্রিয় করতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। ফলে তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক তথা প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত মতবাদকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখা চলে না।

জৈন দর্শনে প্রত্যক্ষণ

ভারতীয় দর্শনের তিনটি অবৈদিক সম্প্রদায়ের অন্যতম হলো জৈন দর্শন। জৈন ধর্মের তত্ত্বগত দিকের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এই দর্শন। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই দর্শনের আবির্ভাব হয়েছিল বলে

ধারণা করা হয়। তাই এই দর্শনের প্রাচীনত্ব নিয়ে তেমন কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় না। চব্বিশজন তীর্থঙ্কর হলেন এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রচারক। এই তীর্থঙ্করদের মধ্যে প্রথম জন হলেন ঋষভদেব এবং সর্বশেষ জন হলেন মহাবীর বা বর্ধমান।[৯৫] এই মহাবীরের পূর্বে জৈন মতবাদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় না। জৈন ধর্ম এবং দর্শনের যে সকল অন্যতম প্রধান গ্রন্থসমূহ পরিলক্ষিত হয় সেখানে মহাবীরের বাণী প্রচারিত হয়েছে। তাই এই মহাবীরকে জৈন দর্শনের মূল প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এই মহাবীর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। ধর্মীয় আচার-ব্যবহারকে কেন্দ্র করে জৈন দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, ফলে তাঁদের মধ্যে শেতাম্বর এবং দিগম্বর নামে দুটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তবে তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মূলত একই। অর্থাৎ দর্শনের মৌলিক কোনো বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।[৯৬]

জৈনরা ছিলেন নিরীশ্বরবাদী, ঈশ্বরের প্রতি তাঁদের কোনো ধরনের বিশ্বাস ছিল না। তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং বহুত্ববাদী। জৈন দার্শনিকরা প্রত্যক্ষবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই প্রত্যক্ষের বিষয় সৎ এবং সংখ্যায় বহু। জৈনমত একদিকে বহির্জগতের অস্তিত্বকে সৎ হিসেবে গ্রহণ করছেন, অন্যদিকে তাঁরা একাধিক সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এই জৈন দর্শনের সামগ্রিক আলোচনাকে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: জ্ঞানতত্ত্ব, পরাতত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্ব ও ধর্ম। যেহেতু আমাদের আলোচনা জ্ঞানতত্ত্বের প্রত্যক্ষণকে ঘিরে তাই আমাদের দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ থাকবে।

পদার্থের যথাযথ ধারণাকেই জৈন দার্শনিকরা জ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই জ্ঞান হতে হলে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধ অনিবার্য। এদের কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে জ্ঞান সম্ভব নয়। জৈন মতে আত্মাকে জ্ঞাতা বলা হয়েছে এবং জ্ঞানকে বলা হয়েছে আত্মার স্বাভাবিক গুণ। আর এই জ্ঞান বা চৈতন্য হলো আত্মার স্বরূপ। এই জ্ঞান হলো একদিকে নিজের প্রকাশক এবং অন্যদিকে বস্তুসমূহের প্রকাশক হিসেবেও কাজ করে। অর্থাৎ, জৈন মতে যখনই আমরা কোনো কস্তুর জ্ঞান লাভ করে থাকি, তখন আত্মা বিষয়ের সাথে নিজস্ব জ্ঞানও লাভ করে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে জৈন দর্শনে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং এদের মধ্যে যখন কোনো ধরনের সম্বন্ধ স্থাপন হয় তখন জ্ঞানের উদ্রেক হয়ে থাকে। জৈনরা তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় চেতনার বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে বাইরের বস্তুর অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। জৈনদের জ্ঞানের স্বরূপ প্রসঙ্গে সহজ করে বলা যায়, বাস্তাবস্থায় যে জিনিস যেভাবে আছে তাকে ঠিক সেভাবে জানাকে জ্ঞান বলে। জাগতিক বস্তুসমূহের সাথে যদি জ্ঞাতার সঠিকভাবে পরিচয় হয় তাহলে জ্ঞান হবে, অন্যথায় যথার্থ জ্ঞান সম্ভব

নয়। মোটকথা জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃত ধারণাই যথার্থ জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পথ। আর যে ধারণায় কোনো রকম সন্দেহ থাকে তাকে যথার্থ জ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না।

জৈনরা মনে করেন যথার্থ জ্ঞান পাঁচ রকম। যথা: মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্যায় এবং কেবল। অন্যদিকে অপরোক্ষ এবং পরোক্ষ হিসেবে জ্ঞানের শ্রেণিকরণ করেন তাঁরা।[৯৭] অবধি, মনঃপর্যায় এবং কেবলজ্ঞানকে তাঁরা অপরোক্ষ জ্ঞান বলেছেন। তাঁদের মতে ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্য ব্যতীত এসব জ্ঞান সরাসরিভাবে লব্ধ হয়ে থাকে। মতি এবং শ্রুতজ্ঞানকে জৈনরা পরোক্ষ জ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে ইন্দ্রিয় এবং মনের সাহায্যে এই জ্ঞান লাভ করা যায়। জৈন দার্শনিকরা চার্বাকদের মতো শুধুমাত্র এক প্রকার জ্ঞানের উৎসের কথা স্বীকার করেননি। চার্বাকরা যেখানে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষণের কথা বলেছেন, জৈনরা সেখানে প্রত্যক্ষণ, অনুমান এবং শব্দকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এখন সংক্ষেপে জৈনদের জ্ঞানের অন্যতম উৎস প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

সাধারণভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের সাথে বিষয়ের সন্নিকর্ষে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে প্রত্যক্ষণজনিত জ্ঞান বলে। কিন্তু জৈন দর্শনে এই প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে ভিন্ন কথা বলা হয়েছে। জৈন দর্শনে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলো পরোক্ষজ্ঞান। ধারাবাহিক আলোচনায় সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, মীমাংসা এবং বেদান্ত দর্শনে প্রত্যক্ষণের যে সংজ্ঞা আমরা দেখেছি জৈন দর্শনের ক্ষেত্রে তা ভিন্ন। তবে নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গেশ, বিশ্বনাথ এবং ভরদ্বাজ প্রত্যক্ষণের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন জৈন দর্শনের সাথে তার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

জৈনরা স্পষ্ট জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। জৈনমতে অন্যকোনো ধরনের জ্ঞানের সাহায্যে ব্যতীত কোনো বস্তুকে যখন তার বিশেষ গুণসহ উপলব্ধি বা পর্যবেক্ষণ করা হয় তখন তাকে প্রত্যক্ষণ বলে।[৯৮] জ্ঞানের এই প্রত্যক্ষগত প্রমাণ যেকোনো পরোক্ষ প্রমাণ থেকে শক্তিশালী।[৯৯] জৈন দার্শনিকরা এই প্রত্যক্ষণকে আবার দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা: অভিজ্ঞতালব্ধ বা সাংব্যবহারিক প্রত্যক্ষণ এবং পরামার্থিক বা অতিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ। অভিজ্ঞতালব্ধ বা সাংব্যবহারিক প্রত্যক্ষণ অবাধিত বা বিরোধিতা বর্জিত প্রত্যক্ষণ। এই প্রত্যক্ষণ আমাদেরকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে শঙ্কিত বস্তু লাভ করতে সহয়তা করে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বা অহিতকর বস্তু পরিহার করে। সকল ধরনের লৌকিক প্রত্যক্ষণ এই সাংব্যবহারিক প্রত্যক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মন এই প্রত্যক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মন এই প্রত্যক্ষণের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। অধ্যাপক দেবব্রত সেন সাংব্যবহারিক প্রত্যক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, "এই প্রত্যক্ষ থেকে গ্রাহ্য-বিষয়ের গ্রহণ এবং ত্যাজ্য-বিষয়ের বর্জন রূপ সফল প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উৎপন্ন হয়।"[১০০]

সাংব্যবহারিক বা অভিজ্ঞতামূলক প্রত্যক্ষণের আবার দুটি রূপ দেখা যায়। যথা: ইন্দ্রিয়জ এবং অনিন্দ্রিয়জ। আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাথে বাইরের বস্তুর সংযোগ স্থাপনের ফলে ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষণ ঘটে থাকে। এই প্রত্যক্ষণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জাত হয়ে থাকে। অন্যদিকে, আমাদের মানসিক বিষয়সমূহ হলো অনিন্দ্রিয়জ বা অইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষণ। এই প্রত্যক্ষণে আমাদের মনোজগতে সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, বেদনাবোধ প্রভৃতি অনুভূতির উদ্রেক ঘটে।[১০১] তবে এই দুই ধরনের প্রত্যক্ষণে আংশিক জ্ঞান হয়ে থাকে।[১০২] অন্যদিকে, পারমার্থিক বা অতিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণে ইন্দ্রিয়ের কোনো ভূমিকা নেই। এই প্রত্যক্ষণের বেলায় কোনো শর্তও প্রযোজ্য নয়। আত্মা যখন সকল প্রকার কর্মের বন্ধন মুক্ত হয়ে সর্বজ্ঞতা অর্জন করে তখন তাকে পারমার্থিক প্রত্যক্ষণ বলে। এই পারমার্থিক বা অতিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণে কোনো কিছুর কোনো ধরনের সাহায্যে-সহযোগিতা ছাড়া আত্মা সরাসরিভাবে জ্ঞান লাভ করে।

এই প্রত্যক্ষণ শুধুমাত্র আত্মকেন্দ্রিক। পারমার্থিক বা অতিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের দুটি ভাগ রয়েছে। যথা: সফল বা পূর্ণাঙ্গ এবং বিকল বা অপূর্ণাঙ্গ। বিকল পারমার্থিক প্রত্যক্ষণে আবার দুটি প্রকার দেখা যায়। যথা: অবধি ও মনঃপর্যায়। ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ সংবেদনশীল বস্তুসমূহের প্রত্যক্ষণ হলো অবধি জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মন বা আত্মা যখন কর্মের বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করে তখন এই জ্ঞান লাভ হয়। এই প্রত্যক্ষণে স্বজ্ঞাজাত বিষয়সমূহ জড়িত। আর মনঃপর্যায় হলো যখন মনকে বিষয় করে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করা হয়। এখানে আত্মা অপরোক্ষভাবে অন্য মনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে জেনে থাকে। অন্যদিকে সকল পারমার্থিক প্রত্যক্ষণ হলো সকল প্রকার দ্রব্যের প্রত্যক্ষণ। কেবলজ্ঞান এই প্রত্যক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। এই জ্ঞান অর্জন শুধুমাত্র আত্মার পক্ষেই সম্ভব হয়ে থাকে। দেশ ও কালের অন্তর্গত যে সকল বিষয়সমূহ সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট থাকে তাদেরকে ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে জানা যায় না। অবধি জ্ঞানের মাধ্যমে এ সকল বিষয়কে জানা যায়।[১০৩] তাছাড়া জৈন দার্শনিকরা নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের বিষয়টি মানতে নারাজ। তাঁরা নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের যথার্থতা এবং অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। জৈনরা মনে করেন নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণে বিষয়ের স্বরূপ কিংবা বস্তুসমূহের অস্তিত্ব, জাত, গুণ, ধর্ম কিছুই জানা যায় না। তাই জৈনরা এখানে কোনো জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয় বলে মনে করেন।[১০৪]

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, জৈনরা তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য সম্প্রদায়ের আলোচনা থেকে ভিন্ন ধরনের। জৈনরা প্রত্যক্ষণের যে বহুবিধ শাখা-উপশাখা বিন্যস্ত করে যে বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন তা নিঃসন্দেহে জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার

অনেক বিষয় আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসকে করেছে সম্প্রসারিত এবং সমৃদ্ধ। এই প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁরা ছিলেন পরমতসহিষ্ণু। জৈনদের লক্ষ্য ছিল মানবকল্যাণ। তাঁরা তাঁদের দার্শনিক আলোচনায় মানুষকে বড়ো করে দেখেছেন, মানুষকে স্থান দিয়েছেন সবার উপরে। আর মানবকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসেবে তাঁরা জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করেছেন। তাই বলা যায়, তাঁদের জ্ঞানতত্ত্ব মানবকল্যাণে নিবেদিত।

বৌদ্ধ দর্শনে প্রত্যক্ষণ

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে বেদবিরোধী তিনটি নাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম হলো বৌদ্ধ দর্শন। এই বৌদ্ধ দর্শনে বেদকেন্দ্রিক উপনিষদীয় চিন্তাধারার প্রবল বিরোধিতা লক্ষ করা যায়। মহামানব গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা, বাণী এবং উপদেশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই দর্শনের সৌধ।[১০৫] জগৎও জীবনকে কেন্দ্র করে বুদ্ধনির্দেশিত পথ ও মতকে বৌদ্ধ দর্শন হিসেবে অভিহিত করা হয়। মহামতি গৌতম বুদ্ধ ছিলেন এই বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন জৈন দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরের সমসাময়িক। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক হলো গৌতম বুদ্ধের আর্বিভাবকাল।[১০৬] গৌতম বুদ্ধের দর্শনচিন্তা এবং ধর্মচিন্তা ছিল মূলত মানবকেন্দ্রিক। তাঁর চিন্তার দ্যুতি শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মূলত মানুষ এবং মানুষের কল্যাণ নিয়ে ভেবেছেন যার গুরুত্ব বর্তমান বিশ্বেও অনস্বীকার্য। এই বৌদ্ধ দর্শনে ভারতীয় চিন্তাধারার বহুমুখী সংমিশ্রণ দেখা যায়। গৌতম বুদ্ধের চিন্তায় আমরা স্বাধীন যৌক্তিক মতামতের প্রতিফলন দেখতে পাই। গৌতম বুদ্ধের আজীবন সাধনা ছিল মানুষকে দুঃখ-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্ত করে কল্যাণের পথ নির্দেশ করা। তাঁর চিন্তায় আমরা জ্ঞান এবং কর্মের সমন্বয় দেখতে পাই। বুদ্ধ মনে করতেন, মানবজীবনের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে হলে প্রয়োজন জ্ঞানভিত্তিক পথনির্দেশনা। কেননা যথার্থ জ্ঞানই মানুষকে দিতে পারে কল্যাণকর সঠিক পথের নির্দেশনা। গৌতম বুদ্ধের চিন্তায় জ্ঞানের গুরুত্ব প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যায় যে, "উপনিষদের দার্শনিকগণ যত গুরুত্ব জ্ঞানের ওপরে দিয়েছিলেন, বুদ্ধ সেখানে তাঁদের থেকেও জ্ঞানের ওপরে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বুদ্ধ মনে করতেন অবিদ্যাই সমস্ত অসৎ–এর মূল। সেজন্যই তিনি অসৎকে বিলুপ্ত করার জন্য আর্যসত্য বা নির্দোষ জ্ঞানকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করতেন।"[১০৭] যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য দরকার জ্ঞানের সঠিক উৎস, পদ্ধতি বা প্রমাণ। বৌদ্ধ দর্শন তাই জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রমাণতত্ত্বকে বেশ গুরুত্ব প্রদান করেছে। যথা: প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান।[১০৮] বৌদ্ধমতে শুধুমাত্র এই দুই ধরনের উৎসই আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান প্রদান করে থাকে। এখন প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

বৌদ্ধ দর্শন অনান্য দর্শন সম্প্রদায়ের মতো জ্ঞানতত্ত্বিক আলোচনায় জ্ঞানের উৎসের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণের ওপর বেশ গুরুত্বারোপ করেছে। বৌদ্ধ মত বিষয়সাপেক্ষ জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষণ হিসেবে অভিহিত করেছে। এখানে প্রত্যক্ষণ বলতে ঘটপ্রত্যক্ষণ, পটপ্রত্যক্ষণ প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনের প্রত্যক্ষণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক দেবব্রত সেন– এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, " বৌদ্ধ মতে নাম, জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার সংগে সম্বন্ধ নয় যে 'স্বলক্ষণ' তারই অভ্রান্তজ্ঞাপক জ্ঞানকে, যথার্থ অর্থে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যায়।"[১০৯] বৌদ্ধ মতে নির্বিকল্প এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে ভিন্নমত লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে বৈভাষিক সম্প্রদায় নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণকে বিশুদ্ধ সংবেদন হিসেবে গ্রহণ করেছে। এখানে ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সংযোগ হওয়ার সাথে সাথেই জ্ঞান হয়ে থাকে। আর এই ধরনের জ্ঞান বস্তুর স্বরূপকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে। মোটকথা প্রত্যক্ষণের সাহায্যে আমরা বাইরের বস্তুসমূহকে সরাসরিভাবে জানতে পারি। বৈভাষিকরা এই বাইরের বস্তুকে স্বলক্ষণের ধারা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উল্লেখ্য যে স্ব-লক্ষণ হলো নিজের লক্ষণ। প্রত্যক্ষণের সাহায্যে এই স্বলক্ষণের উপর নাম, জাতি, গুণ, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি কল্পনাসমূহ আরোপিত হয়ে থাকে। এই স্বলক্ষণ বস্তু সম্পর্কে অধ্যাপক দেবব্রত সেন বৌদ্ধ মতের উল্লেখ করে বলেন, "একমাত্র স্বলক্ষণ-বস্তুই অর্থক্রিয়াকারী বলে সৎ। জ্ঞান নিজের আকার সমর্পণ করাই, বিষয়ের অর্থক্রিয়াকারীতা। অর্থক্রিয়াকারীরূপে সৎ স্বলক্ষণ, তার প্রকাশক জ্ঞানে নিজের আকার সমর্পণ করতে পারে।"[১১০] প্রখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তি সবিকল্প প্রত্যক্ষণকে গুরুত্বহীন হিসেবে আখ্যায়িত করে এর অসারতা তুলে ধরেছেন। ধর্মকীর্তি মনে করেন সবিকল্প প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে আমরা বস্তু থেকে যথার্থ জ্ঞান পাই না। কেননা এখানে অবৈধ প্রত্যক্ষণ ঘটে, এতে কল্পনাসমূহ যুক্ত থাকে।[১১১] তাই বৌদ্ধ দর্শনে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ ব্যতীত সকল ধরনের জ্ঞানকে 'কল্পনা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। খ্যাতিমান বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তি এই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণকে বৈধ জ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেছেন। কেননা নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে বস্তুর স্বতন্ত্রতা এবং স্বলক্ষণ উপস্থিতিকে জানা ও বোঝা যায়। সংক্ষেপে বলা যায়, বৌদ্ধ মত শুধুমাত্র নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণকে স্বীকার এবং বিশ্বাস করে।[১১২]

প্রত্যক্ষণের শ্রেণিবিভাগ

বৌদ্ধ দর্শনে এই প্রত্যক্ষণের শ্রেণিবিভাগ লক্ষ করা যায়। উপায়গত দিক থেকে এই দর্শন চার প্রকার প্রত্যক্ষণের কথা বলেছে। যথা: ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ, মনোবিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ, আত্মসংবেদন প্রত্যক্ষণ এবং যোগীজ্ঞান প্রত্যক্ষণ। এখন এই চার প্রকার প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ

যে প্রত্যক্ষণে আমাদের ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে প্রভৃতি বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে তাকে ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ বলে। আমাদের ইন্দ্রিয় পাঁচটি। তাই ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ পাঁচ ধরনের। আমাদের চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং ত্বকের ওপর ভিত্তি করে চাক্ষুস, শ্রবণ, ঘ্রাণজ, রাসন ও ত্বাচ নামক ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।[১১৩] এই ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণে আমরা বস্তুসমূহের সরাসরি জ্ঞান পেয়ে থাকি।

মনোবিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ

মানসিক প্রত্যক্ষণও ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের পরবর্তী পর্যায়ে মানসিক প্রত্যক্ষণ অনুভূত হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক দেবব্রত সেনের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "একটি ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ উৎপন্ন হবার অব্যবহিত পরক্ষণেই এই জ্ঞানের বিষয় যে স্বলক্ষণ, তাকে বিষয় করে অন্য একটি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পরক্ষণের এই জ্ঞানটিকে, বৌদ্ধ পরিভাষায়, সমনন্তর প্রত্যয় বলে। এই সমনন্তর প্রত্যয়টিই মনোবিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ।"[১১৪] বৌদ্ধ দার্শনিকরা ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণের বিষয় স্বলক্ষণটি থেকে মনোবিজ্ঞান প্রত্যক্ষণের স্বলক্ষণের মধ্যে প্রভেদ আছে বলে মনে করেন। তারপরও এই দুটি স্বলক্ষণে একই ধারার অন্তর্গত। একটি স্বলক্ষণকে বিষয় করে প্রথমটি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ উৎপন্ন হতে পারে। তবে দুটি বিষয়ের ক্ষণ পৃথক হওয়ায় একটি অন্যটি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। এই দুটি প্রত্যক্ষণে বিষয় অজ্ঞাত হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ দর্শনে যে মনোবিজ্ঞান প্রত্যক্ষণের কথা বলা হয়েছে তা ন্যায় এবং মীমাংসা দর্শনের মানস বা মনোবিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ থেকে ভিন্ন ধরনের।

আত্মসংবেদন প্রত্যক্ষণ

এই প্রত্যক্ষণ হলো চিত্ত ও অনুভূতির জ্ঞানমূলক প্রত্যক্ষণ। বৌদ্ধ দার্শনিক মতে গ্রাহক যখন কোনো বিষয়ের বিশুদ্ধ স্বরূপ উপলব্ধি করে তখন তাকে 'চিত্ত' বা 'বিজ্ঞান' বলে। চিত্তের সঙ্গে বিভিন্ন মানসিক অবস্থার সংযোগকে চৈত্ত বলে। এই চিত্তের সাথে চৈত্তের স্বসংবেদনকে আত্মসংবেদন প্রত্যক্ষণ বলে। সব ধরনের চিত্ত বা অনুভূতির ক্ষেত্রে আত্মসচেতনতা লক্ষ করা যায়। তাই এগুলোর নিজস্ব উপলব্ধিবোধ হয়। তবে আত্মা দ্বারা এই উপলব্ধি সম্ভব নয়। কেননা আত্মাকে অস্তিত্বশীল হিসেবে প্রমাণ করা যায় না। সেজন্য এই চিত্ত দ্বারা কোনো কিছুকে প্রত্যক্ষণ করাকে আত্মসংবেদন প্রত্যক্ষণ বলে।[১১৫] চিত্তের সাহায্যে যখন আমরা বিষয়কে জানতে পারি তখন এই বিষয়জ্ঞানের সাথে সাথে আমাদের সুখ কিংবা দুঃখবোধ হয়।

যোগীজ্ঞান প্রত্যক্ষণ

যোগীরা তাঁদের স্বজ্ঞাজ্ঞান বলে এই প্রত্যক্ষণ লাভ করে থাকে। বৌদ্ধ দর্শনে যে চারটি আর্যসত্যর কথা বলা হয়েছে তা দীর্ঘ সাধনার ফলে স্পষ্টভাবে প্রকাশ হতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে উচ্চস্তরে পৌঁছায়। পর্যায়ক্রমিকভাবে এই চূড়ান্তরূপ লাভ করে থাকে যাকে যোগীজ্ঞান প্রত্যক্ষণ বলা হয়েছে।[১১৬] এই যোগীজ্ঞান কোনো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান নয়, যোগী তাঁর সাধনাবলে স্বাজ্ঞিক উপায়ে সাক্ষাৎ এবং সুস্পষ্টভাবে এই জ্ঞান লাভ করে থাকে।[১১৭]

উপসংহার

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনায় প্রত্যক্ষণ অত্যন্ত উচু স্থান দখল করে আছে। কেননা, "Of all the methods of knowledge, perception is by far the most important, for the obvious reason that it is the most fundamental."[১১৮] প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে যে জ্ঞান হয় তা সরাসরি বা সাক্ষাৎ জ্ঞান। ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় সর্বপ্রথম এই প্রত্যক্ষণের কথা বলেছেন। প্রত্যক্ষণকে গ্রহণ করে তাঁরা এর পক্ষে ব্যাপক যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয় এই প্রত্যক্ষণের প্রায়োগিক দিকের ওপরও তাঁরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। চার্বাক ব্যতীত বাকি আটটি দর্শন সম্প্রদায় একাধিক প্রমাণ স্বীকার করলেও প্রত্যক্ষণকে তাঁরা সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। প্রত্যক্ষণজনিত জ্ঞান অর্জনের মনোদার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক যে ব্যাখ্যা আমরা ভারতীয় জ্ঞানের অন্যতম উৎস প্রত্যক্ষণে দেখতে পাই তা সত্যিই এক ব্যতিক্রমী বিশ্লেষণ। পাশ্চাত্য দর্শনেও প্রত্যক্ষণের উৎস, স্বরূপ, পদ্ধতি, প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিশ্লেষণ থাকলেও এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা লক্ষ করা যায় না। তাই ভারতীয় দর্শনের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনা সময়ের বিচারে যুগোপযোগী আলোচনা। শুধু তাই নয় আধুনিককালেও এই প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনার প্রায়োগিকতা এবং কার্যকারিতা মানবজীবনকে কল্যাণের দিকে ধাবিত করে। তাই মানবজাতির চিন্তার উৎকর্ষতা সাধনে এই প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনা দর্শনের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

তথ্যনির্দেশ

১. প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, কেয়া মণ্ডল, *ন্যায়সম্মত প্রমাণতত্ত্বের রূপরেখা*, (কলকাতা : প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১৭) পৃ. ৬৪

২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪

৩. Robert Audi, *Epistemology : A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge*, Second Edition, (New York and London : Routledge, 2003), pp. 16-17

৪. মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শনে তত্ত্ববিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্ব*, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৯), পৃ. ৫০

৫. প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, কেয়া মণ্ডল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

৬. অন্নম্ভট্ট, *তর্কসংগ্রহ দীপিকাসহ*, অনুবাদ, শ্রীকানাইলাল পোদ্দার, (কলকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৮৮), পৃ. ১০৪

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪

৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫

৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫

১০. John L. Pollock & Joseph Cruz, *Contemporary Theories of Knowledge*, Second Edition, (UK : Rowman & Littlefield Publishers, 1999), p. 38

১১. S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol. 2, Fifteen Impression, (New Delhi : Oxford University Press, 2006), p.249, (মূল : Richard Garbe, *Philosophy of Ancient India*, p. 30)

১২. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, পু.মু., (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ. ১৩৭

১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮

১৪. M. Hiriyanna, *Outlines of Indian Philosophy*, (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2000) p. 292

১৫. কালী প্রসন্ন দাস, *ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা : চার্বাক ও হিউম*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ৫৫

১৬. S.Radhakrisnan, *Indian Philosophy*, Vol. 1, (London : Cambridge University Press, 1922), p. 338

১৭. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫

১৮. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

১৯. সাইয়েদ আবদুল হাই, *ভারতীয় দর্শন*, (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭), পৃ. ৮৬

২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

২১. শরীফ হারুন, *ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে দর্শন*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ৫৪

২২. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

২৩. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১

২৪. Chandrodaya Bhattavcharya, *The Elements of Indian Logic and Epistemology*, (Calcutta : Modern Book Agency Private Ltd., 1975), p. 82

২৫. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

২৬. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬

২৭. Debiprasad Chttopadhyaya, *Indian Philosophy*, (Delhi : Peoples Publishing House, 2007), p. 117

২৮. সরদার ফজলুল করিম, *দর্শন কোষ*, (ঢাকা : প্যাপিরাস, ২০০৬) পৃ. ১২৮

২৯. S.C. Chatterjee and D.M. Datta, *An Introduction to Indian Philosophy*, (Calcutta : Calcutta University, 1984), p. 164
৩০. S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol. 2, (New Delhi : Oxford University Press, 1989), p. 29
৩১. অন্নম্ভট্ট, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২
৩২. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, *ন্যায় দর্শন*, ১ম খন্ড, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮), পৃ. ১০১
৩৩. Stephen Phillips, *Epistemology in Classical India : The Knowledge Sources of the Nyaya School*, (New York & London : Routledge, 2012), p. 88
৩৪. নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের কিছু জ্ঞানতাত্ত্বিক ও অধিবিদ্যাগত সমস্যা*, (কলকাতা : সদেশ, ২০১২), পৃ, ১৩
৩৫. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩
৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১
৩৭. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮
৩৮. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২
৩৯. অন্নম্ভট্ট, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮
৪০. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১
৪১. S.N. Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, Vol. 1, (London : Cambridge University Press, 1922), pp. 339-340
৪২. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০
৪৩. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২
৪৪. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০
৪৫. অন্নম্ভট্ট, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮
৪৬. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০
৪৭. অন্নম্ভট্ট, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০
৪৮. কালী প্রসন্ন ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
৪৯. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪
৫০. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১
৫১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০
৫২. Stephen Phillips, *op.cit.*, p. 96
৫৩. শরীফ হারুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮
৫৪. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫
৫৫. সুখময় ভট্টাচার্য্য, *পূর্বমীমাংসা দর্শন*, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৬), পৃ. ২
৫৬. S. Radhakrishnan (ed.), *History of Philosophy : Eastern and Western*, Vol. One, (London : George Allen and Unwin Ltd., 1952), p. 259
৫৭. রনজিৎ সরখেল, *ভারতীয় দর্শনে অনীশ্বরবাদ*, (কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,২০১৩), পৃ. ২৩৫
৫৮. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৯
৫৯. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯
৬০. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪
৬১. S. N. Dasgupta, *op.cit.*, p. 378
৬২. *Ibid*, p. 378
৬৩. J. N. Sinha, *History of Indian Philosophy*, Vol. 1, (Calcutta : Sinha Publishing House, 1956), p. 773
৬৪. *Ibid*, p 774

৬৫. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪

৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫

৬৭. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

৬৮. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫

৬৯. সুখময় ভট্টাচার্য্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫

৭০. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২

৭১. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

৭২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

৭৩. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩), পৃ. ৫০২

৭৪. D.M. Datta, *The Six ways of Knowing : A Critical Study of the Advaita Theory of Knowledge*, (Calcutta : Calcutta University Press, 1960), p. 94

৭৫. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

৭৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

৭৭. S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol. 2, *op.cit.*, p. 658

৭৮. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ. ৪২৭

৭৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৭

৮০. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯

৮১. কনিষ্ক চৌধুরী, *ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদী ধারা*, (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৭), পৃ. ১৫

৮২. S. Radhakrishnan, (ed.), *History of Philosophy : Eastern and Westeun*, Vol. One, (London : George Allen and Unwin Ltd., 1952), p. 134

৮৩. সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, অনূদিত, *সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা : সাহিত্যশ্রী, ২০১৯), পৃ. ২৪

৮৪. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

৮৫. দেবব্রত সেন, *ভারতীয় দর্শন*, (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯২), পৃ. ৩

৮৬. Chandradhar Sharma, *Indian Philosophy : A Critical Survey*, (U.S.A : Barnes & Noble, Inc., 1962), p.30

৮৭. Kishor Kumar Chakrabarti, *Classical Indian Philosophy*, (UK : Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2010), p. 2

৮৮. S. Radhakrishnan (ed.), *op.cit.*, p. 134

৮৯. M. Hiriyanna, *Indian Philosophy*, (London : George Allen and Unwin Ltd., 1958), p. 189

৯০. লতিকা চট্টোপাধ্যায়, *চার্বাক দর্শন*, (কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৮), পৃ. ৩৬-৩৭

৯১. Ray Billington, *Understanding Eastern Philosophy*, (London and New York : Routledge, 2003), p. 88

৯২. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

৯৩. দেবব্রত সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪

৯৪. লতিকা চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

৯৫. Ray Billington, *op.cit.*, p. 44

৯৬. S.C. Chatterjee and D.M. Datta, *op.cit.*, p. 74 and S. N. Dasgupta, *op.cit.*, p. 170

৯৭. Chandradhar Sharma, *op.cit.*,, p. ৩৬

৯৮. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

৯৯. J.N. Sinha, *op.cit.*, Vol. 1, p. 186

১০০. দেবব্রত সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮-২৯

১০১. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

১০২. দেবব্রত সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

১০৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

১০৪. J.N. Sinha, *op.cit.*, Vol. 1, p. 187

১০৫. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

১০৬. S.C. Chatterjee and D.M. Datta, *op.cit.*, p. 115

১০৭. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, *বৌদ্ধ দর্শন*, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশনালয়, ২০০৭), পৃ. ১০৪

১০৮. J.N. Sinha, *op.cit.*, Vol. 1, p. 414

১০৯. দেবব্রত সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২

১১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২

১১১. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

১১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

১১৩. দেবব্রত সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩

১১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪

১১৫. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

১১৬. দেবব্রত সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬

১১৭. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

১১৮. D.M. Datta, *The Six Ways of Knowing : A Critical Study of the Advaita Theory of Knowledge*, First MLBD Edition, (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2017), p. 27

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে অনুমান

চতুর্থ অধ্যায়
ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব অনুমান

ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসে অনুমান একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের দর্শন ও যুক্তিবিদ্যায় জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে এই অনুমানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অনুমান যুক্তিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়।[১] তবে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে জ্ঞানের উৎসের ক্ষেত্রে অনুমান বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে ছয়টি উৎস পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে অনুমান অন্যতম। বৈদিক এবং অবৈদিক প্রায় সকল সম্প্রদায়ই অনুমানকে জ্ঞানের অন্যতম দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে মর্যাদা প্রদান করেছে। অবশ্য চার্বাকদর্শন এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তাঁরা প্রত্যক্ষণ ছাড়া জ্ঞানের অন্যকোনো উৎসকে স্বীকার করেননি। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয় আছে যা প্রত্যক্ষণ, প্রাধিকার, স্বজ্ঞা কিংবা শ্রুতির মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অনুমান থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়া দর্শনের অন্যতম শাখা যুক্তিবিদ্যার কেন্দ্রিয় বিষয়বস্তু হচ্ছে এই অনুমান।[২] আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাপন প্রণালিতে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে এই অনুমানের ব্যবহার বহুবিধ। তাই মানবজীবনে এই অনুমানের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ফলে অনুমানলব্ধ জ্ঞানকে অস্বীকার করলে আমাদের জ্ঞান হয়ে উঠবে একপেশে, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই অনুমান প্রসঙ্গে চন্দ্রধর শর্মা বলেন, "Inference is the work of intellect. Although ultimately it has no reference to Reality, yet in the phenomenal world its aulthority is unquestionable."[৩]

পৃথিবীতে মানবজীবনকে উন্নত করার মানসে মানুষকে বহুবিধ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। আর এই জ্ঞান আহরণ বা অর্জন কখনো সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে হয় আবার কখনো পরোক্ষভাবে হয়। সরাসরি বা প্রত্যক্ষণগত উপায়ে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্র অনকেটা সীমিত, তাই আমাদেরকে পরোক্ষ পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জনে প্রয়াসী হতে হয়। আর এই পরোক্ষ পদ্ধতির মধ্যে অনুমান হলো একটি পদ্ধতি। অনুমান ছাড়াও পরোক্ষ জ্ঞানের উৎসের ক্ষেত্রে স্বজ্ঞা, শ্রুতি, প্রাধিকার প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

অনুমান

একমাত্র চার্বাক দর্শন ব্যতীত ভারতীয় দর্শনের বাকি আটটি সম্প্রদায় এই অনুমানকে জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্রত্যক্ষণের পাশাপাশি তাঁরা অনুমানকেও স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করেছেন। অনুমানকে মূলত একটি মানসিক প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ মানসিক প্রক্রিয়ার পরিণতি হলো অনুমান।

সাধারণভাবে কোনো জ্ঞাত বিষয় বা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে যখন কোনো অজ্ঞাত বিষয় বা তথ্যে আমরা পৌঁছাই তখন তাকে অনুমান বলে। এই অনুমান আমাদেরকে নতুন জ্ঞান প্রদান করে।[৪] অভিজ্ঞতাভিত্তিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে ভবিষ্যতের কোনো জ্ঞান অর্জনে যখন আমরা ব্যর্থ হই তখন আমরা অনুমানের সাহায্যে ভবিষ্যতের বিষয়টি গ্রহণ করে থাকি।[৫] S. Radhakrishnan অনুমানের স্বরূপ প্রসঙ্গে তাঁর *Indian Philosophy* গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> "Anumana is usually translated by the word "inference" which, however, is to be taken in a comprehensive sense, as including both deduction and induction. Anumana is sometimes defined as knowledge which is preceded by perception."[৬]

এই অনুমানলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা জানা বা জ্ঞাত কোনো বিষয় থেকে অজানায় গমন করে থাকি। অনুমানে আমরা পূর্বে প্রত্যক্ষ করা কোনো বিষয় বা বস্তুর সাদৃশ্য এবং সম্বন্ধ বিচার করে নতুন কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান পেয়ে থাকি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– দূরে কোথাও ধোঁয়া উড়তে দেখে যদি ধারণা করা হয় যে, সেখানে আগুন লেগেছে, তাহলে এই আগুনের ধারণা গঠনের বিষয়টি হচ্ছে অনুমান। অনুমান বলতে মূলত জ্ঞানের পশ্চাদ্‌গত জ্ঞানকে বোঝায়। বিষয়টি সহজ করে বললে দাঁড়ায় যে জ্ঞান অন্য জ্ঞানকে অনুসরণ করে থাকে তাই অনুমান। অনুমানের স্বরূপ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. এম. মতিউর রহমান গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, "জ্ঞাত সত্যের সাথে যদি অজ্ঞাত সত্যের কোনো অনিবার্য সম্পর্ক না থাকে, তাহলে যেকোনো জ্ঞাত সত্য থেকে যে-কোনো অজ্ঞাত সত্যে পৌঁছা যেতো। কিন্তু অনুমানে তার কোনো অবকাশ নেই।"[৭] অনুমানের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান কখনো সত্য আবার কখনো মিথ্যা হতে পারে। অনুমান কোনো সরাসরি জ্ঞান নয়, একটি পরোক্ষ জ্ঞান। এই অনুমান প্রসঙ্গে অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম বলেন, "যুক্তির ক্ষেত্রে এক কিংবা একাধিক যৌক্তিক বাক্যের মাধ্যমে তাদের আভ্যন্তরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিকে অনুমান বলা হয়।"[৮] ভারতীয় দর্শনের নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় তার *অনুমান চিন্তামনি* গ্রন্থে

প্রাথমিক পর্যায়ে অনুমিতির লক্ষণ নির্ণয় করে তার করণকে অনুমান হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি মূলত ব্যাপারবিশিষ্ট কারণকেই করণ বলেছেন। উল্লেখ্য যে, করণ প্রযোজ্য এবং কার্যের জনক কারণকেই ব্যাপার বলা হয়। গঙ্গেশের অনুরূপ বক্তব্য আমরা বিশ্বনাথসহ অন্যান্য নৈয়ায়িকদের চিন্তায় দেখতে পাই যা *ভাষাপরিচ্ছেদ*-এ উল্লেখ রয়েছে, "ব্যাপারস্তু পরামর্শঃ করণং ব্যাপ্তি ধীভবেৎ। অনুমায়াং.....।"[৯] নব্যনৈয়ায়িক অন্নম্ভট্ট *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থে পরার্মশকে অনুমান হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, "পরামর্শজন্যং জ্ঞানমনুমিতি। অনুমিতিকরণমনুমানম্।" অর্থাৎ যে জ্ঞান পরামর্শ থেকে পাওয়া যায় তাকে অনুমিতি বলে আর অনুমিতির করণকে অনুমান বলে।[১০] এই অনুমানের স্বরূপ প্রসঙ্গে চন্দ্রধর শর্মা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন,

> The second kind of knowledge is anuma or inferential or relational and its means is called anumana or inference. It is defined as that cognition which presuppose some other cognition. It is mediate and indirect and arises through a 'mark', the 'middle term' (linga or hetu) which is invariably connected with the 'major term' (Sadhya). It is *knowledge* (mana) which arises after (anu) other knowledge.[১১]

নব্যনৈয়ায়িকরা মনে করেন অনুমান প্রক্রিয়ার মূল বিষয়বস্তু হলো জ্ঞান। তবে এই জ্ঞান বলতে তাঁরা ইংরেজি ভাষায় Knowledge-কে না বুঝিয়ে সংস্কৃত ভাষায় Cognition-কে বুঝিয়েছেন। নব্যনৈয়ায়িকদের কাছে জ্ঞান এক ধরনের মানসিক ঘটনা। নব্যনৈয়ায়িকগণ অনুমান নামক জ্ঞানের মাধ্যমটিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁরা মনে করেন অনুমান নামক মাধ্যমটির দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাকে অনুমিতি বলে। নব্যনৈয়ায়িকরা অনুমান জ্ঞান অর্জনের জন্য দুটি প্রাসঙ্গিক কারণকে গুরুত্ব দিয়েছেন, আর তা হলো: করণ ও ব্যাপার। নিমিত্ত কারণসমূহের মধ্যে এমন কারণ অন্তর্ভুক্ত থাকে যা উপস্থিত না হলে সমবায়ী, অসমবায়ী এবং অন্যান্য নিমিত্ত কারণের উপস্থিতি লক্ষ করা গেলেও কার্য সংঘটিত হয় না। এই ধরনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নিমিত্ত কারণকে *করণ* বলে। আর কার্যের অব্যবহৃত কারণ হলো *ব্যাপার*। ধরা যাক, একটি বন্দুক দ্বারা গুলি করে কোন উড্ডয়মান পাখিকে ভূপাতিত করা হলো। এখানে বন্দুক একটি নিমিত্ত কারণ, আর পাখির পতন হলো কার্য। বন্দুকের ক্রিয়াশীলতা *করণ*। আর বন্দুক এবং পাখির মধ্যে সংঘঠিত শেষ সংযোগের পর পাখির যে পতন হয়েছে তা হলো *ব্যাপার*।

এই অনুমানলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিয়ত সম্বন্ধ এবং ব্যাপ্তি সম্বন্ধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এদুটি বিষয়কে অনুমানের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যুক্তিবিদ যোসেফ তাঁর *An Introduction to*

Logic গ্রন্থে অনুমান বলতে জ্ঞাত সত্য থেকে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হওয়ার মানসিক প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন।[১২] তবে এখানে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সত্যের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক থাকতে হবে। এই অনুমানকে আমরা যখন বিশ্লেষণ করি তখন এর মধ্যে আমরা দুই বা ততোধিক বাক্যের একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাবেশ লক্ষ করি। তাই অনুমানে সব সময় ন্যূনপক্ষে দুটি বাক্যের সমন্বয় থাকতে হবে। তবে তিন বা এর অধিক বাক্যের সমন্বয়ও থাকতে পারে।

অনুমানের অবয়ব, যে সকল বচনের সমন্বয়ের মাধ্যমে অনুমান গঠন করা হয় সেই সকল বচনগুলোকে অনুমানের অবয়ব বলে। যে কোনো অনুমান গঠন করতে হলে তিনটি পদ আবশ্যক। আবশ্যকীয় এই পদগুলো হলো: (১) সাধ্যপদ (প্রধান পদ), (২) পক্ষপদ (অপ্রধান পদ) এবং (৩) মধ্যপদ (হেতুপদ)। তাই এই অনুমান গঠনের ক্ষেত্রে তিনটি পদ এবং তিনটি বচন থাকা জরুরি। তবে এখানে বচন তিনটি হতে হবে নিরপেক্ষ। উল্লেখ্য যে, বচন তিনটি সদর্থক নঞর্থক কিংবা উভয় প্রকার হতে পারে।[১৩] পাশ্চাত্য দর্শনে আমরা এরিস্টটলের তর্কবিদ্যার সাথে অন্নংভট্টের অবয়বের সাদৃশ্য দেখতে পাই। অদ্বৈতবেদান্তে এবং মীমাংসা দর্শনের দার্শনিকগণ অনুমানের তিন প্রকার অবয়বকে স্বীকার করেছেন। এদের কেউ কেউ মনে করেন, প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ অনুমানের অবয়ব। আবার কেউ কেউ মনে করেন, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই তিনটি হলো অনুমানের অবয়ব। তবে এদের প্রত্যেকেই অনুমেয় বিষয় সম্বন্ধে অন্যের জ্ঞান উৎপাদনের জন্যে তিনটি বাক্য প্রয়োগ করার কথা বলেছেন। উল্লেখ্য যে, এরিস্টটল যুক্তিবিদ্যাকে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যায়, "কতগুলো মৌলিক সত্য থেকে কী করে অন্য কতকগুলো সত্যকে নিঃসৃত করা যায় এরিস্টটল তাঁর লজিকে বিশদভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। চিন্তার এই নিষ্কাশন পদ্ধতি সহানুমান (Syllogism)-এর রূপ নেয়।"[১৪] এরিস্টটলের যুক্তিবিদ্যায় এই সহানুমানের প্রভাব অনেক বেশি, এই সহানুমানে প্রধান ও অপ্রধান অর্থাৎ দুটি হেতুবাক্য এবং একটি সিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হয়। এখন পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের অনুমান সম্পর্কিত মতের বিচারমূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

সাংখ্য দর্শনে অনুমান

সাংখ্য দর্শন ভারতীয় দর্শনের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন দর্শন। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে স্মৃতি, শ্রুতি এবং পুরাণে এই সাংখ্য দর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাংখ্য দর্শন যে প্রাচীন দর্শন এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ নেই। মহাভারতেও সাংখ্য দর্শনের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্বে থেকেই সাংখ্য ও যোগ দর্শন প্রচলিত ছিল বলে ধারণা পাওয়া যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রেও

কপিলকে বুদ্ধের পূর্ববর্তী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মিহর্ষি কপিলকে এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রবর্তক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কপিলের নামানুসারে তাই এই দর্শনকে আবার 'কপিলদর্শনও' বলা হয়। কপিলরচিত *তত্ত্বসমাস* গ্রন্থে সাংখ্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত রূপ পরিলক্ষিত হয়। এই সাংখ্য দর্শনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখা যায়– (১) সম্যক জ্ঞান বা সঠিক জ্ঞান এবং (২) সংখ্যার ধারণাতত্ত্ব। সাংখ্য দর্শনে তত্ত্ববিদ্যা, কার্যকারণবাদ, জ্ঞানতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা দেখা যায়। তবে সাংখ্যদর্শন জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সাংখ্য জ্ঞানতত্ত্বে আমরা তিনটি প্রমাণের উল্লেখ দেখতে পাই। যথা : প্রত্যক্ষণ, অনুমান এবং শব্দ। এখন আমরা সাংখ্য দর্শনের অনুমান সম্পর্কে আলোচনা করবো:

ভারতীয় দর্শনে চার্বাক সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সকল সম্প্রদায় জ্ঞানের উৎসের ক্ষেত্রে অনুমানকে গুরুত্ব প্রদান করেছে। অনুমান বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষ জ্ঞান। এই অনুমানের কোনো একটা বিষয় বা বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার ফলে আমরা যে জ্ঞান পাই সে জ্ঞানের ভিত্তিতে কোনো অজ্ঞাত বিষয় বা বস্তুর সম্পর্কে যে জ্ঞান পাওয়া যায় সেই জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়াকে অনুমান বলে। তবে এক্ষেত্রে পূর্বে প্রত্যক্ষিত বিষয়ের সঙ্গে নিয়ত বা ব্যপ্তি সম্বন্ধ আবশ্যক। কেননা অনুমানের ভিত্তি হলো নিয়ত বা ব্যাপ্তি সম্পর্ক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একটি পর্বতে ধোয়া উড়তে দেখে যদি আমরা ধারণা পোষণ করি যে, ঐ পর্বতে আগুন লেগেছে, এখানে এই জ্ঞান অনুমানলব্ধ জ্ঞান হিসেবে অভিহিত। ধোয়া এবং আগুনের মধ্যে নিয়ত সম্পর্ক বা ব্যাপ্তি সম্পর্ক রয়েছে সেজন্য ধোয়া প্রত্যক্ষ করে আগুনের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা করা হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, দুটি বস্তুর মধ্যে নিয়ত বা ব্যাপ্তি সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করে অন্য বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়। অনুমানের ফলকে বলা হয় অনুমিতি। লিঙ্গ বা হেতুর সাহায্যে এই অনুমিতি জ্ঞান লাভ হয়। আর যার সাহায্যে কোনো অপ্রত্যক্ষগত বিষয় বা বস্তু আমাদের জ্ঞাত হয় তাকে লিঙ্গ বলে। অর্থাৎ ব্যাপ্তির সাহায্য নিয়েই লিঙ্গ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অসন্নিকৃষ্ট বিষয়কে সম্পৃক্ত করে তোলার ফলে তা আমাদের জ্ঞাত হয়। এই অনুমান প্রক্রিয়ায় আমরা কোনো জানা বিষয়কে অবলম্বন করে অজানা বিষয়ে গমন করে থাকি। অনুমান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে ঐ বস্তুর সঙ্গে সমন্ধযুক্ত অন্য কোনো বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। এই অনুমান প্রমাণ দ্বারা যে সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হয় তাকে পরামর্শ বলে।[১৫] সাংখ্য দর্শনে অনুমানকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। বাচস্পতি মিশ্রের মতে অনুমান দুই প্রকার। যথা: (১) বীত ও (২) অবীত অনুমান। বাচস্পতি বীত অনুমানের আবার দুটি প্রকারের কথা বলেছেন। যথা: (ক) পূর্ববৎ এবং (খ) সামান্যতোদৃষ্ট। আর অবীত অনুমানের আরেক নাম হলো শেষবৎ বা পরিশেষ অনুমান। বিজ্ঞানভিক্ষুর

চিন্তায়ও আমরা এই তিন প্রকার অনুমানের উল্লেখ দেখতে পাই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সাংখ্যমত মূলত তিন প্রকার অনুমানকে স্বীকৃতি দিয়েছে।[১৬]

উল্লেখ্য যে, ন্যায় দর্শনেও এই তিন প্রকার অনুমানের উল্লেখ দেখা যায়। এখন এই তিন প্রকার অনুমান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

(১) **বীত অনুমান,** যে অনুমান সদর্থক সামান্য বাক্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সে অনুমানকে বীত অনুমান বলে।[১৭] অন্বয়ী ব্যাপ্তির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় এই অনুমান। অর্থাৎ এই অনুমানের ক্ষেত্রে হেতু ও সাধ্যপদের মধ্যে অন্বয় সম্বন্ধ থাকে। বিষয়টা অনেকটা এরকম হেতুপদ যেখানে সাধ্যপদ সেখানে। যেমন: ধোঁয়া যেখানে, আগুন সেখানে। পর্বত ধোঁয়াময়, সুতরাং সেখানে আগুন আছে। এই অনুমানটির ক্ষেত্রে গ্রহণীয় ভিত্তি হলো 'সকল ধোঁয়াময় বস্তুই অগ্নিময়'। এখানে যে ব্যাপ্তি দেখা যাচ্ছে তা সদর্থক। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বীত অনুমান দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা : (ক) পূর্ববৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। এখন এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

(ক) পূর্ববৎ অনুমান, পূর্ববৎ অনুমানে কারণকে প্রত্যক্ষ করে অপ্রত্যক্ষ কার্যকে অনুমান করা হয়। এই অনুমানে মূলত 'পূর্ব' শব্দ দ্বারা কারণকে নির্দেশ করা হয়েছে। মূলত পূর্বদৃষ্ট সাধ্যের অনুমানই হলো পূর্ববৎ অনুমান।[১৮] হেতুপদ ও সাধ্যপদের নিয়ত সহচর সম্বন্ধের ওপর এই অনুমান প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব দৃষ্টান্ত বা অভিজ্ঞতা থেকে এখানে অনুমান করা হয়। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, পূর্বে যেখানেই ধোঁয়া দেখা গেছে সেখানে আগুন ছিল, তাই পবর্তে ধোঁয়া দেখে সেখানে আগুনের অস্তিত্ব অনুমান করা হলো পূর্ববৎ অনুমান।

(খ) সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান, পূর্ববৎ অনুমানের মতো সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানে কোনো প্রকার কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসরণ করা হয় না। শুধুমাত্র পূর্ব অভিজ্ঞতা বা সাদৃশ্যের বিষয়টি লক্ষ করে যে অনুমান গৃহীত হয় তাই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান।[১৯] যুক্তিবিদ্যার সাদৃশ্য অনুমানের সাথে এই অনুমানের মিল রয়েছে। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় যে অস্তিত্বমান তা এই অুনমানের উদাহরণ। মোটকথা ইন্দ্রিয়গুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের সাহায্যে আমরা জ্ঞান লাভ করে থাকি। অন্যভাবেও এই অনুমানটির বিষয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন: আকাশে বিভিন্ন সময়ে চাঁদের অবস্থানগত পরিবর্তনশীলতা লক্ষ করে আমরা অনুমান করি যে চাঁদ গতিশীল। এটাও এক ধরনের সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান।

(২) **অবীত অনুমান,** নঞর্থক সামান্য বাক্যকে কেন্দ্র করে যে অনুমান গড়ে ওঠে তাই হলো অবীত অনুমান।

অর্থাৎ ব্যতিরেকী ব্যাপ্তির ওপরই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এই অনুমানে। এই অনুমানে হেতুপদ এবং সাধ্যপদের মধ্যে ব্যতিরেকী সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। ন্যায় দার্শনিকরা এই অবীত অনুমানকে 'শেষবৎ' বা 'পরিশেষ' অনুমান বলেছেন। আর সাংখ্য দার্শনিকরা তাঁদের এই মতকে মেনে নিয়েছেন। এই অনুমানের ক্ষেত্রে কোনো বস্তু সম্পর্কে আমরা যখন কোনো কিছু স্বীকার করি তখন সকল বিকল্প বাদ দিয়ে একটিমাত্র বিকল্পকে স্বীকার বা গ্রহণ করি। এই শেষবৎ অনুমানে আমরা মূলত কোনো কার্য প্রত্যক্ষ করে কারণ থেকে অনুমান করে থাকি।[২০]

পরিশেষে বলা যায়, সাংখ্য দার্শনিকরা তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় জ্ঞানের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস হিসেবে অনুমানের যে আলোচনা করেছেন তা অনেকটা ন্যায় দার্শনিকদের অনুমান-সংক্রান্ত আলোচনার অনুরূপ। তবে সাংখ্য দার্শনিকদের বিশ্লেষণ, প্রকরণ এবং অনুমানগত জ্ঞানের মূল্যায়ন জ্ঞানতত্ত্ব তথা ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসে এক মাইল ফলক হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। সেই প্রাচীনযুগে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুমানের ভূমিকাকে তুলে ধরার মানসে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তা অতি সাধারণ কোনো ব্যাপার নয়। কেননা উচ্চস্তরের জ্ঞানতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত মূলত গৃহীত হয় অনুমানগত বিষয়ের মাধ্যমে। তাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই অনুমানের গুরুত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারিনা। সাংখ্য দার্শনিকরা মূলত জীবনের সাথে অনুমানের সম্পৃক্তাকে প্রধান্য দিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসু অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। আর এদিক থেকে বিচার করলে তাঁদের অনুমান সংক্রান্ত আলোচনার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

যোগ দর্শনে অনুমান

ভারতীয় দর্শনের আস্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যতম একটি প্রাচীন দর্শন সম্প্রদায় হলো যোগ দর্শন। এই যোগ দর্শনের স্থপতি হলেন মহর্ষি পতঞ্জলি। তিনি ১৯৪ টি সূত্রে যোগ দর্শন লিপিবদ্ধ করেন।[২১] এই সূত্রগুলোকে 'যোগসূত্র' বা 'পাতঞ্জলসূত্র' বলা হয়ে থাকে। যোগ দর্শনের 'যোগ' কথা দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানসিক দিকের নিয়ন্ত্রণকে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রাচীনকালের ঋগ্বেদ এবং অর্থববেদে এই যোগ শব্দের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[২২]

যোগ দর্শন যোগ সাধনার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে বিবেক জ্ঞান অর্জনের কথা বলে থাকে। মানবজীবনে আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ দর্শন নির্দেশিত প্রক্রিয়া বিশেষ সহায়ক।[২৩] যোগ দর্শনে সাংখ্য

দর্শনের ব্যবহারিক এবং পদ্ধতিগত দিকের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। এই যোগ দর্শনে জ্ঞানকে মোক্ষলাভের উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সাংখ্য দর্শনের সাথে যোগ দর্শনের পার্থক্য হলো সাংখ্য দর্শন যেখানে জ্ঞানযোগা সমর্থন করে যোগ দর্শন সেখানে জ্ঞানযোগের সাথে কর্মযোগকেও সমর্থন করে। যোগ দর্শন তিনটি বিষয়ে– জ্ঞান, ধ্যান এবং ক্রিয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। মোক্ষলাভের উপায় হিসেবে এই দর্শন জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছে। যোগ দর্শনে আমরা সাংখ্য দর্শনের মতো তিন প্রকার প্রমাণের দেখা পাই। যথা: প্রত্যক্ষণ, অনুমান এবং শব্দ। এখন এই অধ্যায়ের আলোচনা অনুযায়ী অনুমান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

অনুমান

যোগ দর্শনে মূলত অনুমান সম্পর্কিত যে ধরনের আলোচনা এবং বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হয় তা প্রকৃতপক্ষে সাংখ্য দর্শনের অনুমান সম্পর্কিত প্রমাণের অনুরূপ। উভয় দর্শনে একই ধরনের প্রকরণ এবং প্রকারভেদের কথা বলা হয়েছে। যোগ দর্শনের অনুমানের স্বরূপ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যায়, "যোগ দর্শন অনুসারে লিঙ্গ বা চিহ্ন এবং অনুমিত বস্তুর বা লিঙ্গর মধ্যে নিয়ত সম্পর্কের জ্ঞানই অনুমানের ভিত্তি।"[২৪]

বিষয়টির সহজতর স্পষ্টতার জন্য এই অনুমান প্রমাণের স্বরূপ প্রসঙ্গে আমরা আরও বলতে পারি, প্রত্যক্ষণের দ্বারা গৃহীত হয়নি কিন্তু বিষয়টি হেতুগম্য তাহলে সেটি অনুমান প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো স্থানে আগুন লেগেছে আর সেটি যদি অগৃহ্যমাণ হয় তবে ধোয়ার সঙ্গে যদি আগুনের ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকে তাহলে, সেই ধোয়া প্রত্যক্ষ করে আমরা আগুনের যথার্থ জ্ঞান পেতে পারি। অর্থাৎ হেতুর সাহায্যে অপ্রত্যক্ষণগত কোনো বস্তুর জ্ঞান হচ্ছে অনুমান। এখানে ধূম দেখে আগুনের অনুমান করা হচ্ছে। এখানে আমাদের আগুনের জ্ঞান হচ্ছে অনুমানের সাহায্যে। তাই আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, কোনো বিষয়কে আমরা যখন প্রত্যক্ষ করে ব্যাপ্তি জ্ঞানের ভিত্তিকে অপ্রত্যক্ষণযোগ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান আমরা লাভ করি তখন তাকে অনুমান বলে। যেমন- দূর পাহাড়ে ধোঁয়া প্রত্যক্ষ করে আমরা আগুনের অস্তিত্বের ধারণা লাভ করি। এই অনুমান সম্পর্কে *তর্কসংগ্রহ : দীপিকাসহ* তে উল্লেখ আছে– অনুমিতির যে সকল কারণ আছে সেগুলোকে অনুমান বলে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, অনুমিতি কী? এর উত্তরে উল্লিখিত গ্রন্থের গ্রন্থকার উত্তর প্রদান করেছেন এভাবে, "পরামর্শ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই অনুমিতি।"[২৫]

ন্যায় দর্শনে অনুমান

ভারতীয় দর্শনে আস্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত দর্শন হলো ন্যায় দর্শন। এই দর্শন বেদকে প্রামাণ্যশাস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই দর্শন বস্তুবাদী। নৈয়ায়িকরা বেদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিলেও স্বাধীন যৌক্তিক চিন্তা-চেতনাকে ধারণ করে বিচার-বিশ্লেষণকে প্রাধাণ্য দিয়েছেন তাঁদের দর্শনচিন্তায়।[২৬] যুক্তি এবং অনুমান সংক্রান্ত আলোচনা এই ন্যায় দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হিসেবে প্রাধাণ্য পেয়েছে। জ্ঞান নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাসী এই ন্যায় দর্শনকে তর্কশাস্ত্র এবং ন্যায়বিদ্যাও বলা হয়ে থাকে। এই ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি গৌতম। এই গৌতমের আরেক নাম হচ্ছে অক্ষপাদ। তাঁর এই নামানুযায়ী এই দর্শনকে 'অক্ষপাদদর্শন'ও বলা হয়। এই ন্যায় দর্শনকে যথার্থ জ্ঞান অর্জনের প্রণালি হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হলে কী কী উপায় বা পন্থা অবলম্বন করতে হবে তার নির্দেশনা প্রদান করাই ন্যায় দর্শনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।[২৭] ন্যায় দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা, জীবাত্মার স্বরূপ এবং ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা দেখা যায়। এসব আলোচনার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জ্ঞানতত্ত্ব। ন্যায় দর্শন মনে করে জ্ঞান হচ্ছে কোনো বিষয়ের প্রকাশ। জ্ঞানের সাহায্যে কোনো বিষয় আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। প্রদীপের আলো যেমন আমাদের সামনের বিষয় বা বস্তুকে আলোকিত করে চিনতে সাহায্য করে তেমনি জ্ঞানও তার অন্তঃস্থ সকল বিষয়কে আমাদের কাছে উপস্থাপন করে বিষয়ভিত্তিক অর্থ বুঝতে সহায়তা করে থাকে। এই দর্শন দু'ধরনের জ্ঞানের কথা বলেছে। যথা- প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান এবং অপ্রমা বা অযথার্থ জ্ঞান। আর জ্ঞান লাভের প্রণালিকে বলা হয় প্রমাণ। ন্যায় দর্শনে চার প্রকার প্রমাণের কথা বলা হয়েছে। যথা- প্রত্যক্ষণ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ।[২৮] এখন ন্যায় দর্শনের অনুমান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

অনুমান

ভারতীয় দর্শনে গৌতমের *ন্যায়সূত্র* গ্রন্থেই প্রথমে অনুমান প্রসঙ্গে আলোচনা লক্ষ করা যায়। ন্যায় দর্শন যথার্থ জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে যে চার ধরনের পদ্ধতি বা প্রমাণের কথা বলেছে তার মধ্যে 'অনুমান' হলো দ্বিতীয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, "Inference (*anumana*) is the second means of proof (*pramana*) and the most valuable contribution that Nyaya has made has been on this subject."[২৯] এই অনুমানের সাহায্যে প্রাপ্ত জ্ঞানকে 'অনুমিতি' বলে। এই অনুমান মূলত প্রত্যক্ষপূর্বক জ্ঞান। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে অনুমান শব্দের অর্থ দাড়ায় 'অনু = পশ্চাৎ, মান = জ্ঞান' অর্থাৎ 'পশ্চাদ্‌গত জ্ঞান'। অনুমান এবং অনুমিতির বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য এখানে উল্লেখ করা যায়, অনুমান প্রমাণের দ্বারা যদি কোনো হেতুর জ্ঞান হয় এবং

সেক্ষেত্রে পদার্থের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় তাহলে তার দ্বারা সেখানে সেই পদার্থের অনুমিতি হয়ে থাকে। তাই এক্ষেত্রে লিঙ্গ-পরামর্শকে 'তৎ' শব্দের দ্বারা নির্দেশ করাই যুক্তিসঙ্গত হবে। প্রত্যক্ষযোগ্য প্রমাণ থেকে লব্ধ ব্যাপ্তিজ্ঞানের জন্য যে লিঙ্গ-পরামর্শ পাওয়া যায় তা থেকেই পরক্ষণেই অনুমিতি জন্মে থাকে।

উল্লেখ্য যে পরার্মশ বা পরামর্শ জ্ঞান হলো অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান। আর এই পরামর্শ জ্ঞানকে ভাষ্যকাররা অনুমিতির ক্ষেত্রে আবশ্যিক এবং পর্যাপ্ত মনে করেছেন। মোটকথা অনুমিতির ক্ষেত্রে তিনটি মূল কারণ পরিলক্ষিত হয়। যথা: পক্ষধর্মতাজ্ঞান, ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পরামর্শজ্ঞান। নব্যমতেও পরামর্শ জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে।

নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশও অনুমিতির করণ হিসেবে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং এর ব্যাপার হিসেবে পরামর্শ জ্ঞানের কথা বলেছেন। বিশ্বনাথ গঙ্গেশের সাথে এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন। তবে ভিন্নমত পোষণ করে উদ্যোতকর, অন্নংভট্ট এবং কেশবমিশ্র শুধু পরামর্শকেই অনুমিতির করণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই অনুমান হলো মূলত পরোক্ষ জ্ঞান। অনুমানলব্ধ জ্ঞানের জন্য তিনটি পদ এবং তিনটি বাক্য থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ একটি অনুমান গঠনের জন্য দরকার হয় তিনটি পদ এবং তিনটি বাক্য। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জীর বক্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন,

> Inference is a class of knowledge originating from the awareness of invariable concomitance (*vyapti-jnana*) of the sign (*hetu*) with the signate (or the thing of which it is the sign) which is to be inferred (*sadhya*), the former corresponding to the middle term and the latter to the mujor of western logic.[৩০]

ন্যায় দর্শনে অনুমানের স্বরূপ প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তা মীমাংসা দার্শনিক শবরস্বামী কর্তৃক ব্যাখ্যাত সংজ্ঞার সাথে অনেকটা মিল রয়েছে।[৩১] ন্যায় মতের অনুমানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, "... অনুমানের ক্ষেত্রে প্রথমে পক্ষের মধ্যে হেতু বা চিহ্ন বা লিঙ্গ বা কারণকে প্রত্যক্ষ করতে হয়। দ্বিতীয় স্তরে এই কারণ বা লিঙ্গের সাথে সাধ্য বা বিধেয়ের নিয়ত সম্পর্কের প্রত্যভিজ্ঞা হয়; এবং তৃতীয় স্তরে পক্ষের মধ্যে অপ্রত্যক্ষিত বিধেয় বা সাধ্যের বা লিঙ্গের উপস্থিতির অনুমান করা হয়।"[৩২]

ন্যায়মতে অনুমানের প্রকারভেদ

ন্যায় দার্শনিকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন নীতির ওপর ভিত্তি করে অনুমানকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।[৩৩] ন্যায় মতে আমরা অনুমানের আটটি প্রকার দেখতে পাই। এর মধ্যে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান নামে দুটি প্রকার দেখা যায়। পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের প্রকারটি দেখা যায় হেতু ও সাধ্যপদের মধ্যকার ব্যাপ্তি সম্পর্কের প্রকৃতিগত ভিত্তিতে। গৌতম এই তিন প্রকার অনুমানের কথা বলেছেন।[৩৪] আর কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানের রূপ পরিগ্রহ হয় ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির ভিত্তিতে।[৩৫] এখন এই অনুমানসমূহের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো :

স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান

উদ্দেশ্যগত দিক থেকে ন্যায় অনুমানকে স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমানে ভাগ করা হয়েছে। যে অনুমান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় তাকে স্বার্থানুমান বলে। এখানে ব্যক্তির নিজস্ব জানার বা বোঝার ব্যাপারটি যুক্ত থাকে। মোট কথা জ্ঞাতা নিজের জন্য যে অনুমান করে তাকে স্বার্থানুমান বলে।[৩৬] স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব উপলব্ধির ব্যাপার থাকে, অন্য কারোর উপলব্ধি বা জ্ঞানের জন্য এখানে অনুমান করা হয় না।[৩৭] তাই এই জাতীয় অনুমান প্রকাশের দরকার হয় না। অর্থাৎ প্রয়োজন হয় না লেখ্য বা কথ্য রূপ প্রদানের। নব্যনৈয়ায়িক অন্নংভট্টও বলেছেন স্বার্থানুমান ব্যক্তির নিজের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর ভাষায়,

"অনুমানং দ্বিবিধম্ – স্বার্থং পরার্থং চ।
তত্র স্বার্থং স্বানুমিতিহেতুঃ ॥"[৩৮]

অন্যদিকে পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্যক্তির নিজের জন্য নয়, অন্যকে বোঝানোর জন্য এখানে অনুমান করা হয়। যেহেতু পরার্থানুমানে অপরের কাছে প্রমাণের একটি বিষয় থাকে, তাই এই অনুমান বিস্তারিতভাবে অন্যের কাছে প্রকাশের প্রয়োজন রয়েছে।[৩৯] তাই আমরা দেখি পাঁচটি অবয়ব বা বচনের সাহায্যে নৈয়ায়িকগণ একটি অনুমানকে উপস্থাপন করে থাকেন। সেজন্য নৈয়ায়িকদের পাঁচটি অবয়ব সম্বলিত অনুমানকে পঞ্চ অবয়বী ন্যায় বলে। নৈয়ায়িকরা মনে করেন প্রতিজ্ঞা হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন এই পাঁচটি অবয়বের মধ্যে কোনো একটি উহ্য থাকলে হবে না।[৪০] এই অনুমানের ক্ষেত্রে তিনটি পদ পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দেশ্যগত দিক থেকে ন্যায় দর্শনের স্বার্থ ও পরার্থানুমানের সাথে মীমাংসা মতের অনেকটা মিল রয়েছে। তবে অবয়বের প্রকৃতিগত দিক থেকে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।[৪১]

পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান

গৌতমের *ন্যায়সূত্র* গ্রন্থে আমরা পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের উল্লেখ দেখতে পাই। হেতুপদ এবং সাধ্যপদের মধ্যে যে ব্যাপ্তি সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় তাঁর প্রকৃতিগত ভিন্নতা থেকে এই অনুমানকে উল্লিখিত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।[৪২] নৈয়ায়িকগণ মূলত কার্যকারণ নীতিকে অনুসরণ করে পূর্ববৎ অনুমান, শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের শ্রেণিবিভাগ দেখাতে চেষ্টা করেছেন।[৪৩] এখন এই তিন প্রকার অনুমান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

পূর্ববৎ অনুমান

পূর্ববৎ অনুমানে মূলত সরাসরি কোনো কারণকে প্রত্যক্ষ করে অপ্রত্যক্ষগত কার্যসমূহের অনুমান করা হয়ে থাকে। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং পূর্ব দৃষ্টান্তের ওপর ভিত্তি করে এই অনুমান গঠন করা হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখে যদি আমরা ধারণা করি যে এখন বৃষ্টি হবে, তাহলে এখানে 'মেঘ' হলো কারণ আর 'বৃষ্টি' হলো কার্য। অনুমানের ব্যাপ্তি এখানে কার্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আমরা এখানে কার্য থেকে কারণকে অনুমান করেছি।

শেষবৎ অনুমান

শেষবৎ অনুমানের ক্ষেত্রে কার্য প্রত্যক্ষণ করে অপ্রত্যক্ষ কারণকে অনুমান করা হয়ে থাকে। এই অনুমানে প্রত্যক্ষ কার্যকে ভিত্তি করে অপ্রত্যক্ষ কারণকে অনুমান করা হয়।[৪৪] উদাহরণ হিসেবে নদীতে পানির পরিপূর্ণতা ও স্রোত পর্যবেক্ষণ করে অতীত বা পূর্বে বৃদ্ধি হয়েছিল এমনটি আমরা অনুমান করি।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান

যখন কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যতীত কোনো অনুমানের ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠিত হয় বা যে অনুমানে হেতু ও সাধ্য পদ কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে না, তখন তাকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলা হয়। অর্থাৎ এই অনুমানের ক্ষেত্রে কার্যকারণ নিয়ম অনুসরণ না করে শুধুমাত্র পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কোনো অনুমান করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে গরু এবং মহিষের শিং আছে এবং তাদের পায়ের খুরটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। তাই অনুরূপভাবে আমরা শিংওয়ালা প্রাণী দেখে অনুমান করি যে এরও পায়ের খুরটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত।[৪৫]

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় ভাষ্যকার বাৎসায়ন উল্লিখিত তিনটি অনুমানের আবার অন্য তিনটি অর্থ নির্দেশ করেছেন। পূর্ববৎ অনুমানকে তিনি পূর্বজ্ঞাত অভিজ্ঞতা নির্ভর বলেছেন। এখানে তিনি কারণ থেকে কার্য অনুমিত হওয়ার কথা বলেছেন। আর শেষবৎ অনুমানে পূর্ববৎ অনুমানের বিপরীত চিত্রটি আমরা দেখতে পাই। অর্থাৎ এখানে কার্য থেকে কারণ অনুমিত হয়। এই অনুমানকে অপনয়ন বা পরিশেষ পদ্ধতি নির্ভর অনুমান বলা হয়ে থাকে। আর সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানে অপ্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু অনুমিত হয় প্রত্যক্ষযোগ্য কোনো চিহ্ন থাকে। তবে উল্লেখ্য যে চিহ্ন ও বস্তুর মধ্যকার কোনো সম্পর্ক এখানে প্রত্যক্ষগত নয়।[৪৬] ভাষ্যকার বাৎসায়ন *ন্যায়সূত্রভাষ্যে* সূত্রকারের অভিমত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, পূর্ববৎ অনুমান বলতে কারণ হেতুক অনুমানকে এবং শেষবৎ অনুমান বলতে কার্যহেতু অনুমানকে নির্দেশ করেছেন। সেই সাথে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানকে কার্য-কারণ ভিন্ন লিঙ্গক অনুমান হিসেবে অভিহিত করেছেন। ভাষ্যকার বাৎসায়ন 'পূর্ব' শব্দ কারণ এবং 'শেষ' শব্দ দ্বারা কার্যকে ইঙ্গিত করেছেন। এখানে কার্য ও কারণের মধ্যে কারণটি পূর্বে এবং কার্যটি শেষে থাকে। সেজন্য 'পূর্ব' শব্দ দ্বারা কারণ অর্থের বোধক এবং 'শেষ' শব্দটি দ্বারা কার্য অর্থের বোধক নির্দেশিত হয়। আর সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলছেন, যখন কোনো একটি পদার্থে অন্যকোনো পদার্থের সামান্যতো ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষের দ্বারা অযোগ্য কোনো পদার্থ অনুমিত হয় তখন ঐ স্থলে অনুমান প্রমাণকে সামান্যতোদৃষ্ট বলে।

কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান

নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় অনুমানের তিনটি শ্রেণিকরণ দেখিয়েছেন তা হলো: কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী। ন্যায় দর্শনে মূলত হেতু ও সাধ্যপদের মধ্যকার ব্যাপ্তি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিকে ভিত্তি করে মূলত এই প্রকারভেদ দেখানো হয়েছে। ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াগত দিকটি অনুমানের এই প্রকারভেদের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

কেবলান্বয়ী অনুমান

কেবলান্বয়ী অনুমানের ক্ষেত্রে অনুমানের ব্যাপ্তি কেবলমাত্র অন্বয়ী পদ্ধতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অনুমানের ক্ষেত্রে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধের কোনো ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ এই অনুমানে কোন নঞর্থক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।[৪৭] সাধ্য, পক্ষ আশ্রয়বাক্য এবং সিদ্ধান্ত কেবলান্বয়ী অনুমানে সদর্থক হয়।[৪৮] উদাহরণ হিসেবে বলা যায়,

সব স্রোতমান বস্তুই গতিশীল
নদী স্রোতমান
নদী গতিশীল।

উল্লিখিত এই অনুমানের ক্ষেত্রে সাধ্য বাক্যটি সার্বিক বাক্য, যোখানে 'গতিশীল' বিধেয়টি সব স্রোতমান বস্তু সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। কেননা আমরা এমন কোনো স্রোতমান বস্তু দেখি না যা গতিশীল নয়, এখানে কোনো ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় না।

কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান

যখন কেবলমাত্র ব্যতিরেকী প্রক্রিয়ায় অনুমানের ব্যাপ্তি পাওয়া যায়, তখন সেই অনুমানকে কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান বলে। এই অনুমানে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে শুধুমাত্র নঞর্থক ব্যাপ্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে অনুমান করা হয়। এই কেবল-ব্যতিরেকী অনুমানে হেতু ও সাধ্যপদের অনুপস্থিতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে থাকে। সাইয়েদ আবদুল হাই প্রদত্ত তাঁর *ভারতীয় দর্শন* গ্রন্থের উদাহরণটির সাহায্যে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করা যায়,

"কোন অবহ্নিমান বস্তুই নয় ধূমায়মান
পর্বত হয় ধূমায়মান
পর্বত হয় বহ্নিমান।"[৪৯]

এই উদাহরণটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানে ব্যাপ্তি সম্পর্ক শুধুমাত্র ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া যেখানে হেতু অনুপস্থিত সেখানে সাধ্যও অনুপস্থিত।

অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান

এই অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি সম্পর্কটি অন্বয় এবং ব্যতিরেকী উভয়ের সাহায্যে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিষয়টি আরো সহজ করে বলা যায়, যখন সাধ্য ও হেতু পদের একত্র উপস্থিতি এবং একত্র অনুপস্থিতি উভয় প্রকার দৃষ্টান্তকে কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন সেটা অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ধূম ও বহ্নির মধ্যে যে সম্বন্ধ তা হলো অন্বয়-ব্যতিরেকী ব্যাপ্তির সম্বন্ধ। এই অনুমানে মূলত ব্যাপ্তি সম্পর্ক অন্বয় ও ব্যতিরেকী এই দুই ধরনের দৃষ্টান্তের ওপর নির্ভর করে থাকে। উল্লেখ্য যে এই অনুমানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে অন্বয়ী পদ্ধতি এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে ব্যতিরেকী পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান সম্পর্কে বলা যায় যে, যে সকল অনুমানের ক্ষেত্রে হেতু পক্ষে এবং তজ্জাতীয় সপক্ষে থাকে, কিন্তু তার কোনো বিপক্ষ লক্ষ করা যায় না তাকে অন্বয়ী অনুমান বলে। আবার যে অনুমানে হেতুপদটি যখন বিপক্ষে থাকে না তখন তাকে ব্যতিরেকী অনুমান বলে। এই অনুমানের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত সবসময় পক্ষের থেকে অতিরিক্ত হয়ে থাকে। আর যে অনুমানের ক্ষেত্রে হেতুর সাথে সাধ্যের ব্যাপ্তি অন্বয় এবং

ব্যতিরেক– এই দুটির দ্বারা নিরূপণ করা হয়ে থাকে, তাকে অন্বয়- ব্যতিরেকী ব্যাপ্তি বলে এবং ঐ অনুমানকে অন্বয়– ব্যতিরেকী অনুমান হিসেবে অভিহিত করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, জ্ঞান আহরণ কিংবা অর্জন প্রক্রিয়ায় ন্যায় দার্শনিকদের অনুমানের উল্লিখিত প্রকারভেদ এবং বিশ্লেষণ সূদুর প্রসারী এবং তাৎপর্যপূর্ণ যা আমাদের জ্ঞান অর্জনের পথকে করেছে আরো সমৃদ্ধ।

বৈশেষিক দর্শনে অনুমান

আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে অন্যতম প্রাচীন দর্শন হলো বৈশেষিক দর্শন। বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায়ের আদি প্রবক্তা এবং প্রণেতা হলেন মহর্ষি কণাদ। ন্যায় দর্শন এবং বৈশেষিক দর্শনের অনেক বিষয়ের মধ্যে মিল দেখা যায়। আর এই মিল বা সাদৃশ্যের কারণে এই দুই প্রকার দর্শনকে একত্রে সমানতন্ত্রও বলা হয়ে থাকে। তবে অবান্তর বিষয়ে উভয় দর্শনের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এই দর্শন একদিকে বহুত্ববাদী এবং অন্যদিকে বস্তুবাদী। মহর্ষি কণাদ রচিত "বৈশেষিক সূত্র" বৈশেষিক দর্শনের মূল গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন এই জ্ঞাতকে দুঃখময় এবং নৈরাশ্যজনক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। উভয় দর্শন যথার্থ জ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত করে দুঃখ এবং নৈরাশ্য থেকে আত্যন্তিক নিবৃত্তির কথা বলেছে। তাই দেখা যায় উভয় দর্শনে জ্ঞানের আলোচনা বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। নৈয়ায়িকগণ তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় চারটি প্রমাণের কথা স্বীকার করলেও বৈশেষিক সম্প্রদায় সেখানে মাত্র দুটি প্রমাণ–প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানকে স্বীকার করেছেন। বৈশেষিকগণ উপমান এবং শব্দ ও প্রমাণকে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানের অন্তর্গত বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন।

বৈশেষিকগণ তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় অনুমানকে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুমানের প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতা উপলব্ধি করে তাঁরা অনুমানের শ্রেণিকরণিক ব্যাখ্যা প্রদানে প্রয়াসী হয়েছিলেন। যদিও তাঁদের ব্যাখ্যার সাথে ন্যায়মতের অনেক মিল লক্ষ করা যায়। বৈশেষিকদের অনুমানতত্ত্ব নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখানো হলো :

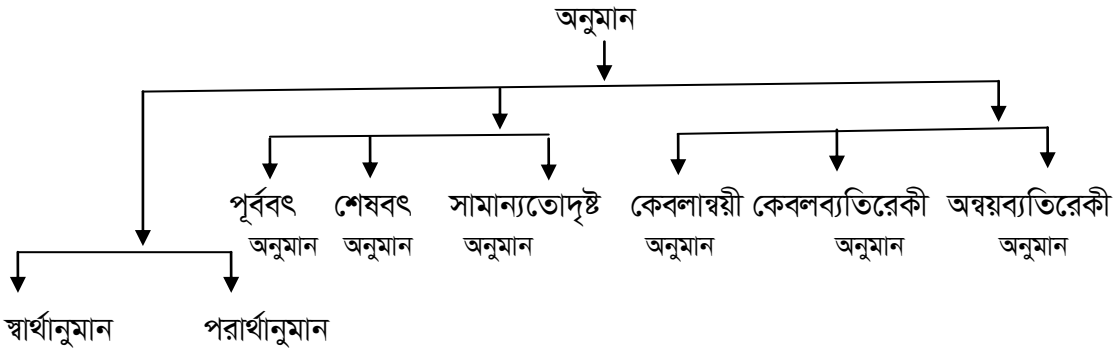

এখন বৈশেষিক দর্শনের অনুমান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

অনুমান: মহর্ষি কণাদের *বৈশেষিক সূত্রে* অনুমানের স্বরূপ প্রসঙ্গে এভাবে বলা হয়েছেন "লিঙ্গাজ্জাতং লৈঙ্গিকং ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মোলিঙ্গম্।"[৫০] বৈশেষিক দর্শনের সূত্রকার মহর্ষি কণাদ অনুমান প্রমাণকে 'লৈঙ্গিঁক' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কেননা লিঙ্গ থেকে উৎপন্ন জ্ঞানকে যেমন লৈঙ্গিক বলা হয় তেমনি এর প্রমাণকেও একইভাবে লৈঙ্গিক বলা হয়। আর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মকে লিঙ্গ বলে। বৈশেষিক সূত্রের *উপস্কার* টীকার প্রণেতা শঙ্কর মিশ্র আবার অনুমান প্রসঙ্গে একটু ভিন্ন কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, অনুমিতি জ্ঞানের করণ হলো লিঙ্গ, পরামর্শ নয়। কেননা পরামর্শ হলো নির্ব্যাপার। আর তাই তা কখনও করণ হতে পারেনা।[৫১] আরেক বিবৃতিকার জয়নারায়ণ তর্করত্ন মনে করেন, "লিঙ্গেন ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতাবিশিষ্টেন জনিতং জ্ঞানং লৈঙ্গিকম্....।"[৫২]

অর্থাৎ তিনি ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতা জ্ঞান থেকে উৎপন্ন জ্ঞানকেই অনুমিতি জ্ঞান হিসেবে অভিহিত করছেন। লৈঙ্গিক প্রমাণকে তিনি পরামর্শ মানছেন। বৈশেষিক দর্শনের অনুমান সংক্রান্ত যে আলোচনা এবং শ্রেণিবিভাগ দেখা যায় তা ন্যায় দর্শনে আলোচিত অনুমানেরই অনুরূপ।[৫৩] তাই এখন খুব সংক্ষেপে বৈশেষিকদের অনুমানের প্রকারভেদের আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

স্বার্থানুমান, বৈশেষিকরা অনুমানের যে ভেদের কথা বলেছেন তার মধ্যে স্বার্থানুমান অন্যতম। এই স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো জ্ঞাতা নিজের জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে কোনো ধরনের অনুমান করে থাকে। অর্থাৎ এই অনুমানে ব্যক্তিগত জ্ঞান লাভ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। ব্যক্তি নিজস্ব জ্ঞান পাওয়ার জন্য অনুমানকে ব্যবহার করেন। অন্যের জ্ঞান লাভের বিষয়টি এখানে প্রাধান্য পায় না। তাই এই ধরনের অনুমান ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এই অনুমানের উদাহরণের ক্ষেত্রে বলা যায়, 'পাহাড়ে ধোঁয়া দেখে পাহাড়ে আগুন লেগেছে' এমন অনুমান করা যেতে পারে। কর্তা নিজ সংশয় দূর করার লক্ষ্যে যদি এই ধরনের অনুমান করেন তাহলে তাকে স্বার্থানুমান বলা যাবে। এই জাতীয় অনুমান কথ্য বা লেখ্য ভাষায় প্রকাশের প্রয়োজন পড়ে না।

পরার্থানুমান, আমরা যখন কোনো সিদ্ধান্ত অন্যের কাছে প্রমাণ করার লক্ষ্যে অনুমান করি তখন তাকে পরার্থানুমান বলে। যেহেতু অনুমানটি অন্যের কাছে প্রমাণ করতে হয় তাই এই অনুমান সঠিকভাবে লেখনী এবং বলার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয়। ভারতীয় ন্যায়ের ক্ষেত্রে যে পাঁচটি অবয়বের উল্লেখ আছে তার সবকটি এই অনুমানে স্বচ্ছভাবে ব্যক্ত করতে হয়। কোনো একটি উহ্য থাকলে হবে না। এই পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে কর্তা প্রথমে নিজেই হেতুর সাহায্যে অনুমেয় সাধ্যের উপস্থিতি সম্পর্কে

নিশ্চিত হয়ে অন্যের সংশয় দূর করার জন্য যৌক্তিকভাবে পাঁচটি বাক্যকে ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করে থাকেন।

পূর্ববৎ অনুমান, অনুমানের ব্যাপ্তি এই অনুমানে কার্যকারণ সম্বন্ধের সাহায্যে স্থাপিত হয়ে থাকে। তাই এখানে আমরা কারণ থেকে কার্যকে অনুমান করে থাকি। অর্থাৎ কারণকে প্রত্যক্ষ করে অপ্রত্যক্ষগত কার্যের কথা যখন আমরা অনুমান করি তখন সেটি পূর্ববৎ অনুমান হয়। পূর্বজ্ঞাত অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে এই অনুমান গঠন করা হয়। 'হেতু' কারণের সরাসরি জ্ঞান থেকে 'সাধ্য' কার্যের বিষয়টি অনুমান করা হয় পূর্ববৎ অনুমানে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– 'আকাশে ঘন কালো মেঘ আছে, তাই বৃষ্টি হবে।' এই অনুমানে কারণ পূর্ববর্তী, আর 'ভবিষ্যৎ বৃষ্টি' কার্যকে অনুমান করা হয়েছে তাই এই অনুমানকে পূর্ববৎ অনুমান বলে।

শেষবৎ অনুমান, শেষবৎ অনুমানের বিষয়টা অনেকটা পূর্ববৎ অনুমানের বিপরীত। এই অনুমানে হেতু কার্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতে সাধ্য কারণকে অনুমান করা হয়ে থাকে। এই শেষবৎ অনুমানে 'শেষ' শব্দের অর্থ কার্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এখানে আমরা কার্য থেকে কারণকে অনুমান করতে পারি। অর্থাৎ এই শেষবৎ অনুমানে প্রত্যক্ষগত কার্য থেকে অপ্রত্যক্ষগত কারণসমূহ অনুমিত হয়ে থাকে। নদীতে ময়লা, ঘোলা জল এবং তীব্রস্রোত দেখে যদি আমরা অতীত বৃষ্টির অনুমান করি তাহলে সেটা হবে শেষবৎ অনুমানের দৃষ্টান্ত।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান, বৈশেষিক চিন্তায় কার্যকারণ ভিন্ন হেতু হতে অনুমানকে বলা হয় সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। এই অনুমানে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্পর্ক দেখা যায়। কোনো ধরনের কার্যকারণ সম্পর্ক এখানে দেখা যায় না। এই অনুমানের ক্ষেত্রে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে কারণ বা কার্য বলে কিছু প্রত্যক্ষগত হয় না, তবে অন্যত্র এদের মধ্যে সম্বন্ধ পর্যবেক্ষণ করে হেতু দ্বারা সাধ্যের অনুমান গৃহীত হয়। যেমন- চাঁদের গতিকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, তবে অনুমান করতে পারি। এই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান সম্পর্কে গঙ্গানাথ ঝা গ্রন্থমালায় দেখতে পাওয়া যায়, "প্রসিদ্ধসাধ্যয়োরত্যন্তজাতিভেদে লিঙ্গানুমেয় ধর্মসামান্যানুবৃত্তিতোনুমানং সামান্যতোদৃষ্টম্।"[৫৪] অর্থাৎ যে অনুমানের ক্ষেত্রে সাধ্য এবং পূর্বে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে যে ব্যাপ্তি গৃহীত হয়, এই উভয় ধরনের সাধ্যপদের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ পরিলক্ষিত হলেও হেতুসামান্যের সাথে সাধ্যসামান্যের ব্যাপ্তির মাধ্যমে যে অনুমান গৃহীত হয়ে থাকে তাই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। এই জাতীয় অনুমানে কার্যকরণ সম্পর্কের ভিত্তি কার্যকরী নয়, তবে পূর্বজ্ঞাত অভিজ্ঞতা এবং সাদৃশ্যের বিষয়টি কার্যকরী।

কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান, হেতু ও সাধ্যে পদের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিগত ভিত্তিকে অবলম্বন করে অনুমানের এই তিনটি শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

যখন কেবলমাত্র অন্বয়ী দৃষ্টান্তকে কেন্দ্র করে অনুমান করা হয় তখন সেই অনুমানকে কেবলান্বয়ী অনুমান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই অনুমানের ক্ষেত্রে যেখানে হেতু সেখানে সাধ্য দেখা যায়। এই অনুমানে নঞর্থক কিংবা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় না। যেমন:

সব ধোঁয়াময় বস্তুই অগ্নিমান
পাহাড় ধোঁয়াময়
পাহাড় অগ্নিমান।

যখন কেবলমাত্র ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তকে কেন্দ্র করে অনুমান করা হয় তখন সেই অনুমানকে কেবল ব্যতিরেকী অনুমান হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই অনুমানের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো– হেতুর অভাবের সঙ্গে সাধ্যের অভাবের ব্যাপ্তি বর্তমান থাকে। এই অনুমানের ক্ষেত্রে হেতু পদের সঙ্গে সাধ্যের কেবল– ব্যতিরেকী ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

কোনো ধোঁয়াহীন বস্তুই নয় অগ্নিমান
পাহাড় ধোঁয়াময়
পাহাড় অগ্নিমান।

আর যখন হেতুপদ ও সাধ্যের অন্বয় এবং ব্যতিরেকী এই উভয় ধরনের উদাহরণ বা দৃষ্টান্তকে কেন্দ্র করে অনুমান গৃহীত হয় তখন তাকে অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান বলে। বিষয়টি স্পষ্টের জন্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই অনুমানের ক্ষেত্রে যেখানেই হেতু সেখানেই সাধ্যকে দেখা যায়, এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়-

(১) সব ধোঁয়াময় বস্তুই অগ্নিমান
পাহাড় ধোঁয়াময়
পাহাড় অগ্নিমান।
এবং
(২) কোন অগ্নিমান বস্তু ধোঁয়াময়
পাহাড় ধোঁয়াময়
পাহাড় অগ্নিমান।

বৈশেষিকদের জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখি যে তাঁরা মাত্র দুটি প্রমাণ স্বীকার করেছেন। প্রমাণ দুটি হলো: যথাক্রমে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান। উপরের আলোচনায় আমরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত অনুমানের আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁরা বৈধ জ্ঞানকে বিদ্যা এবং অবৈধ জ্ঞানকে অবিদ্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৫৫] এই বিদ্যাই বস্তুর প্রকৃত

স্বরূপ আমাদের সামনে উপস্থাপন করে। তাঁদের অনুমান সম্পর্কিত আলোচনায় আরো দেখা যোয় যে প্রত্যক্ষণের তুলনায় অনুমানের বিস্তৃতি বেশি রয়েছে। কেননা উপমান এবং শব্দকেও তাঁরা অনুমানের অর্ন্তগত বিষয় হিসেব গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, "... বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে, উপমান ও শব্দ অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের মতে, যেহেতু শব্দ প্রমাণের ভিত্তি হলো শব্দ ও তার অর্থের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ এবং শব্দ হলো লিঙ্গ বা চিহ্নস্বরূপ, যার মাধ্যমে শব্দের অর্থ অনুমান করা হয়, সেহেতু শব্দ হল অনুমান। উপমান প্রকৃতপক্ষে শব্দ প্রমাণ নির্ভর। কেননা উপমান বিশ্বস্ত ব্যক্তির উক্তির বৈধতার ওপর নির্ভরশীল...।"[৫৬]

মীমাংসা দর্শনে অনুমান, বেদের প্রমাণ্য স্বীকারকারী অন্যতম দর্শন সম্প্রদায় হলো মীমাংসা দর্শন। বেদ মূলত দুটি কাণ্ডে বিভক্ত। যথা: কর্মকাণ্ড বা পূর্বকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড বা উত্তরকাণ্ড। মীমাংসা দর্শন বেদের কর্মকাণ্ড বা পূর্বকাণ্ডকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্বকাণ্ডকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত বলে মীমাংসা দর্শনকে পূর্ব মীমাংসা নামেও অভিহিত করা হয়। মীমাংসা দর্শন ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কিত প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ওপর জোর দেয়। এই দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বে প্রমা, প্রমাণ, সত্যতার মানদণ্ড প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মীমাংসা মতে আত্মাকে বলা হয়েছে জ্ঞাতা। মীমাংসা দার্শনিকদের মতে এই আত্মা বা জ্ঞাতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানসহ যাবতীয় জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে।[৫৭]

মহর্ষি জৈমিনি হলেন এই মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। জৈমিনি প্রণীত 'মীমাংসাসূত্র' এই দর্শনের মূলগ্রন্থ। জ্ঞানের উৎস বা পদ্ধতি নিয়ে মীমাংসা দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। জৈমিনির মতে প্রমাণ তিন প্রকার। যথা: প্রত্যক্ষণ, অনুমান এবং শব্দ। কিন্তু মীমাংসাসূত্রের প্রখ্যাত ভাষ্যকার কুমারিল ভট্টের মতে প্রমাণ ছয় প্রকার। যথা: প্রত্যক্ষণ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি। আবার কুমারিল ভট্টের শিষ্য মীমাংসা দর্শনের আরেকজন খ্যাতনামা ভাষ্যকার প্রভাকর মিশ্রের মতে পাঁচ প্রকার। যথা: প্রত্যক্ষণ, অনুমান, শব্দ, উপমান এবং অর্থাপত্তি।[৫৮] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মীমাংসা দার্শনিকদের প্রায় সকলেই অনুমানকে দ্বিতীয় প্রধান প্রমাণ হিসেবে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এখন মীমাংসা মতে এই অনুমানের স্বরূপ এবং প্রকারভেদ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

অনুমান, মীমাংসা দার্শনিকগণ প্রমাণের দুটি বিভাগের কথা বলেছেন। এই দুটি বিভাগ হলো: প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। অনুমান হলো পরোক্ষ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। আর পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়টি সবসময় পূর্ববর্তী কোনো না কোনো জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। কেননা অনুমান সবসময়

জ্ঞাত বিষয়নির্ভর হয়ে থাকে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে অনুমান বলতে বোঝায় পশ্চাদ্‌গামী কোনো জ্ঞানকে। 'অনুমান' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় 'অনু' অর্থ পশ্চাৎ বা পরবর্তী এবং 'মান' অর্থ জ্ঞান। তাই আমরা বলতে পারি, পূর্ববর্তী কোনো জ্ঞাত বা জানা বিষয়কে কেন্দ্র করে পরবর্তী কোনো নতুন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাই অনুমান। এখানে মূলত পূর্ববর্তী জ্ঞানের সমর্থনে পরবর্তী ধাপের নতুন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পাহাড়ে ধোঁয়া উড়তে দেখে সেখানে অগ্নির অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞান লাভ করাকে অনুমান বলে। প্রত্যক্ষ এবং ব্যাপ্তি জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুমান গঠিত হয়ে থাকে। উল্লিখিত উদাহরণে ধোঁয়ার প্রত্যক্ষ এবং ধোঁয়া ও অগ্নির নিয়ত সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। এই অনুমানের গঠন সম্পর্কে বলা যায়, যা অনুমিত হয়ে থাকে তা হলো সাধ্য, আর যার মধ্যে আমরা সাধ্যের অস্তিত্বকে অনুমান করে থাকি তা হলো পক্ষ, আর যে বিষয় বা বস্তুর প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে অনুমানটি গৃহীত হয় তাকে বলে হেতু, লিঙ্গ বা সাধন পদ। অনুমানে জ্ঞাত বিষয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের নিত্য সম্বন্ধ নির্দেশ করে থাকে। মীমাংসকগণ মনে করেন তিনটি বাক্য দ্বারা অনুমান পদ্ধতি গঠন করা হয়ে থাকে। মীমাংসা দর্শনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার শবরস্বামী অনুমান প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রত্যক্ষগত কোনো বস্তু হতে এবং ঐ বস্তুর সাথে সম্পর্কিত নিয়ত সম্বন্ধের জ্ঞানকে কেন্দ্র করে অদেখা বা অপ্রত্যক্ষগত কোনো বস্তুর জ্ঞানকে অনুমান বলা হয়।[৫৯] অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত শবরস্বামীর বক্তব্যকে এভাবে তুলে ধরেছেন,

> Sabara says that when a certain fixed or permanent relation has been known to exist between two things, we can have the idea of one thing when the other one is perceived, and this kind of knowledge is called inference.[৬০]

আরেক ভাষ্যকার কুমারিল ভট্টও শবরস্বামীর অনুরূপ কথা বলেছেন। তবে প্রভাকর শবরস্বামীর সাথে খানিকটা দ্বিমত পোষণ করেছেন।

মীমাংসা দর্শনে অনুমানের ক্ষেত্রে দুটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চার ধরনের শ্রেণিবিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। বিষয়বস্তুর প্রকৃতিগত পার্থক্যকে দুটি ভাগ করা যায়। যথা: প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান এবং সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান। আর অনুমানকারীর উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমানের ভাগও আমরা মীমাংসা অনুমানে দেখতে পাই।[৬১] এখন এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ এবং সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান, মীমাংসা দর্শনের খ্যাতনামা ভাষ্যকার শবরস্বামী প্রকৃতিগত ভিন্নতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুটি শ্রেণিভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। মীমাংসা দর্শনের আরেকজন প্রখ্যাত ভাষ্যকার কুমারিল ভট্ট এই শ্রেণির অনুমানকে দৃষ্টস্বলক্ষণবিষয় এবং অদৃষ্টস্বলক্ষণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ভাষ্যকার প্রভাকর মিশ্রের মতে এগুলো আবার দৃষ্টস্বলক্ষণ এবং অদৃষ্টস্বলক্ষণ অনুমান হিসেবে অভিহিত।[৬২] প্রত্যক্ষদৃষ্ট অনুমানে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে সম্বন্ধ হলো প্রত্যক্ষের বিষয়। এই অনুমানের ক্ষেত্রে দুটি বাস্তব বা সরাসরি প্রত্যক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে অনুমান করা হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে আমরা অগ্নি এবং ধোঁয়ার কথা বলতে পারি। কেননা এদের মধ্যে নিয়ত সম্পর্কের ভিত্তিতে এখানে অনুমান গঠন করা হয়। অন্যদিকে, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানে দৃষ্ট অনুমানে সাধ্য প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। এই অনুমানে সাধারণ জ্ঞান থেকে সাধ্যকে প্রমাণ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে বস্তু স্থান পরিবর্তন করতে পারে সেই বস্তুর মধ্যে গতি রয়েছে অর্থাৎ ঐ বস্তু গতিশীল। এই জাতীয় সাধারণ জ্ঞান থেকেই আমরা চন্দ্র-সূর্যের স্থান পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে অনুমান করি যে চন্দ্র এবং সূর্য গতিশীল। আর এই অনুমানকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলে। এই অনুমানের ক্ষেত্রে মূলত একটি দেখা বা প্রত্যক্ষ করা এবং একটি অদেখা বা অপ্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর মধ্যে নিয়ত সম্পর্ককে কেন্দ্র করে অনুমান করা হয়েছে। ভাষ্যকর প্রভাকর মিশ্রও অবস্থান পরিবর্তন এবং গতি সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করেছেন।[৬৩]

স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান, মীমাংসা দর্শনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার প্রভাকর মিশ্র অনুমানকারীর উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমানকে চিহ্নিত করেছেন। ব্যক্তি নিজে জানার নিমিত্তে যে সকল অনুমান করে থাকে তাকে স্বার্থানুমান বলা হয়।[৬৪] অনুমানকারী কর্তা নিজ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এই জাতীয় অনুমান করে থাকেন। এই অনুমানের ক্ষেত্রে বিষয়কে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করার দরকার হয় না। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, অনুমানকারী কর্তা যদি স্বয়ং ধোঁয়া দেখে ব্যাপ্তি চিহ্নিত করে সাধ্যকে গ্রহণ করেন তাহলে সেটি হবে স্বার্থানুমান।[৬৫]

অন্যদিকে যখন অন্যকে বোঝানোর জন্য যখন কোনো অনুমান করা হয় তখন তাকে পরার্থানুমান বলে।[৬৬] এই অনুমানে অনুমানকর্তাকে অন্যের কাছে অনুমেয় বিষয় প্রমাণ করার প্রয়োজন পড়ে। তাই এই পরার্থানুমানকে বিস্তারিতভাবে অর্থাৎ কথ্য এবং লেখ্য ভাষায় প্রকাশের প্রয়োজন পড়ে। সংক্ষেপে বলা যায়, "যেখানে, অপরের বাক্য থেকে সাধ্য অনুমান করা হয়, সেটি পরার্থানুমান।"[৬৭] উল্লিখিত এই দুই প্রকার অনুমানে তিনটি বাক্য এবং তিনটি পদ লক্ষ করা যায়।[৬৮]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, প্রখ্যাত ভাষ্যকার শবরস্বামী, কুমারিল ভট্ট এবং প্রভাকার মিশ্র মীমাংসা দর্শনে অনুমানের যে শ্রেণিকরণ এবং ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন তা ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে। তাই জ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁদের আলোচনাকে কোনোভাবেই সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ নেই। বরং তাঁদের অনুমান-সংক্রান্ত আলোচনার বাস্তব উপযোগিতা মানবজীবনের বিভিন্ন বিষয়াবলিতে প্রয়োগ করে মানুষ তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণ করছে। তাই তাঁদের ব্যাখ্যাত অনুমানের শ্রেণীকরণের বিশ্লেষণে আমরা একথা সহজে বলতে পারি যে, তাঁরা তাঁদের অনুমান-সংক্রান্ত আলোচনা শুধু তত্ত্বগত দিককে নির্দেশ করে না এর ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক দিকও রয়েছে। তাই বলা যায় মীমাংসা দর্শনের অনুমান-সংক্রান্ত আলোচনা যথার্থ আলোচনা।

বেদান্ত দর্শনে অনুমান

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দর্শন হচ্ছে বেদান্ত দর্শন। বেদের যে দুটি ভাগ পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে একটি ভাগকে বলা হয় জ্ঞানকাণ্ড বা উত্তরকাণ্ড। বেদান্ত দর্শন এই জ্ঞানকাণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই বেদান্ত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'বেদের অন্ত বা শেষ'। বেদান্ত দর্শন বলতে মূলত উপনিষদের দর্শনকে বোঝায়। কেননা বেদের শেষ অংশে রয়েছে উপনিষদ। সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে বেদান্ত দর্শন ভারতীয় দর্শনের সামগ্রিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। এই দর্শন বিচিত্র, ব্যাপক এবং মৌলিক চিন্তাকে ধারণ করে।[৬৯] মহর্ষি বাদরায়ণ হলেন এই বেদান্ত দর্শনের প্রণেতা। *ব্রহ্মসূত্র* হলো বেদান্ত দর্শনের মূলগ্রন্থ। এই বেদান্ত দর্শনের খ্যাতনামা দু'জন ভাষ্যকার হলেন আচার্য শঙ্কর এবং আচার্য শ্রীরামানুজ। এদের ভাষ্যমতকে কেন্দ্র করেই বেদান্ত দর্শনের আলোচনা অগ্রসর হয়েছে। শঙ্কর এবং রামানুজ উভয়ই দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শঙ্করাচার্য প্রত্যক্ষণ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপাত্তি এবং অনুপলব্ধি– এই ছয় প্রকার প্রমাণের কথা বলেছেন।[৭০]

অন্যদিকে রামানুজ প্রত্যক্ষণ, অনুমান এবং আগম বা শব্দকে প্রমাণ হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে তাঁরা দু'জনই প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা প্রথমে শঙ্করের চিন্তায় অনুমান এবং এর প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব এবং পরবর্তীতে রামানুজের অনুমান সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করব।

শঙ্করের চিন্তায় অনুমান

অদ্বৈত বেদান্তে আচার্য শঙ্কর প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে যে ছয়টি উপায় বা প্রমাণের কথা বলেছেন তারমধ্যে অনুমানকে তিনি দ্বিতীয় প্রধান উৎস বা উপায় হিসেবে স্বীকার করেছেন। এই অনুমান মূলত পরোক্ষ জ্ঞান। কোনো একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর সেই জাতীয় অপ্রত্যক্ষগত বস্তু সম্পর্কে যে ব্যাপ্তিমূলক জ্ঞান হয় তাকে অনুমান বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, দূরবর্তী পর্বতে ধোঁয়া উড়তে দেখে ঐ পর্বতে আগুনের অস্তিত্ব বিষয়ক ব্যাপ্তিমূলক জ্ঞানকে অনুমান বলে। অনুমানের সংজ্ঞা নিয়ে ন্যায় দর্শনের সাথে বেদান্তমতের কোনো ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তবে অনুমানের করণ, অবয়ব, প্রকারভেদ নিয়ে উভয় দর্শনের বৈসাদৃশ্য দেখা যায়।[৭১] আবার শঙ্করের অনুমানের প্রকৃতির সঙ্গে মীমাংসা ভাষ্যকার শবরস্বামী এবং কুমারিলের মতের মিল পাওয়া যায়।[৭২] শঙ্করেরদর্শনে দুই প্রকার অনুমানের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা: স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান। অদ্বৈত বেদান্তের এই প্রকারভেদের সাথে মীমাংসা মতের মিল লক্ষ করা যায়। এখন শঙ্করের স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান, স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে কর্তা বা জ্ঞাতা তার নিজস্ব জ্ঞান লাভের জন্য যে অনুমান করে তাকে স্বার্থানুমান বলে। স্বার্থানুমান প্রকাশের প্রয়োজন পড়ে না, কেননা এই অনুমান শুধুমাত্র ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধি করে। এখানে জ্ঞাতা হেতু প্রত্যক্ষ করে, সেই সাথে ব্যাপ্তি সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে সাধ্যের অনুমান করে থাকে। অন্যদিকে কর্তা বা ব্যক্তি যখন নিজের উপলব্ধিগত জ্ঞানকে অন্যের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্য যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, তখন সেই অনুমানকে পরার্থানুমান বলা হয়। এই অনুমান অপরের কাছে প্রকাশের প্রয়োজন পড়ে। তাই এই পরার্থানুমান কথ্য এবং লেখ্য ভাষায় প্রকাশ করতে হয়। অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ ঘোষ এই অনুমান প্রসঙ্গে বলেন, "এই প্রকারে লব্ধ সাধ্যের জ্ঞান অন্যকে বুঝাইবার জন্য নির্দিষ্ট অবয়বসমূহ দ্বারা সংগঠিত যে যুক্তির (Argument) আশ্রয় গ্রহণ করা হয় উহাকে 'পরার্থানুমান' বলে।"[৭৩] পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞা, হেতু এবং উদাহরণ এই তিনটি অবয়বকে স্বীকার করা হয়েছে।[৭৪] ন্যায় অনুমানে অবশ্য উপনয় এবং নিগমন নামে আরো দুটি অবয়বকে স্বীকার করা হয়েছে। এই দুই প্রকার অনুমানের উল্লেখ আমরা ন্যায় এবং মীমাংসা দর্শনেও দেখতে পাই।[৭৫]

রামানুজের চিন্তায় অনুমান, আচার্য শ্রীরামানুজ শঙ্করের মতো ছয় প্রকার নয়, তিনি তিন প্রকার প্রমাণকে স্বীকার করেছেন। যথা: প্রত্যক্ষণ, অনুমান এবং আগমকে তিনি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই তিনটি প্রমাণকে রামানুজ জ্ঞানের উৎস হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। রামানুজ মনে

করেন, সার্বিক বা সাধারণ সত্য থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান হলো অনুমানলব্ধ জ্ঞান। তাঁর মতে, সাধারণ সত্যে যদি আমরা উপনীত হতে চাই তাহলে একাধিক দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করার দরকার নেই, একটি দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করলেই চলে। তবে একাধিক দৃষ্টান্তের পর্যবেক্ষণ বা প্রত্যক্ষণ আমাদের সন্দেহ বা সংশয় দূরীভূত করে থাকে। তাই একাধিক দৃষ্টান্তের পর্যবেক্ষণের দ্বারা সদর্থক এবং নঞর্থক দৃষ্টান্তকে ব্যবহার করে আমরা অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে বর্জন করে সাধারণ সত্য প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাই। মূলত ব্যাপ্তি সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে অনুমান গঠিত হয়। রামানুজের অনুমান চিন্তা প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যায়, "হেতু এবং সাধ্যের মধ্যে নিয়ত এবং অব্যভিচারী সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলা হয়। ব্যাপ্তির ধারণা এবং ব্যাপ্তি প্রমাণ সম্পর্কে রামানুজ ন্যায় দর্শনের অনুসরণ করেন। পক্ষপদে হেতুর প্রত্যক্ষ হইলে সাধ্যের অনুমান যথার্থ হয়।"[৭৬] তিনি মনে করেন ন্যায় অনুমানের ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা, হেতু এবং উদাহরণ এই তিনটি অবয়বের বাইরে অন্য কোনো অবয়বের প্রয়োজন নেই। উপমান এবং অর্থাপত্তি প্রমাণকেও তিনি অনুমানের অন্তর্গত বিষয় বলে মনে করেন। তাই আমরা বলতে পারি রামানুজের চিন্তাতে অনুমান কোনো সংকীর্ণ বিষয় নয়, বরং এটি বিশাল এবং বিস্তৃত বিষয় যা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান দ্বারা অর্জিত হয়।

তাই পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, আচার্য শঙ্কর এবং রামানুজের অনুমান সম্পর্কিত চিন্তা ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বকে করেছে আরো সমৃদ্ধ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুমান নিয়ে তাঁদের চিন্তা এবং এর বিশ্লেষণ পরবর্তী জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়বস্তুকে আরো ত্বরান্বিত করবে– একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

চার্বাক দর্শনে অনুমান

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে তিনটি সম্প্রদায় বেদের প্রাধান্য বা কর্তৃত্বকে মানেন না তাদের মধ্যে অন্যতম হলো চার্বাক দর্শন সম্প্রদায়। চার্বাক দর্শন প্রবলভাবে বেদের বিরোধিতা করেছে। এই চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন অতি প্রাচীন জড়বাদী দর্শন। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এই দর্শন স্বতন্ত্র দর্শন হিসেবে বিবেচিত। চার্বাক মতে জড় উপাদান থেকেই জগতের সকল কিছুর উৎপত্তি। চার্বাকরা বেদ, ঈশ্বর, ধর্ম, মোক্ষ, পরলোক, কর্মফল কোনো কিছুই মানেন না, তাঁরা এসবের সরাসরি বিরোধিতা করেছেন। জড়কেই তাঁরা প্রকৃত এবং চরম সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই চার্বাক দর্শনকে তৎকালীন সময়ের উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং অধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ট প্রতিবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর, পাপ, পুণ্য, আত্মা প্রভৃতি বিষয়ের কোনো আলোচনাকে চার্বাকরা গুরুত্ব দেননি। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালির সাথে এই দর্শনের অনেক বিষয়-বিশ্বাস, সংস্কৃতি, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির সাদৃশ্য থাকার কারণে এই দর্শনকে লোকায়ত দর্শনও বলা

হয়ে থাকে। বেদ, মহাভারত, রামায়ণ এবং প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে এই চার্বাক দর্শন সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই দর্শনের এক ব্যতিক্রমধর্মী বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।[৭৭] চার্বাকদের আলোচনায় মূলত জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং নীতিতত্ত্বের আলোচনার প্রাধান্য দেখা যায়। আমাদের আলোচ্য অধ্যায়ের নিয়মানুযায়ী চার্বাকদের অনুমান নিয়ে আলোচনা করার কথা, কিন্তু চার্বাকরা ছিলেন অনুমানের বিরোধী, অনুমানকে তাঁরা প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেননি বরং তাঁরা অনুমানের বিপক্ষে কথা বলেছেন। এখন সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

চার্বাকদের চিন্তায় অনুমান, ভারতীয় দর্শনে চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য সকল দার্শনিক সম্প্রদায় অনুমানের প্রামাণ্যকে স্বীকার এবং গুরুত্ব প্রদান করেছেন।[৭৮] চার্বাকগণ কেবল প্রত্যক্ষণকেই প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেছেন। তাঁদের মনোভাব ছিল প্রত্যক্ষ অতিরিক্ত কোনো প্রমাণ নেই। তাঁরা মনে করেন প্রত্যক্ষপ্রমাণই একমাত্র নির্ভরযোগ্য এবং নিশ্চিত প্রমাণ।[৭৯] এই প্রত্যক্ষণের দুটিরূপ পরিলক্ষিত হয়– বাহ্যপ্রত্যক্ষণ এবং মানসপ্রত্যক্ষণ। ইন্দ্রিয়বহির্ভুত কোনো বিষয় চার্বাকদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ইন্দ্রিয়জাত বস্তুর অস্তিত্বকেই তাঁরা শুধু গ্রহণ করেছেন।[৮০] আর এ কারণেই চার্বাকরা অনুমানকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেননি। অনুমানকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ না করার পিছনে মূলত কারণ ছিল ব্যাপ্তিজ্ঞান। ব্যাপ্তিজ্ঞান হলো যথার্থ অনুমানের অন্যতম শর্ত। এজন্য এই ব্যাপ্তিজ্ঞান ছাড়া অনুমান সম্ভব হয় না। একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা আরো পরিষ্কার করা যায়- কোনো দূর পাহাড়ে ধোঁয়া উড়তে দেখে আমরা যদি অনুমান করি যে ঐ পাহাড়ে আগুন লেগেছে। তখন এই অনুমানের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ধোঁয়া এবং আগুনের মধ্যকার নিয়ত ও অব্যভিচারী সম্বন্ধ। এস্থলে ধোঁয়া এবং আগুনের মধ্যকার এই ধরনের সম্বন্ধকেব্যাপ্তি সম্পর্ক বলে। এই ব্যাপ্তিসম্পর্কে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় না। আর চার্বাকদের আপত্তি হলো এখানে। তাই চার্বাকরা বলেন, ব্যাপ্তিজ্ঞান কখনো প্রত্যক্ষণের বিষয় হতে পারে না। তাই এই জ্ঞান গ্রহণযোগ্য নয়। চার্বাকদের অনুমান সম্পর্কিত মত প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যায়, "অনুমানের ফলে যে সব জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের আলোকে জ্ঞাতবিষয়ের যে ব্যবহার, তা সব সময় সার্থক হয় না। এসব ব্যবহার কখনও সার্থক হয়, কখনও বা ব্যর্থ হয়।"[৮১] অর্থাৎ চার্বাকগণ অনুমানের ক্ষেত্রে যে ভিত্তি ব্যপ্তিসম্পর্কের জ্ঞানের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিয়তা না পাওয়ায় অনুমানে বিশ্বাস করেননি।[৮২] চন্দ্রধর শর্মাও চার্বাকদের অনুমান নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি অনুমানের বৈধতার প্রসঙ্গে অবরোহাত্মক ও আরোহাত্মক অনুমান খণ্ডন নিয়ে যুক্তি প্রদান করেছেন। তিনি অবরোহাত্মক অনুমানের চক্রক দোষ চিহ্নিত করেছেন। আবার আরোহাত্মক অনুমানের ত্রুটি

প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেন, এই অনুমান কোনো প্রকার নিশ্চয়তা ছাড়াই অজানা উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়।[৮৩] তাই চার্বাকগণ মনে করেন,

> ... যাকে অনুমান প্রমাণবাদীরা হেতু ও সাধ্য বলে তাদের বেশিরভাগই আমাদের প্রত্যক্ষের আওতার বাইরে। তাই, এদের মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে কিনা, সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। ফলে তথাকথিত ব্যাপ্তিজ্ঞান সংশয়াত্মকই। সংশয় থেকে উৎপন্ন যে অনুমিতিজ্ঞান, তা সম্ভাবনামূলক। এই জ্ঞানকে নিশ্চয়াত্মক বলা চলে না।[৮৪]

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, চার্বাকরা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষণকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেছেন, সেই সাথে অনুমানকে তো স্বীকার করেননি বরং অনুমানের বিরুদ্ধে তাঁরা নানা ধরনের যুক্তি প্রদানের চেষ্টা করেছেন। প্রত্যাখ্যান করেছেন অনুমানকে।[৮৫] তাঁরা বলেছেন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ধোঁয়ার সঙ্গে অগ্নির সম্পর্কে দেখা গেলেও সবসময় তা দেখা যায় না। তাছাড়া ধোঁয়া এবং অগ্নি যখন পাশাপাশি থাকে তখন তা প্রত্যক্ষিত হলেও এদের মধ্যকার সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এছাড়াও এই সম্পর্ক যে অতীতে ছিল কিংবা ভবিষ্যতে থাকবে তাও বলা যায় না। তাঁরা আরো বলেন, ব্যাপ্তি জ্ঞানে যদি অন্য অনুমানের সাহায্য দরকার হয় তাহলে সেই জ্ঞানেও অন্য অনুমানের দরকার পড়বে, এভাবে 'অনবস্থা দোষ' দেখা দিতে পারে।[৮৬] তবে চার্বাকরা যতই অনুমানের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করুক না কোনো আমাদের দৈনন্দিন নানা সমস্যায় নানা বিষয়ে এই অনুমানের সাহায্য আমরা গ্রহণ করে থাকি। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অনুমান প্রসঙ্গে চার্বাকদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন, তুলে ধরেছেন অনুমানের গুরুত্ব।[৮৭] চার্বাকদের অনুমান অস্বীকার প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বিষয়টিকে চার্বাকদের বাড়াবাড়ি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৮৮] তিনি বলেন, "... চার্বাকগণ অনুমান মানেন না,... কিন্তু প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য থেকে মনে হয় যে, পারলৌকিক বিষয়ে অনুমানকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেও প্রত্যক্ষগোচর বা প্রত্যক্ষ অনুগামী লৌকিক অনুমান স্বীকার করায় চার্বাকদের আপত্তি ছিল না।"[৮৯] অর্থাৎ চার্বাকদের চিন্তায় স্ববিরোধিতাও লক্ষ করা যায়। দৈনন্দিন জীবনের উপযোগিতায় অনুমানের ভূমিকা তাঁরা স্বীকার করেছেন। তাই চার্বাকরা যতই অনুমানের গুরুত্বকে অসাড় প্রমাণ করার চেষ্টা করুক না কেনো, বাস্তবে অনুমানের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তাকে কখনও উপেক্ষা করে চলা যায় না। শুধু তাই নয় মানুষকে প্রতিদিনকার জীবনে এই অনুমানকে ব্যবহার করে অনেক কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়। তাছাড়া অনেকক্ষেত্রে এই অনুমানলব্ধ জ্ঞান সঠিক এবং সত্য বলে পরিগণিত হয়। আর এই অনুমানকে বাদ দিলে আমাদের জ্ঞানের জগৎও খুব সীমিত হয়ে পড়ে। মানবজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গতার

জন্য অনুমানের রয়েছে বিশাল ভূমিকা। তাই কোনোভাবেই অনুমানের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা চলে না।

জৈন দর্শনে অনুমান

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের অতি প্রাচীন একটি দর্শন জৈন দর্শন। প্রগৈতিহাসিক যুগে জৈন দর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে এই দর্শন সম্পর্কে সমালোচনা দেখতে পাওয়া যায়। এই দর্শনের প্রচারক সংখ্যা ২৪ জন তীর্থঙ্কর। এদের মধ্যে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব এবং সর্বশেষ তীর্থঙ্কর বর্ধমান। এই বর্ধমানের অন্য নাম ছিল মহাবীর। মহাবীরই জৈন দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রচারক হিসেবে স্বীকৃত। এই মহাবীরের জন্মকাল খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। মহাবীর গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলে নবলে ধারণা কারা হয়।[৯০] এই জৈন দার্শনিক সম্প্রদায় ছিল বাস্তববাদী। তাঁরা নিজ সাধনা, কর্ম এবং জ্ঞানের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। বহুত্ববাদের সমর্থক এই সম্প্রদায় ঈশ্বর এবং বেদে বিশ্বাসী ছিলেন না। জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা জৈন দর্শনে লক্ষ করা যায়।[৯১] পদার্থের যথাযথ ধারণাকেই তাঁরা জ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সন্দেহমুক্ত ধারণার মাধ্যমে এই যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় বলে তাঁরা মনে করতেন। জৈনমতে জ্ঞাতার সাথে যখন জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃত পরিচয় হয় তখন জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে থাকে।[৯২] জৈনগণ প্রত্যক্ষণ, অনুমান এবং শব্দকে প্রমাণ হিসেবে মেনেছেন। তাঁদের জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত চিন্তার প্রসার ঘটেছে এই তিনটি প্রমাণকে কেন্দ্র করে। এখন জৈনদের অনুমান সংক্রান্ত চিন্তা নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

অনুমান, যখন হেতু পদের জ্ঞান থেকে আমরা সাধ্যপদ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে থাকি তখন জ্ঞানলাভের এই প্রণালিকে অনুমান বলে। যেমন : ধোঁয়া থেকে আগুনের অনুমান করা। এখানে ধোঁয়া হেতুপদ আর আগুন সাধ্যপদ। অনুমান গঠনের ক্ষেত্রে হেতু, সাধ্য এবং পক্ষ এই তিনটি পদ থাকা আবশ্যক। অনুমান প্রমাণে আমরা কোনো জ্ঞান বা জ্ঞাত বিষয় থেকে অজ্ঞাত বা অজানা বিষয়ে অগ্রসর হই। জৈনমতে অনুমান দুই প্রকার। যথা : স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান। এখন এ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান, কর্তা বা ব্যক্তি যখন নিজের জন্য অনুমান করে থাকে তখন তাকে স্বার্থানুমান বলে। উদাহরণ হিসেবে আমি যদি বলি, আকাশ অনেক মেঘলা বৃষ্টি হতে পারে, তাহলে তা হবে স্বার্থানুমান। ব্যক্তি নিজস্বার্থে এই অনুমান করে বলে এখানে অবয়ব সংখ্যা কম থাকে। তিনটি অবয়ব দিয়েই অনুমান গঠন করা চলে। ব্যক্তির নিজস্বার্থে ব্যবহৃত হয় বলে এই অনুমান প্রকাশ করার

কোনো প্রয়োজন পড়ে না। অন্যদিকে যখন অন্যের কাছে কোনো কিছু প্রমাণ করার জন্য অনুমান প্রমাণ গঠন করা হয়ে থাকে তখন তাকে পরার্থানুমান বলে। পরার্থানুমানে যেহেতু অন্যকে বোঝানোর ব্যাপার থাকে তাই এখানে বেশি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। তাই এই অনুমানে অবয়ব সংখ্যা বেশি থাকে। কম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের জন্য যখন এই অনুমান প্রয়োগ করা তখন দৃষ্টান্তসহ তিনটি অবয়ব দিয়ে এই অনুমান গঠন করতে দেখা যায়। জৈন দর্শনে এই কম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের জন্য দশাবয়বের কথা বলা হয়েছে।[৯৩]

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায় স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান নিয়ে যে আলোচনা করেছে তা থেকে জৈনদের মতে একটু ভিন্নতা লক্ষ করা যায় বিশেষ করে পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে। জৈনরা তাঁদের পরার্থানুমান-সংক্রান্ত আলোচনায় যে বেশি বুদ্ধিসম্পন্ন এবং কম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কথা উল্লেখ করেছে তা অন্যকোনো দার্শনিক সম্প্রদায় উল্লেখ করেননি। তাছাড়া তাঁরা সর্ব্বোচ দশাবয়বের কথা উল্লেখ করেছেন যা অন্য কোনো সম্প্রদায়ের আলোচনায় নেই। তবে ন্যায় দর্শনে আমরা পাঁচ অবয়বের উল্লেখ দেখতে পাই। জৈনগণ কম বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বেশি বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন তাঁদের অনুমান-সংক্রান্ত আলোচনায় তা বাস্তবতার নিরিখে করেছেন বলে মনে হয়। কেননা দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে কম এবং বেশি বুদ্ধিসম্পন্ন লোক দেখতে পাই। সেজন্য আমরা বলতে পারি তাঁদের চিন্তার প্রায়োগিক দিকের গুরুত্বকে আমরা কোনোভাবে উপেক্ষা করতে পারি না। সেই যুগে জৈনদের এমন প্রায়োগিক ভাবনা সত্যিই অবাক করার মতো বিষয়। তাই তাঁদের আলোচনা নিঃসন্দেহে প্রসংশার দাবিদার। ফলে তাঁদের অনুমানকেন্দ্রিক জ্ঞানতাত্ত্বিক চিন্তার স্বতন্ত্রতা এবং নতুনত্বকে কোনোভাবে খাটো করে দেখা চলে না।

বৌদ্ধ দর্শনে অনুমান

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলোর বেদকেন্দ্রিক উপনিষদীয় চিন্তাধারার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণকারী অন্যতম দর্শন সম্প্রদায় হলো বৌদ্ধ দর্শন সম্প্রদায়। এই দর্শনে আমরা বহুমাত্রিক ভারতীয় চিন্তাচেতনার প্রতিফলন দেখতে পাই। মহামানব গৌতম বুদ্ধের বাণী, শিক্ষা ও উপদেশকে কেন্দ্র করে জীবন ও জগৎকেন্দ্রিক যে মতবাদ দেখতে পাওয়া যায় তাকে আমরা বৌদ্ধ দর্শন এবং বৌদ্ধধর্ম হিসেবে জানি। এই দর্শনে সন্ধান মেলে বুদ্ধ প্রচারিত জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত মত ও পথের। বেদবিরোধী এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, 'এশিয়ার আলো' হিসেবে পরিচিত মহামতি গৌতম বুদ্ধ। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের এই দর্শন ভারতবর্ষ ছাড়াও প্রায় সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি পায়। কেননা এই দর্শন মানবতাবাদী দর্শন। মহামানব বুদ্ধের জীবন, কর্ম ও চিন্তায় প্রতিফলন ঘটেছে মানবকল্যাণ। গৌতম বুদ্ধ তাঁর চিন্তার

কেন্দ্রবিন্দুতে বসিয়ে ছিলেন মানুষকে। তাঁর দার্শনিক চিন্তনে বিকশিত হয়েছে মানবতাবাদ। তাই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়,

> ভারতীয় চিন্তাধারায় মানবকেন্দ্রিক দর্শন তথা মানবতাবাদের পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায় মহামানব বুদ্ধের দর্শন ও জীবন সাধনায়। তাই তাঁর দর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জীবের মুক্তির প্রশ্নটির উপরই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ... বৌদ্ধদর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো মানুষ ও মানুষের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা, কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তার পূজার্চনা নয়।[৯৪]

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় স্বাধীন যৌক্তিক চিন্তা রয়েছে এই বৌদ্ধ দর্শনে। সক্রেটিসের মতো বুদ্ধের চিন্তাতেও জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় দেখা যায়। এই দর্শন দুঃখমুক্তির জন্য জ্ঞানলাভের ওপর জোর দেয়। তাই যথার্থ জ্ঞান অর্জনের জন্য এর প্রক্রিয়া বা উৎস জানা দরকার। বৌদ্ধ দর্শনে এ সংক্রান্ত আলোচনা দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, "বৌদ্ধ দার্শনিকগণ সম্যক জ্ঞানকে প্রমা এবং অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানকেই সম্যক জ্ঞান বলে মনে করেন। যা পূর্বে জ্ঞাত ছিল না তাকে জানিয়ে দিয়ে জ্ঞাতাকে প্রবৃত্ত কিংবা নিবৃত্ত করাই জ্ঞানের কাজ।"[৯৫] বৌদ্ধ দর্শনে আমরা দুই প্রকার প্রমাণের উল্লেখ দেখতে পাই। যথা: প্রত্যক্ষ ও অনুমান।[৯৬] এই দুই ধরনের অনুমানের জ্ঞান স্বতন্ত্র রকমের বৌদ্ধ দর্শন মতে এই দুই রকম উৎস থেকে যে জ্ঞান পাওয়া যায় সে জ্ঞান বৈধ জ্ঞান। এখন বৌদ্ধ দর্শনের অনুমান সম্পর্কে সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

অনুমান, সাধ্য ও হেতু পদের মধ্যকার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে অনুমান গঠন করা হয়ে থাকে। সামান্যলক্ষণ বিষয়কে কেন্দ্র করে অনুমানের বিষয় গঠিত হয়। নামজাত্যাদিবিশিষ্ট বিষয়কে বলা হয়ে থাকে সামান্যলক্ষণ যা স্বলক্ষণের ওপর আরোপ করলে বিষয় বা বস্তু গঠন হয়ে থাকে। শব্দগত দিক বিশ্লেষণ করলে অনুমান শব্দের অর্থ দাঁড়ায় পরবর্তী জ্ঞান। এই পরবর্তী জ্ঞান যখন পূর্ববর্তী জ্ঞানকে অনুসরণ করে যে জ্ঞান গঠিত হয় তাকে অনুমান বলে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী জ্ঞানে পক্ষহেতুর এবং হেতু ও সাধ্যের মধ্যকার ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান হয়ে থাকে। এই দুই ধরনের জ্ঞান থেকে পক্ষে সাধ্যের জ্ঞান বা অনুমিতি হয়ে থাকে।[৯৭] হেতুর এই পক্ষবৃত্তিত্বকে বলা হয়ে থাকে পক্ষধর্মতা। আর এই পক্ষধর্মতাবিশিষ্ট হেতু যখন ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয় তখন তা থেকে হেতুজন্য সাধ্যের নিশ্চয়াত্মাক জ্ঞান পাওয়া যায়। তাছাড়া বৌদ্ধ অনুমানে হেতুর তিনটি ধর্ম পরিলক্ষিত হয়। যথা: পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষে বৃত্তিত্ব এবং বিপক্ষে অবৃত্তিত্ব। এই তিনটি ধর্ম থাকলে হেতুকে নির্দোষ বলা যায়। আর নির্দোষ অনুমিতি জন্মানো সম্ভব। বৌদ্ধগণ দুইপ্রকার অনুমানের উল্লেখ করেছেন। যথা : স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান। এখন এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান, স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আশ্রয় বাক্যের দরকার পড়ে না। কেননা এই অনুমানে কর্তা বা ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থে অনুমান করা হয়ে থাকে। এই অনুমানে অন্যকে বোঝানোর কোনো দরকার পড়ে না। তাই এই জাতীয় অনুমান প্রকাশ করার দরকার পড়ে না। এই অনুমানের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, পক্ষ পদের মধ্যে অবস্থিত হেতু পদের জ্ঞানের দ্বারা সাধ্যপদের যে জ্ঞান হয় তাকে স্বার্থানুমান হিসেবে অভিহিত করা হয়।[৯৮]

অন্যদিকে পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে আশ্রয়বাক্য আবশ্যক। এই অনুমানে অন্যের নিকট কোনো কিছু বোধগম্য করে তোলার জন্য তা প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে। তাই পরার্থানুমানে কথ্য এবং লেখ্য ভাষার মাধ্যমে বচন দ্বারা প্রকাশ করতে হয়। এর এটাই হলো স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমানের প্রধান পার্থক্য।[৯৯] এই দুই প্রকার অনুমান নিয়ে বৌদ্ধদের মতের সাথে ন্যায় দর্শনের মিল লক্ষ করা যায়। তবে পার্থক্য রয়েছে অবয়ব সংখ্যা নিয়ে, বৌদ্ধরা যেখানে তিন প্রকার অবয়বের কথা বলেছেন নৈয়ায়িকগণ সেখানে পাঁচ প্রকার অবয়বের কথা বলেছেন। নৈয়ায়িকদের এই পাঁচ প্রকার বৌদ্ধগণ কর্তৃক সমালোচিত হতে দেখা যায়।[১০০]

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বৌদ্ধ দর্শনে মূলত মানুষের কল্যাণ এবং মানবতাবাদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মানুষের কল্যাণ করতে গেলে মূলত মানুষের দুঃখকে নিবৃত্তি করতে হবে। মানুষের দুঃখ নিবৃত্তি অর্থাৎ মানবজাতিকে দুঃখ থেকে কীভাবে মুক্তি দেওয়া যায় এটাই ছিল বৌদ্ধ দর্শনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। সেই সাথে এই দর্শনে প্রতিধ্বনিত হয়েছে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে যথার্থ বা প্রকৃত জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। আর এ লক্ষ্যে বৌদ্ধ দর্শনে জ্ঞান বা প্রমাণ এবং জ্ঞানের উৎস বা প্রমাণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আর এই প্রমাণের পদ্ধতি হিসেবে বৌদ্ধ দর্শনে অনুমানের যে আলোচনা পরিলক্ষিত হয় তা খুবই যৌক্তিক এবং প্রাসঙ্গিক। তাই বলা যায়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাঁদের এই প্রয়োগধর্মী আলোচনার স্বার্থকতা রয়েছে।

উপসংহার

ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা থেকে জানা যায় যে, মানবজীবনে অনুমানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অনুমানলব্ধ জ্ঞানের বহুমাত্রিকতা পর্যবেক্ষণ থেকে সন্তরকৃষ্ট (Shantaraksita) মনে করেন সত্যিকারের অনুমান কখনো কারো দ্বারা অবৈধ প্রমাণিত হতে পারে না। ধর্মকীর্তিও অনুরূপ কথা বলেছেন।[১০১] এই অনুমানলব্ধ জ্ঞানের কঠোর সমালোচনাও পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে চার্বাক সম্প্রদায় অনুমানের প্রহণযোগ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, অনুমান হলো অন্ধকারে লাফ

দেওয়া। তাঁরা অনুমানলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনবস্থাদোষের কথা বলেছেন। ধোঁয়া থেকে যখন আমরা অগ্নির অনুমান করে থাকি তখন ব্যাপ্তি জ্ঞানকে স্বীকার করতে হয় এবং একে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দ্বিতীয় অনুমান, আবার সেই অনুমানকে সমর্থন দিতে তৃতীয় অনুমানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যা অনবস্থার সৃষ্টি করে।[১০২] তবে চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য আটটি সম্প্রদায় অনুমানের অবস্থান, গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার যে বাস্তবদিক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা চলে না।

তথ্যনির্দেশ

১. এম. মতিউর রহমান, *সাবেকী ও প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা*, (ঢাকা : পুথিঘর লি:, ১৯৮৮), পৃ. ১৪৯

২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯

৩. Chandradhar Sharma, *A Critical Survey of Indian Philosophy*, (U.S.A : Barnes & Nobel, Inc., 1962), p. 120

৪. S.N. Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, Vol.1, (New York : Cambridge University Press, 1922), p.65

৫. A.C. Ewing, *The Fundamental Questions of Philosophy*, (New Delhi : Allied Publishers Ltd., 1994), p.47

৬. S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol. 2, Fifteen Impression, (New Delhi : Oxford University Press, 2006), p. 72

৭. এম. মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০

৮. সরদার ফজলুল করিম, *দর্শন কোষ*, (ঢাকা : প্যাপিরাস), পৃ. ২২৪

৯. *ভাষা পরিচ্ছেদ*, কারিকা ৬৬, নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত, (কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার)

১০. অন্নম্ভট্ট, *তর্কসংগ্রহ দীপিকাসহ*, অনুবাদ, শ্রীকানাইলাল পোদ্দার, (কলিকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৮৮), পৃ. ১২২

১১. Chandradhar Sharma, *op.cit.*, p. 185

১২. H.W.B. Joseph, *An Introduction to Logic*, Second Edition, (London : Oxford, at the Clarendon Press, 1967), p. 232

১৩. সাইয়েদ আবদুল হাই, *ভারতীয় দর্শন*, (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭), পৃ. ২৯

১৪. মো: আবদুল হালিম, *দার্শনিক প্রবন্ধাবলী : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ৮৮

১৫. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ. ১৬৬

১৬. কালী প্রসন্ন দাস, *ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা : চার্বাক ও হিউম*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ২৯

১৭. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

১৮. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬

১৯. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

২০. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

২২. K.S. Joshi, *On the Meaning of Yoga : Philosophy East And West* (Journal of Oriental and Comparative Thought), Vol. XV, No. 1, January, 1965, p. 54

২৩. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭

২৪. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

২৫. অন্নম্ভট্ট, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

২৬. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩), পৃ. ২৯৬

২৭. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

২৮. C.D. Bijlwan, *Indian Theory of Knowledge*, (New Delhi : Heritage Publishers, 1977), p. 41

২৯. S.N. Dasgupta, *op.cit.*, P. 343

৩০. S. Radhakrishnan (ed.), *History of Philosophy : Eastern and Western*, Vol. One, (London : George Allen and unwin Ltd., 1952) p. 233

৩১. S.N. Dasgupta, *op.cit.*, p. 65

৩২. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

৩৩. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

৩৪. M. Hiriyanna, *Outlines of Indian Philosophy*, (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2000), p. ২৫৪

৩৫. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

৩৭. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

৩৮. অন্নম্ভট্ট, *তর্কসংগ্রহ*, (অনুমান খন্ড, শ্লোক- ৪) শ্রীনারায়ন চন্দ্র গোস্বামী অনূদিত, (কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৩০৪

৩৯. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

৪১. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

৪৩. S.N. Dasgupta, *op.cit.*, p. 353

৪৪. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭

৪৫. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

৪৬. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

৪৭. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

৪৮. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

৪৯. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

৫০. ***বৈশেষিক সূত্র***, ৯/২/১, উপস্কার, পৃ. ৩২৬, প. ১১ মহাদেব গদাধর বাক্রে সম্পাদিত, (বোম্বে : গুজরাটী প্রিন্ট্রিং প্রেস সং, ১৯১৩)

৫১. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-২৩

৫২. ***বৈশেষিক সূত্র***, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৭, প. ১৭

৫৩. S. Radhakrishnan (ed.), *op.cit.*, p. 223

৫৪. ***প্রশস্তপাদভাষ্য***, পৃ. ৫০৮-৫০৯, গঙ্গানাথ ঝা গ্রন্থমালা নং- ১, বারানসী, ১৯৬৩

৫৫. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

৫৭. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩

৫৮. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯

৫৯. J.N. Sinha, *History of Indian Philosophy*, Vol. 1, (Calcutta : Sinha Publishing House, 1956), p. 772

৬০. S.N. Dasgupta, *op.cit.*, p. 387

৬১. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

৬২. J.N. Sinha, *op.cit.*, p 781 and S.N. Dasgupta, *op.cit.*, p. 389

৬৩. Ganganath Jha, *Indian Thought*, (Allahabad : University of Allahabad, 1911), p. 49

৬৪. সুখময় ভট্টাচার্য্য, *পূর্বমীমাংসা-দর্শন*, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৬), পৃ. ১৬৭

৬৫. দেবব্রত সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫

৬৬. সুখময় ভট্টাচার্য্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮

৬৭. দেবব্রত সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.

৬৮. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

৬৯. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮) পৃ. ৩০২

৭০. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

৭১. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৪

৭২. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

৭৩. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৬

৭৪. দেবব্রত সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৫

৭৫. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

৭৬. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৯

৭৭. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

৭৮. D.M. Datta, *The Six Ways of Knowing : A Critical Study of the Advaita Theory of Knowledge*, First MLBD Edition, (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2017), p. 171

৭৯. দেবব্রত সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩

৮০. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

৮১. দেবব্রত সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪-৫

৮২. M. Hiriyanna, *Indian Philosophy*, (London : George Allen and Unwin Ltd., 1958), p. 189

৮৩. Chandradhar Sharma, *A Critical Survey of Indian Philosophy*, (U.S.A. : Barnes & Noble Inc., 1962), p. 82 & 142

৮৪. দেবব্রত সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

৮৫. M. Hiriyanna, *Outlines of Indian Philosophy*, *op.cit.*, p. 199

৮৬. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

৮৭. S.N. Dasgupta, *op.cit.*, p. 345

৮৮. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০১০), পৃ. ৬৩-৬৪

৮৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

৯০. S.C. Chatterjee and D.M. Datta, *An Introduction to Indian Philosophy*, (Calcutta : Calcutta University, 1984), p. 164

৯১. W.M. Theodore de Bary (ed.), *Source of Indian Tradition*, Vol. 1, (New York : Columbia U.P., 1966). p. 43

৯২. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

৯৩. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

৯৪. মো: মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন : মানুষ ও সমাজ*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ৪১

৯৫. কালী প্রসন্ন দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৯৬. নীরু কুমার চাকমা, *বুদ্ধ : তাঁর ধর্ম ও দর্শন*, (ঢাকা : ফুলার রোড, ১৯৯০), পৃ. ৪৬

৯৭. দেবব্রত সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬

৯৮. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

৯৯. S.N. Dasgupta, *op.cit.*, Vol,11, p. 156

১০০. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

১০১. Chandradhar Sharma, *op.cit.*, p. 120

১০২. সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, অনুদিত, *সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা : সাহিত্যশ্রী, ২০১৯), পৃ. ৩১

পঞ্চম অধ্যায়

প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

পঞ্চম অধ্যায়

প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে মূলত প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান সম্পর্কিত আলোচনাকে কেন্দ্র করে। যদিও ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষণ ও অনুমান ছাড়াও আরো অনেক প্রমাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবুও সকল সম্প্রদায় প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণ হিসেবে মেনেছেন। তাই প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানের তুলনামূলক আলোচনা, বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের তুলনামূলক বিশ্লেষণে উভয়ের সংজ্ঞা, স্বরূপ, প্রকারভেদগত পার্থক্যের পাশাপাশি এদের মধ্যে সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য এবং সমন্বয় ও প্রয়োজনীয়তাকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো। এখন পর্যায়ক্রমে উল্লিখিত এসব বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

প্রত্যক্ষণ

ভারতীয় দর্শনের প্রায় সবকয়টি সম্প্রদায় তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণকে প্রধান ও প্রথম প্রমাণ হিসেবে মেনেছেন। ভারতীয় সকল দার্শনিক এই প্রত্যক্ষণকে 'পরা' প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মানমেয়োদয়কার নারায়ণভট্টের চিন্তায় আমরা প্রথম প্রত্যক্ষণের লক্ষণের স্বরূপ দেখতে পাই। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ থেকেই আসে আমাদের প্রত্যক্ষণ জ্ঞান। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাথে বস্তুর সরাসরি সংযোগের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে তিনি প্রত্যক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন। এই প্রত্যক্ষণলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের ভূমিকাই যে প্রধান সে কথা সকল সম্প্রদায়ের চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে। শুধুমাত্র জৈনগণ প্রত্যক্ষণকে পরোক্ষ জ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ভারতীয় দর্শনের অন্যতম বেদবিরোধী চার্বাক সম্প্রদায়ও এই প্রত্যক্ষণকে একমাত্র প্রমাণ মেনেছেন। শুধু তাই নয় চার্বাক মতে প্রত্যক্ষণই একমাত্র বৈধ জ্ঞানের উৎস। আর ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের মধ্য দিয়েই নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়। তাঁদের চিন্তায়, "প্রমাণেষু প্রত্যক্ষং শ্রেষ্ঠং"।[১] অর্থাৎ চার্বাকদের কাছে প্রত্যক্ষণ শুধু বৈধ জ্ঞানের উৎস নয় বরং শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত। চার্বাকরা প্রত্যক্ষণকে নির্ভরযোগ্য এবং নিশ্চিত প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেছেন। রাসবিহারী দত্ত এই প্রত্যক্ষ বলতে বোঝাচ্ছেন, প্রতি + অক্ষ = প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ আমাদের চোখ, কোনো প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাথে বাহ্যবস্তুর যে সম্পর্ক তাই প্রত্যক্ষণ।[২] এখানে প্রতি শব্দ দ্বারা কাছাকাছি বা সম্পর্কিত এবং অক্ষ শব্দ দ্বারা চোখকে বোঝানো হয়েছে। তাই আক্ষরিক অর্থে চক্ষুর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষণ বলা হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে চোখকেই শুধুমাত্র

এই জ্ঞানের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।[৩] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং ত্বকের সাহায্যে প্রত্যক্ষগত জ্ঞানের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। *ন্যায় বিন্দু* গ্রন্থের প্রণেতা খ্যাতনামা বৌদ্ধনৈয়ায়িক ধর্মকীর্তি প্রত্যক্ষণের স্বরূপ প্রসঙ্গে কল্পনাবিহীন ভ্রান্তিহীন বস্তুর জ্ঞানকে নির্দেশ করেছেন।[৪] প্রাচীন নৈয়ায়িক উদ্দয়ঠাকুর প্রত্যক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, "আক্ষরিক অর্থে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যা সম্পর্কিত তাকেই প্রত্যক্ষের বিষয় বলা যাবে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কোনো কিছুর সম্পর্ক বা সন্নিকর্ষ ঘটলেই তা প্রত্যক্ষ।"[৫] আবার মীমাংসা দার্শনিকরা মনে করেন আমাদের ইন্দ্রিয় যদি সুস্থ থাকে এবং ইন্দ্রিয়ের সাথে যদি বাহ্যবস্তুর সংযোগ ঘটে তাহলে প্রত্যক্ষণ অবশ্যসম্ভাবী। মীমাংসকদের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে আরো বলা যায়, "বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের এবং মনের সঙ্গে আত্মার সংযোগই প্রত্যক্ষ জ্ঞান।"[৬] *ন্যায়সূত্রে* প্রত্যক্ষণের লক্ষণ প্রসঙ্গে এভাবে বলা হয়েছে– "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞানম্যপদেশ্যমধ্যভিচারি ব্যবসায়ত্মকং প্রত্যক্ষণ"[৭] যোগ দার্শনিকগণ সরাসরি উপলব্ধিকেই প্রত্যক্ষণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁদের চিন্তা অনেকটা সাংখ্যকারদের সাথে মিলে যায়।[৮] এই প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে বৈশেষিক মত ছিল ন্যায়মতের অনুরূপ বৈশেষিক দার্শনিক প্রশস্তপাদ প্রত্যক্ষণ প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবে, "প্রত্যক্ষের উপর কোন বিষয় নির্ভরশীল হলে তার জ্ঞানই প্রত্যক্ষ।"[৯] জৈনরা প্রত্যক্ষণ প্রসঙ্গে সরাসরি বা সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভের কথা বলেছেন।[১০] যোগ দর্শনেও প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই যোগ দর্শনে প্রত্যক্ষণের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আমাদের ইন্দ্রিয় প্রণালী দ্বারা আমরা যে বাহ্য এবং মানস বিষয়ের বৃত্তি লাভ করি তাই প্রত্যক্ষণ। অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ যখন বাহ্যবস্তুর দ্বারা উপরঞ্জিত হয় তখন ইন্দ্রিয় প্রণালী থেকে আগত বিষয়ের চিত্তে এক ধরনের বৃত্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে। আর এটাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

উপরের আলোচনা থেকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায় তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় জ্ঞানের উৎস বা পদ্ধতি হিসেবে প্রত্যক্ষণকে প্রথম এবং প্রধান প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয় প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা ভারতীয় দার্শনিকদের চিন্তায় দেখতে পাই। ভারতীয় দার্শনিকদের প্রত্যক্ষণের শ্রেণিবিভাগ এবং এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধ ও গতিশীল। তাই জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসে ভারতীয় দার্শনিকদের প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনার গুরুত্ব ও মূল্য অপরিসীম।

অনুমান

ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রায় সকল সম্প্রদায় তাঁদের জ্ঞানবিদ্যক আলোচনায় জ্ঞানের উৎস বা পদ্ধতি প্রসঙ্গে অনুমানকে দ্বিতীয় প্রধান প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে চার্বাক সম্প্রদায় এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তাঁরা এই অনুমান প্রমাণকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বীকার করেননি। তাঁরা শুধু প্রত্যক্ষণকে একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সাধারণভাবে জানা বিষয়কে কেন্দ্র করে আমরা যখন অজানা কোনো বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি তখন তাকে অনুমান বলে। এই 'অনুমান' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়– অনু + মান। 'অনু' শব্দ দ্বারা পরবর্তী এবং 'মান' শব্দ দ্বারা 'জ্ঞান'-কে নির্দেশ করা হয়। তাই অনুমান শব্দ দ্বারা পরবর্তী বা পশ্চাদ্‌গামীর জ্ঞানকে বোঝানো হয়ে থাকে। তবে এই পরবর্তী বা পশ্চাৎগামী হলো মূলত প্রত্যক্ষ পরবর্তী। এই অনুমানের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে *জৈমিনিসূত্রের* প্রখ্যাত ভাষ্যকার শবরস্বামীর মত ছিল এরূপ, "প্রত্যক্ষিত কোনো বস্তু থেকে এ বস্তুর সঙ্গে স্থায়ী বা নিয়ত ঐক্য সম্পর্কে জ্ঞানের ভিত্তিতে অপ্রত্যক্ষিত কোনো বস্তুর জ্ঞানকে অনুমান বলে।"[১১]

সাংখ্য দার্শনিক প্রদত্ত সংজ্ঞার সাথে শবরস্বামীর প্রদত্ত এই সংজ্ঞার মিল লক্ষ করা যায়। আবার বাচস্পতি মিশ্রের মতে, "অনুমান হলো সেই জ্ঞান যা মধ্যপদের ভিত্তিতে সাধ্য ও পক্ষপদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল।"[১২] অর্থাৎ বাচস্পতির মতে সাধ্য ও পক্ষ পদ হতে যে জ্ঞান নিঃসৃত হয় তাই অনুমান। অনুমান প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম বলেন, "প্রত্যক্ষ পূর্বক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিশেষ জনিত যে যথার্থজ্ঞান, তাই অনুমান প্রমাণ।"[১৩] দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই অনুমান প্রসঙ্গে বলেছেন, "... ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে 'অনুমান' জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের অনুগামী- পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল।"[১৪] আরেকজন নব্যনৈয়ায়িক অন্নংভট্ট তাঁর *তর্কসংগ্রহ দিপীকাসহ* গ্রন্থে বলেন, "পরামর্শজন্যং জ্ঞানমনুমিতি।"[১৫] অর্থাৎ তিনি পরামর্শকে অনুমিতির কারণ বা অনুমান হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ববর্তী কোনো জ্ঞাত বিষয়কে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে আমরা যে জ্ঞান পাই সংক্ষেপে তাকেই অনুমান বলা যেতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষণের পরবর্তী প্রমাণ হিসেবে অনুমানকে গ্রহণ করেছেন। প্রত্যক্ষণে যে জ্ঞানগত দিকের অপূর্ণতা থাকে তা আমরা অনুমান প্রমাণের মাধ্যমে পূর্ণ করতে পারি। তাই অনুমানের প্রকারভেদ এবং বিশ্লেষণে ভারতীয় দার্শনিকদের যে আলোচনা পরিলক্ষিত হয় তার গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য উল্লেখ করা যায়, তিনি যথার্থই বলেছেন, "প্রত্যক্ষ শ্রেষ্ট প্রমাণ হলেও

দার্শনিকের কাছে অনুমানের গুরুত্ব কিছু কম নয়। বিশেষত দার্শনিক যে সব পদার্থ নিয়ে আলোচনা করেন সেগুলির অস্তিত্ব বা স্বরূপ বোঝাতে প্রত্যক্ষের চেয়ে অনুমানের উপযোগিতাই বেশি।"[১৬] শুধু ভারতীয় দর্শনে নয়, পাশ্চত্য দর্শনেও এই অনুমান সম্পর্কিত আলোচনার ব্যাখ্যা এবং গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। তাই জ্ঞানতত্ত্বের মর্যাদা এবং গ্রহণযোগ্যতায় অনুমান প্রমাণের ভূমিকা বেশ উল্লেখযোগ্য।

এখন প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানের মধ্যে সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, সমন্বয় এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষপে, আলোচনা করা হলো:

সাদৃশ্য

(১) প্রত্যক্ষণ হলো সরাসরি, চাক্ষুষ কিংবা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যা নিঃসন্দেহে মানবজীবনে বেশ প্রয়োজনীয়, কার্যকর এবং যৌক্তিক। দৈনন্দিন জীবনে বেশির ভাগ সাধারণ মানুষ এই জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে অনুমানলব্ধ জ্ঞান কোনো সরাসরি জ্ঞান না হলেও প্রত্যক্ষণলব্ধ জ্ঞানের মতো এই জ্ঞানকে সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ডে অহরহ ব্যবহার করে থাকে। ফলে বাস্তবজীবনে আমরা অনুমানের বহুবিধ ব্যবহার দেখতে পাই। আর এদিক থেকে বিবেচনা করলে আমরা প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পাই।

(২) ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত নয়টি স্কুলই প্রত্যক্ষণের আলোচনাকে প্রধান্য দিয়েছে। ভারতীয় দার্শনিকগণ ইন্দ্রিয়লব্ধ সরাসরি এই জ্ঞানকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে ভারতীয় দর্শনের চার্বাক সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য আটটি সম্প্রদায় প্রত্যক্ষণের মতো অনুমানকেও জ্ঞানের অন্যতম উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা উভয় প্রকার জ্ঞানের গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। কেননা তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মানবজীবনে এই উভয় প্রকার জ্ঞানের দরকার আছে। তাই লক্ষ্যগত দিক থেকে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

(৩) ভারতীয় দর্শনের প্রায় সকল সম্প্রদায় প্রত্যক্ষণের প্রকারভেদ চিহ্নিত করে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন: সাংখ্যা দর্শনে উপায়গত দিক থেকে লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষণ, আবার প্রকৃতিগত দিক থেকেও প্রত্যক্ষণ সবিকল্প এবং নির্বিকল্প। উভয় দিক থেকে দুই ধরনের প্রত্যক্ষণকে স্বীকার করা হয়েছে।[১৭] সাংখ্য দর্শনের মতো যোগ দর্শনও দুইপ্রকার প্রত্যক্ষণ অর্থাৎ বাহ্য ও আন্তর প্রত্যক্ষণকে স্বীকার করেছে।[১৮] ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষণের বহুবিধ শ্রেণিবিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। ন্যায় দার্শনিকগণ প্রথমত লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষণের কথা বলেছেন। তাঁরা লৌকিক প্রত্যক্ষণের আবার তিনটি ভাগ দেখিয়েছেন। যথা: নির্বিকল্প,

সবিকল্প এবং প্রত্যভিজ্ঞা। এই দর্শনে অলৌকিক প্রত্যক্ষণেরও আবার তিনটি ভাগ লক্ষ করা যায়। যথা: সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষণ, জ্ঞান লক্ষণ প্রত্যক্ষণ এবং যোগজ প্রত্যক্ষণ। বৈশেষিক দর্শন বাহ্য এবং আন্তর উভয় প্রকার প্রত্যক্ষণের কথা বলেছে। মীমাংসা দর্শনেও আমরা দুই প্রকার প্রত্যক্ষণের দেখা পাই, যথা: নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণ এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষণ। বেদান্ত দর্শনে আমরা বিভিন্ন প্রকার প্রত্যক্ষণের বিশ্লেষণ দেখতে পাই। শঙ্করাচার্য প্রত্যক্ষণগত জ্ঞানের প্রকৃতির ভিন্নতা থেকে নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষণের কথা বলেছেন। আর উপায়গত ভিন্নতার দিক থেকে ইন্দ্রিয়জাত এবং অ-ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষণের কথা বলেছেন। আবার বিষয়গত প্রকৃতির দিক থেকে তিনি বিষয়গত প্রত্যক্ষণ এবং জ্ঞানগত প্রত্যক্ষণের কথা বলেছেন।[১৯] এছাড়াও শঙ্করাচার্য জীবসাক্ষী ও ঈশ্বরসাক্ষী প্রত্যক্ষণের কথাও বলেছেন। অন্যদিকে বেদান্ত দর্শনের আরেকজন খ্যাতিমান ভাষ্যকার শ্রীরামানুজ দুইপ্রকার প্রত্যক্ষণের কথা বলেছেন। যথা: নিত্যপ্রত্যক্ষণ এবং অনিত্যপ্রত্যক্ষণ।[২০] রামানুজ এই নিত্যপ্রত্যক্ষণের আবার দুটি রূপের কথা বলেছেন যোগজ প্রত্যক্ষণ এবং অযোগজ প্রত্যক্ষণ। তবে এছাড়াও রামানুজ অন্য দার্শনিক সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যাখ্যাত নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষণকেও মেনে নিয়েছেন। চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষণের দ্বিবিধ রূপ পরিলক্ষিত হয়। যথা: নির্বিকল্প ও সবিকল্প প্রত্যক্ষণ। জৈন দর্শনও প্রত্যক্ষণের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা প্রথমত অভিজ্ঞতালব্ধ বা সাংব্যবহারিক এবং পারমার্থিক বা অতিন্দ্রিয়– এই দুই ধরনের প্রত্যক্ষণের কথা বলেছেন, পরবর্তীতে তারা সাংব্যবহারিক প্রত্যক্ষণের ইন্দ্রিয়জ এবং অনিন্দ্রিয়জ নামক দুটি রূপের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি পারমার্থিক প্রত্যক্ষণের আবার দুটি ভাগের কথা বলেছেন।[২১] যথা: পূর্ণাঙ্গ এবং অপূর্ণাঙ্গ পারমার্থিক প্রত্যক্ষণ। সর্বশেষ বৌদ্ধ দর্শনেও আমরা চার প্রকার প্রত্যক্ষণের শ্রেণিবিভাগ দেখতে পাই। এই শ্রেণিবিভাগ বৌদ্ধ দার্শনিকগণ উপায়গত দিক থেকে দেখিয়েছেন। বৌদ্ধ দর্শনে ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ, মনোবিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ, আত্মসংবেদন প্রত্যক্ষণ এবং যোগীজ্ঞান প্রত্যক্ষণ– এই চার প্রকার প্রত্যক্ষণের উল্লেখ আমরা দেখতে পাই।

অন্যদিকে ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত আটটি সম্প্রদায় অনুমানের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। শুধুমাত্র চার্বাক সম্প্রদায় অনুমানের বিরোধিতা করেছেন। সাংখ্য দর্শনে মূলত তিন ধরনের অনুমানের আলেচনা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত: বীত ও অবীত অনুমান। বাচস্পতি মিশ্র এই বীত অনুমানকে আরো দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা: পূর্ববৎ এবং

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। সাংখ্য দর্শনের অনুরূপ প্রকারভেদের কথা যোগ দর্শনেও বলা হয়েছে।[২২] ন্যায় দর্শনে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমানের শ্রেণিবিভাগ দেখানো হয়েছে। এই দর্শনে অনুমানের আটটি শ্রেণির উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান এবং ব্যাপ্তি সম্পর্কের প্রকৃতিগত ভিত্তিকে কেন্দ্র করে পূর্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানের কথা বলা হয়েছে।[২৩] বৈশেষিক দর্শনেও আমরা আট প্রকার অনুমান দেখতে পাই। যথা: স্বার্থানুমান, পরার্থানুমান, পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান এবং কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতরেকী অনুমান। মীমাংসা দর্শনে অনুমানের ব্যাখ্যায় দুটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। আর এর ওপর ভিত্তি করে চারটি শ্রেণিবিভাগ পাওয়া যায়। বিষয়বস্তুর প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে দুটি শ্রেণি পাওয়া যায়। যথা: প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান এবং সামান্যতোদৃষ্ট সম্বন্ধ অনুমান। আর অনুমানকারী কর্তার উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে মীমাংসকগণ স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান নামক অনুমানের শ্রেণি বিভাজন দেখিয়েছেন।[২৪] বেদান্ত দর্শনে আচার্য শঙ্করের চিন্তাতে স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমানের উল্লেখ রয়েছে। ভারতীয় দর্শনের অন্যতম বেদবিরোধী সম্প্রদায় চার্বাকগণ অনুমানকে প্রমাণকে হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে জৈনমতে আমরা দুই প্রকার অনুমানের উল্লেখ দেখতে পাই। যথা: স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ জৈনদের মতো স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমানকে গ্রহণ করেছেন। অনুমানের এই বিভিন্ন প্রকারভেদগত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানের মধ্যে এদিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা প্রত্যক্ষণের বিস্তারিত বিশ্লেষণে আমরা যেমন বহু শ্রেণিবিভাগ দেখতে পাই তেমনি অনুমানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণেও আমরা বহু শ্রেণিবিভাগ দেখতে পাই। আর এ সকল উভয় শ্রেণিবিভাগের লক্ষ্য হলো মানুষের জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা। আর এদিক থেকে বিচার করলে এদের মধ্যে বড়ো ধরনের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

(৪) প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের স্বরূপ, প্রকৃতি, প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বৈশেষিক মত বা আলোচনার সাথে ন্যায় দার্শনিকদের মতের অনেক মিল বা সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় দর্শন সম্প্রদায় প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের বিভিন্ন আঙ্গিকের বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁরা ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন।

(৫) সাংখ্য দর্শনে প্রত্যক্ষণ ও অনুমান সম্পর্কিত যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আমরা দেখি তার একটি পদ্ধতিগত ও ব্যবহারিক দিকের প্রতিফলন আমরা দেখি যোগ দর্শনে। অর্থাৎ এই দুই দর্শনের প্রত্যক্ষণ ও অনুমান সংক্রান্ত আলোচনা যেন একত্রিত হয়ে পূর্ণতা পেয়েছে। কেননা তত্ত্বগত এবং প্রায়োগিক দিকের সম্মিলন ঘটেছে দুই সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণের সম্মিলিত আলোচনায়। তাই এদিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, প্রত্যক্ষণ ও অনুমান সংক্রান্ত আলোচনায় উভয় দর্শনের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে।

(৬) ভারতীয় দর্শনে প্রত্যক্ষণের প্রকার বা ধরন অনুযায়ী একে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।[২৫] প্রথম প্রকারে নির্বিকল্পকে একমাত্র প্রত্যক্ষণ হিসেবে স্বীকার করে, সবিকল্পকে অস্বীকার করা হয়েছে। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এই মতের অগ্রদূত। দ্বিতীয় প্রকারে আবার সবিকল্প ও নির্বিকল্প উভয়ের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। নৈয়ায়িকগণসহ বেশির ভাগ দার্শনিক এই মতে বিশ্বাসী। তৃতীয় প্রকারে শুধুমাত্র সবিকল্পকে প্রত্যক্ষণের ধরন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চার্বাক সম্প্রদায়, বেদান্ত দর্শনের মাধব ও বল্লবগোত্র তৃতীয় প্রকার মতে বিশ্বাসী।[২৬] অন্যদিকে অনুমান প্রমাণের ক্ষেত্রেও এরূপ প্রকার বা ধরন লক্ষ করা যায়। আর এদিক থেকে প্রত্যক্ষণ ও অনুমান প্রমাণের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে।

(৭) প্রত্যক্ষণগত জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ বা প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা ও উপাদান নিয়ে ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ বিষয়ে দার্শনিকগণ তিনটি শ্রেণিভুক্ত।[২৭] যেমন: বৌদ্ধ দার্শনিকগণ মনে করেন ইন্দ্রিয় হলো এক ধরনের অঙ্গ। ইন্দ্রিয় বলতে তাঁরা চোখ, কান, নাক ইত্যাদি নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা দৃশ্যমান বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করেছেন। আবার মীমাংসা দার্শনিকদের মতে ইন্দ্রিয় কোনো অঙ্গ নয়, বরং এটি হলো অঙ্গের এক ধরনের স্বতন্ত্র শক্তি। তৃতীয় পক্ষ উল্লিখিত মতের কোনোটিকে সমর্থন করেননি। তাঁরা বলেছেন ইন্দ্রিয় হলো এক প্রকার স্বতন্ত্র দ্রব্য। চার্বাক সম্প্রদায় এই পক্ষের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাঁরা এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। চার্বাকরা মনে করতেন ইন্দ্রিয় মাটি, পানি, আগুন ও বায়ু– এই চতুর্ভূত দ্বারা গঠিত।

অন্যদিকে অনুমানলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন প্রকার অনুমানের অবয়ব নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ দেখতে পাই। যেমন: পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে ন্যায় দার্শনিকদের মতের সাথে মীমাংসা সম্প্রদায়ের মতের পার্থক্য দেখা যায়। নৈয়ায়িকগণ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমান– এই পাঁচ প্রকার অবয়বকে স্বীকার করেছেন।

অন্যদিকে মীমাংসা দার্শনিক কুমারিল ভট্টের মতে নৈয়ায়িকগণ উল্লিখিত পাঁচটি অবয়বকে অনাবশ্যক বলে মনে করেন। কুমারিলের মতে, প্রথম তিনটি কিংবা শেষ তিনটি অবয়বই যথেষ্ট। এখানে তিনি একদিকে প্রতিজ্ঞা ও নিগমনকে সমর্থক ভেবেছেন এবং অন্যদিকে হেতু ও উপনয়কে তিনি সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবার অনুমানের ব্যাপ্তিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমরা পার্থক্য দেখতে পাই। চার্বাকগণ ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অপ্রতিষ্ঠিত হিসেবে চিহ্নিত করলেও বৌদ্ধগণ তা বিরোধিতা করেছেন। বৌদ্ধদের মতে, কার্যকারণ ও স্বভাব বা তদাত্ম্যের দ্বারা ব্যাপ্তিসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের উল্লিখিত বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ থেকে সহজেই বলা যায় উভয় প্রকার প্রমাণের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে।

(৮) ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায় তাঁদের জ্ঞানবিদ্যক আলোচনায় প্রত্যক্ষণকে প্রথম স্থানে রেখেছেন। প্রচলিত নয়টি সম্প্রদায়ের কোনো সম্প্রদায় কিন্তু অনুমানকে প্রথম স্থান দেননি। সকল সম্প্রদায় যেন অনুমানের জন্য দ্বিতীয় স্থান বরাদ্দ রেখেছেন। শুধুমাত্র চার্বাকগণ অনুমানকে মানেননি, তবে তাঁরা প্রত্যক্ষণকে প্রথম স্থানে রেখেছেন। বলাবাহুল্য যে তাঁরা এই একটিমাত্র প্রমাণকেই মেনেছেন। তাই আমরা বলতে পারি ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় প্রত্যক্ষণ ও অনুমানকে যথাক্রমে যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রেখেছেন তার মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত। কেননা সকল সম্প্রদায় এই একই নীতি অবলম্বন করেছেন যা তাঁদের আলোচনার সাদৃশ্যকেই তুলে ধরে।

(৯) আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যখন কোনো বিষয় বা বস্তুর সরাসরি সন্নিকর্ষ বা সংযোগের ফলে উৎপন্ন অশব্দ, অভ্রান্ত ও সুনিশ্চিত জ্ঞানই হলো প্রত্যক্ষণজাত জ্ঞান। অন্যদিকে অনুমান হলো একটি মানসিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা জ্ঞাত সত্য থেকে অজ্ঞাত সত্যের জ্ঞান লাভ করে থাকি।

(১০) পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত অনুমানের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় ন্যায় দর্শন এবং বেদান্ত দর্শনে অনুমানের সংজ্ঞা নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই।

বৈসাদৃশ্য

উপরের আলোচনায় আমরা বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের আলোচনাকৃত প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের মধ্যকার সাদৃশ্যসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এখন প্রত্যক্ষণ ও অনুমান সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে পরিলক্ষিত বৈসাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. ভারতীয় সকল দার্শনিক সম্প্রদায় তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রত্যক্ষণকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেছেন। তবে প্রত্যক্ষণের সংজ্ঞাকে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। এই মতপার্থক্য বা বিরোধকে মোটা দাগে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায়।[২৮] প্রথমত, প্রত্যক্ষণকে এখানে স্বতন্ত্র (স্বলক্ষণ) বিশেষের অভ্রান্ত জ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই মতকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন বৌদ্ধ দার্শনিকগণ। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ মনে করেন যার সাহায্যে আমরা সাধারণত বিশেষের ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে থাকি, তা আসলে প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয় নয়। এসব হলো কল্পনাজাত বিষয়। দ্বিতীয়ত, জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটার ফলে আমাদের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সে জ্ঞানই প্রত্যক্ষণ। ন্যায় দার্শনিক মহর্ষি গৌতম, বৈশেষিক দার্শনিক মহর্ষি কণাদ, মীমাংসা দর্শনের খ্যাতনামা ভাষ্যকার কুমারিলসহ অনেক দার্শনিকই এই মতে বিশ্বাসী। তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষণজাত বিষয়কে বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত সরাসরি বা সাক্ষাৎ জ্ঞান। এই মতে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ হলেন– অদ্বৈত বেদান্তি, প্রভাকর মীমাংসা, নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ এবং চার্বাকগণ। এ সকল দার্শনিকগণ মনে করে দ্বিতীয় প্রকার মতকে যদি আমরা মেনে নিয়ে ইন্দ্রিয়ের সাথে জ্ঞেয় বস্তুর সংযোগকে আমরা প্রত্যক্ষণ বলি তাহলে স্মৃতিও প্রত্যক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু তৃতীয় প্রকার দার্শনিকগণ স্মৃতিকে প্রত্যক্ষণের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে চান না। ন্যায় এবং মীমাংসা দর্শনের আলোচনায়ও প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনায় মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অনুমান প্রমাণের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চিন্তার মধ্যেও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।[২৯]

২. প্রত্যক্ষণ হলো সরাসরি, চাক্ষুষ কিংবা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালিকে বেশ প্রভাবিত করেছে। বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় এই জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল।

   অন্যদিকে অনুমান কোনো সরাসরি জ্ঞান নয়। অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও এই জ্ঞান পাওয়া যায় না। তবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারায় এই অনুমানলব্ধ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না।

৩. প্রত্যক্ষণ হলো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান। এই জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু অনুমানলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো সুযোগ নেই। বিষয়টি আমরা আমাদের দৈহিক এবং মানসিক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। প্রত্যক্ষণজাত জ্ঞান সরাসরি আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা শরীরবৃত্তির সাথে জড়িত, অন্যদিকে অনুমানলব্ধ জ্ঞান আমাদের মানসবৃত্তি বা মানসিক অবস্থার সাথে জড়িত। তাই আমরা প্রত্যক্ষণ ও

অনুমানকে যথাক্রমে আমাদের শরীর ও মনের সাথে তুলনা করতে পারি। আর পূর্ণাঙ্গ বা পরিপূর্ণ জ্ঞানের জন্য একটি অন্যটির পরিপূরক একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

৪. ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের মধ্যে একটি অন্যতম পার্থক্য হলো সকল দার্শনিক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষণকে প্রথম এবং প্রধান প্রমাণ হিসেবে মেনেছেন, আর অনুমানকে মেনেছেন দ্বিতীয় প্রমাণ হিসেবে। শুধু তাই নয়, সাংখ্য, ন্যায় এবং যোগ দর্শনে অনুমান এবং শব্দপ্রমাণ থেকে প্রত্যক্ষণকে বেশি শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।[৩০]

৫. ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে বলা হয়েছে সরাসরি জ্ঞান। আর অনুমানের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে বলা হয়েছে পরোক্ষ জ্ঞান। তবে জৈনরা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্য সকল সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে পরোক্ষ জ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেছেন।

৬. ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান বিপরীতধর্মী জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিবেচিত। এই প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানের অভ্যন্তরস্থ বেশ কিছু বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এখন তা উল্লেখ করা হলো: মীমাংসা দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনায় আটটি প্রকারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা : নির্বিকল্প, সবিকল্প, ইন্দ্রিয়জাত, অইন্দ্রিয়জাত, বিষয়গত ও জ্ঞানগত, জীবসাক্ষী ও ঈশ্বরসাক্ষী। প্রত্যক্ষণের প্রকার নিয়ে এটি সংখ্যায় সর্বাধিক। প্রত্যক্ষণের প্রকার নিয়ে অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ও ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার কথা বলেছেন। ভারতীয় জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস অনুমানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ হিসেবে আমরা মীমাংসা দর্শনের কথা বলতে পারি, এখানে প্রভাকর মিশ্র শবরস্বামী প্রদত্ত অনুমানের সংজ্ঞার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাছাড়া এই দর্শনে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চার প্রকার অনুমানের কথা বলা হয়েছে। যথা : প্রত্যক্ষতোদৃষ্ট সম্বন্ধ, সামান্যতোদৃষ্ট সম্বন্ধ, স্বার্থ ও পরার্থ অনুমান। অদ্বৈতবেদান্তে আবার শুধুমাত্র দুই প্রকার অনুমানকে স্বীকার করা হয়েছে। যথা: স্বার্থ ও পরার্থ অনুমান। মীমাংসা দর্শনেও আমরা বেদান্তে উল্লিখিত অনুমানের সাদৃশ্য দেখি, তবে প্রকারভেদগত পার্থক্য রয়েছে।

৭. বৌদ্ধ দর্শনে আমরা দেখি যে প্রত্যক্ষণলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নির্বিকল্প প্রত্যক্ষণের জ্ঞানকে বৈধ জ্ঞান বলা হয়েছে, জৈন দর্শনে সেখানে সবিকল্প প্রত্যক্ষণের জ্ঞানকে বৈধ জ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৩১]

৮. বৌদ্ধ দার্শনিকগণের পরার্থানুমানের সাথে নৈয়ায়িকদের পরার্থানুমানের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধদের পরার্থানুমান তিন প্রকার অবয়ব নিয়ে গঠিত। যথা: সিদ্ধান্ত, পক্ষপদ ও সাধ্যপদ।

অন্যদিকে ন্যায় দার্শনিকগণ পাঁচ প্রকার অবয়বের কথা বলেছেন যা বৌদ্ধগণ সমালোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা যায়, "... মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনে ত্রি-অবয়বী স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান, বৌদ্ধ দর্শনে ত্রি-অবয়বী পরার্থানুমান এবং জৈন দর্শনে দ্বি-অবয়বী, ত্রি-অবয়বী ও দশাবয়বী পরার্থানুমান স্বীকার করা হয়েছে।"[৩২]

৯. ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষণের আলোচনায় ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয় বা বস্তুর সন্নিকর্ষকে 'সংযোগ' সম্বন্ধ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু বেদান্ত দর্শনে অন্তঃকরণের পরিমাণজনিত প্রত্যক্ষণবৃত্তিকে 'সংযোগ' সম্বন্ধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যান্য সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও ন্যায় ও বেদান্তের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য সকল সম্বন্ধের ক্ষেত্রে 'সমবায়' শব্দটি ব্যবহার করেছে, কিন্তু এক্ষেত্রে বেদান্ত দর্শন 'তাদাত্ম্য' শব্দটি গ্রহণ করেছেন।[৩৩] এছাড়া নৈয়ায়িকরা যোগজ প্রত্যক্ষণের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন অদ্বৈত বেদান্তীরা তা প্রত্যাখান করেছেন। জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষণ নিয়ে নৈয়িয়িক এবং বেদান্ত মতে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। নৈয়ায়িকরা মনে করেন, জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষণের কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অধ্যাস দেখা যায়। অন্যদিকে বৈদান্তিকেরা জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষণকে অস্বীকার করেছেন।[৩৪] অনুমান প্রমাণ নিয়েও উভয় দর্শনের মধ্যে সংজ্ঞাগত সাদৃশ্য থাকলেও অনুমানের কারণ, প্রকারভেদ, পরার্থানুমানের অবয়ব প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সমন্বয় ও প্রয়োজনীয়তা

আলোচ্য অধ্যায়ের তুলনামূলক আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি জ্ঞানের ক্ষেত্রে শুধু প্রত্যক্ষণ কিংবা শুধু অনুমান থেকে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান পাওয়া কোনোভাবে সম্ভব নয়। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রত্যক্ষণ ও অনুমান যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। উল্লেখ্য যে, কোনো মুদ্রার ক্ষেত্রে দুটি পিঠ আবশ্যক। আর এ দুটো পিঠ মিলেই মুদ্রা হয়। কোন একটি পিঠ বা এক পাশ দিয়ে কখনো মুদ্রা হয় না, তেমনি শুধু প্রত্যক্ষণ কিংবা শুধু অনুমান দিয়ে জ্ঞান হবে না।

অনুমান কোনো সরাসরি জ্ঞান নয় কিন্তু পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান আমরা শুধু প্রত্যক্ষণ থেকে পেতে পারি না। পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের জন্য আমাদেরকে প্রত্যক্ষণের বাইরে অনুসন্ধান করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে সবার আগে আমাদের সামনে আসে অনুমান প্রমাণ। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায় এই অনুমানকে জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে। এই অনুমানের মাধ্যমে প্রকল্প, কল্পনা, পরিকল্পনা এবং মানসচক্ষু তথা তৃতীয় চক্ষুর মাধ্যমে বড়ো বড়ো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যা মানবসভ্যতার জন্য এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। তাই অনুমানকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা চলে না। শুধু তাই নয়

ছোটোখাট বিষয়েও আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনুমানের বহুল ব্যবহার করে থাকি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়: ধরা যাক, আমরা কোনো বাচ্চার পোশাক কিনতে গেলাম কিন্তু বাচ্চাটি আমদের সাথে নেই। তখন পূর্বে দেখা বাচ্চা এবং তার পোশাকের সাথে সাদৃশ্য করে পোশাকের সাইজ, রং ইত্যাদি আমরা অনুমান করি। তারপর পোশাকটি কিনি। আবার বাস্তবজীবনের অনেক ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহার বন্ধ রেখে আমরা চোখ, কিংবা হাত দ্বারা ইশারা করে অনেক কাজ সম্পন্ন করি, এই ইশারাও এক ধরনের অনুমান। তাছাড়া জ্ঞানের আরো কিছু অন্যান্য উৎস যেমন: শব্দ, উপমান প্রভৃতিকে অনেক সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ অনুমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

তবে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানের মধ্যে ভারতীয় দার্শনিকগণ শুধু পার্থক্যকে নির্দেশ করেননি, সাদৃশ্যও দেখিয়েছেন। যেমন: প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের স্বরূপ, প্রকৃতি এবং প্রকারভেদ সম্পর্কে বৈশেষিক মতের সাথে ন্যায়মতের অনেক সাদৃশ্য বা মিল পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, সাংখ্য ও যোগ দর্শনেও এরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রত্যক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান আমাদের জীবনযাত্রা প্রণালির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এদিক থেকে বিবেচনা করলে প্রত্যক্ষণ প্রমাণের স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে। তবে প্রত্যক্ষণ বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সবসময় যে শতভাগ সঠিক হবে তা ঠিক নয়। কেননা প্রত্যক্ষণ কিংবা অভিজ্ঞতায়ও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন: দূর আকাশে উড্ডয়মান উড়োজাহাজকে ছোটো অর্থাৎ পাখির মতো দেখা গেলেও বাস্তবে তা পাখির তুলনায় বিশাল। অবার কখনো অস্পষ্ট আলোতে রশি বা দড়ি দেখেও সাপ মনে হয়। তেমনি অনুমানের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানও সবসময় সত্য হয় না, মিথ্যাও হতে পারে। যেমন: দূরের পাহাড়ে ধোঁয়া উড়তে দেখে যখন আমরা মনে করি ঐ পাহাড়ে আগুন লেগেছে কিন্তু বাস্তবে ঐ পাহাড়ের কাছে গিয়ে দেখা গেল কোনো আগুন নেই। কুয়াশার কারণে এমনটি দেখা যাচ্ছে। তবে একথা সত্য যে, "দৈনন্দিন জীবনে অনেক সময় অনুমানের মাধ্যমে সফল কার্য সম্পাদন সম্ভব হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে অনুমান সত্য বা যথার্থ বলেও প্রমাণিত হয়।"[৩৫]

মোটকথা প্রত্যক্ষণ ও অনুমান মিলে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান হয়। আমাদের শারীরিক (ইন্দ্রিয়জাত) এবং মানসিক (অনুমানলব্ধ) বিষয়সমূহের সম্মিলন ঘটে এই প্রত্যক্ষণ ও অনুমানে। তাই বলা যায় প্রত্যক্ষণের দ্বারা যে জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়, অনুমানের মাধ্যমে সে জ্ঞান সম্ভব। বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনা অনুমানেরই অংশ, আর এগুলো ছাড়া কোনো বড়ো ধরনের গবেষণা সম্ভব নয়। অনুমানলব্ধ জ্ঞানকে ব্যবহার করে বড়ো বড়ো ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাক্‌কল্পনাগত বিষয়ে ধারণা লাভ করা হয়। অর্থাৎ পরিপূর্ণ জ্ঞানের জন্য প্রত্যক্ষণ ও অনুমান উভয়ের ভূমিকা কার্যকরী এবং গুরুত্বপূর্ণ। তাই

মানবকল্যাণমুখী সমাজ গঠন করতে চাইলে প্রত্যক্ষণগত জ্ঞানের পাশাপাশি অনুমানগত জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই।

উপরে ব্যাখ্যাত এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য ও মিল রয়েছে। প্রত্যক্ষণের সংজ্ঞা, স্বরূপ, প্রকৃতি ও প্রকারভেদ নিয়ে এক সম্প্রদায়ের সাথে অন্য সম্প্রদায়ের যেমন সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি এক সম্প্রদায়গত দার্শনিকদের মধ্যেও রয়েছে মতভেদ। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের আরেকটি অন্যতম আলোচিত বিষয় অনুমান সম্পর্কেও প্রায় অনুরূপ কথা বলা চলে। কেননা উপরের আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি যে অনুমানে প্রমাণের রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ। এই শ্রেণিবিভাগের আলোচনায় এক সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের সাথে অন্য সম্প্রদায়ের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো সম্প্রদায় দুই প্রকার আবার কোনো কোনো সম্প্রদায় তিন প্রকার কিংবা পাঁচ প্রকার অনুমানের কথা বলেছেন। এই অনুমানলব্ধ আলোচনার ক্ষেত্রেও একই সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের মধ্যে বিরুদ্ধ মত পরিলক্ষিত হয়। সংজ্ঞাগত সূক্ষ্ম পার্থক্যও রয়েছে। তবে অনুমান সংক্রান্ত আলোচনায় একই সম্প্রদায় এবং অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের বেশ সাদৃশ্যও পরিলক্ষিত যা এই অধ্যায়ের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয় প্রকার প্রমাণ যথাক্রমে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানকে ভারতীয় দর্শনের প্রায় সকল সম্প্রদায় নির্বিচারে মেনে নিয়েছেন। ভারতীয় দার্শনিকগণ বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে পরিপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের ক্ষেত্রে শুধু প্রত্যক্ষণ কিংবা শুধু অনুমান যথেষ্ট নয় বরং উভয়ের সম্মিলনে মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের কল্যাণ, শ্রেষ্ঠত্ব এবং মানবসভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। তাই তাঁরা তাঁদের দার্শনিক আলোচনায় জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাকে এত বেশি প্রধান্য দিয়েছিলেন। আর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে জ্ঞানের অন্যতম উৎস হিসেবে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানকে সমান্তরালভাবে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। তাই পরিশেষে আমরা বলতে পারি, তাঁদের বিশ্লেষিত প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান মানবজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত– একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. রাসবিহারী দত্ত, *ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ খণ্ডণ*, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ৭০০০১৩), পৃ. ২২৭

২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১

৩. কালী প্রসন্ন দাস, *ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা : চার্বাক ও হিউম*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ৬১

৪. J.N. Sinha, *History of Indian Philosophy*, Vol. 1, (Calcutta : Sinha Publishing House, 1956), p. 414

৫. কালী প্রসন্ন দাস, *ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা : চার্বাক ও হিউম*, (ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৩), পৃ. ৪৭ (উদ্দয় ঠাকুর, *ন্যায়বার্ত্তিক*, (কলকাতা : বিবলিওথিকা ইন্ডিকা, ১৮৮৭), ১.১.৪)

৬. সাইয়েদ আবদুল হাই, *ভারতীয় দর্শন*, (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭), পৃ. ১০৯

৭. লতিকা চট্টোপাধ্যায়, *চার্বক দর্শন*, (কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৮), পৃ. ৭০

৮. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

৯. C.D. Bijlwan, *Indian Theory of Knowledge*, (New Delhi : Heritage Publishers, 1977), p. 67

১০. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

১১. J.N. Sinha, *op.cit.*, p. 777 এবং S.N. Dasgupta, *A History of Indian Philosphy*, Vol. 1 (New York : Cambridge University Press, 1969) , p. 378,

১২. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

১৩. শ্রী ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, *ন্যায় - পরিচয়*, (কলকাতা : জাতীয় শিক্ষা পরির্ষৎ, ১৩৪৭), পৃ. ১৬০

১৪. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০১০), পৃ. ৫৯

১৫. অন্নম্ভট্ট, *তর্কসংগ্রহ দীপিকাসহ*, অনুবাদ, শ্রীকানাইলাল পোদ্দার, (কলকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৮৮), পৃ. ১২২

১৬. মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শনে তত্ত্ববিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্ব*, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৯), পৃ. ৫২

১৭. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

১৮. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

১৯. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

২০. সাইয়েদ আবদুল হাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯

২১. দেবব্রত সেন, *ভারতীয় দর্শন*, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯২), পৃ. ৩

২২. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

২৫. C.D. Bijlwan, *op.cit.*, p. 114

২৬. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

২৭. D.M. Datta, *The Six Ways of Knowing : A Critical Study of the Advaiea Theory of Knowledge*, (Calcutta : Calcutta University Press, 1960), p. 39-40

২৮. C.D. Bijlwan, *op.cit.*, p. 114

২৯. S. N. Dasgupta, *op.cit.*, pp. 375-376

৩০. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

৩১. J.N. Sinha, *op.cit.*, p 184

৩২. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

৩৩. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮) পৃ. ৩৮১
৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৩
৩৫. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনুমান ও প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মতের তুলনামূলক আলোচনা

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনুমান ও প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মতের তুলনামূলক আলোচনা

ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এখানে দর্শন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে স্বমহিমায় বিরাজমান ছিল। ভারতবর্ষের অন্য সর্বপ্রকার বিদ্যা অনুপ্রেরণা ও সমর্থন পেয়েছে দর্শনের কাছ থেকে। এ প্রসঙ্গে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায়,

> In India philosophy stood on its own legs, and all other studies looked to it for inspiration and support. It is the master science guiding other sciences, without which they tend to become empty and foolish.[১]

ভারতীয় দর্শনের সাথে মানবজীবনের একটি সুগভীর সম্পর্কে পরিলক্ষিত হয়। এই দর্শন শুধু তত্ত্বালোচনা করে ক্ষান্ত হয়নি, এই তত্ত্বকে মানবজীবনে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তার প্রায়োগিক দিকনির্দেশনা ছিল ভারতীয় দর্শনের মুখ্য বিষয়। কেননা তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ছাড়া তত্ত্ব যে মূল্যহীন একথা ভারতীয় দার্শনিকগণ ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছেন। আর এই কারণে ভারতীয় দর্শন তৎকালীন সমাজব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে তারকচন্দ্র রায়ের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "ভারতীয় সমাজের একটি বিশেষত্ব এই যে, ভারতের সর্বোচ্চ দার্শনিক চিন্তা জন সমাজে বিস্তৃত হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভগবদ্‌গীতা ও পুরাণের মাধ্যমে দর্শনের শিক্ষা ন্যূনাধিক সমাজের সর্বস্তরে প্রচারিত হইয়াছিল।"[২] এই ভারতীয় দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা। শুধু তাই নয় ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যক আলোচনার বিস্তৃতি এবং সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা এই দর্শনকে সুউচ্চে স্থান দিয়েছে। যথার্থ জ্ঞানের উৎপত্তি এবং গ্রহণযোগ্যতা ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্থান লাভ করেছে। আর জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণের ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়।

অন্যদিকে, পাশ্চাত্যদর্শনেও জ্ঞানবিদ্যক আলোচনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা লাভ করেছে। পাশ্চাত্যদর্শনে আমরা জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা প্রথমে দেখতে পাই সোফিস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে। এরপর সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্লেটোর *Theatetus* এবং *Republic* গ্রন্থে জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়। প্রাচীন জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে *Theatetus* একটি অসামান্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। আবার রবার্ট অ্যাকারম্যানের মতে,

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার সূত্রপাত প্লেটো ও এরিস্টটলের হাতে।[৩] তবে আধুনিককালের পাশ্চাত্যদর্শনে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা একদিকে যেমন বিস্তৃতি লাভ করেছে অন্যদিকে তেমনি গভীরতা লাভ করেছে। বৃটিশ দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪) এ বিষয়ে প্রধান কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। জন লক তাঁর *An Essay Concerning Human Understanding* গ্রন্থে 'জ্ঞানবিদ্যাকে' দার্শনিক আলোচনার প্রাথম ও প্রধান বিষয় হিসেবে ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয় লক জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনাকে দর্শনে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। লক পরবর্তী অপর দুই ব্রিটিশ দার্শনিক বিশপ বার্কলি (১৬৮৫-১৭৫৩) ও ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) ও ফিখটে (১৭৬২-১৮১৪) এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কান্ট তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *Critique of Pure Reason* -এ জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। কান্ট জ্ঞানবিদ্যক আলোচনাকে দর্শন আলোচনার প্রাথমিক বিষয় হিসেবে অভিহিত করেন। পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় আমরা দেখতে পাই বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ এবং বিচারবাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং সাড়া জাগানো মতবাদ। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান প্রমাণের সাথে এই বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্যদর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যেসব দার্শনিক জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা করেননি। বিশেষ করে প্লেটো পূর্ব দার্শনিকদের মধ্যে বিশ্বতত্ত্বের আলোচনাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। সোফিস্টরাই প্রথম জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন।[৪] এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, "... দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে মর্যাদালাভের জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যাকে ... সোফিস্টদের কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে যা ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে করতে হয়নি।"[৫] অর্থাৎ পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান শব্দটির ব্যবহার ব্যাপক এবং বিস্তৃত। এই দর্শনে জ্ঞান বলতে প্রমা, সংশয়, ভ্রম, অনুভব এবং স্মৃতিকে বোঝানো হয়েছে। পাশ্চাত্যদর্শনে কিন্তু জ্ঞান বলতে সত্যজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। আর জ্ঞানের যথার্থতা বা নিশ্চয়তা নিয়ে কোনো ধরনের সমস্যা পাশ্চাত্যদর্শনে পরিলক্ষিত হয় না। এখন ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের অনুমান ও প্রত্যক্ষণের সঙ্গে পাশ্চাত্যমতের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনা উপস্থাপন করা হলো:

সাদৃশ্যগত তুলনা

১. ভারতীয় ন্যায় দর্শনে জ্ঞানকে ত্রি-ক্ষণস্থায়ী বলা হয়েছে। এই দর্শনে বলা হয়েছে প্রথম ক্ষণের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে তা দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি অবস্থা লাভ করে এবং তৃতীয় ক্ষণে এসে এই

জ্ঞানের বিনাশ ঘটে। অর্থাৎ ন্যায়মত পর্যালোচনা করলে এখানে স্পষ্টত পরিবর্তনবাদের ঈঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগের পাশ্চাত্য দর্শনে হিরাক্লিটাসের চিন্তায় আমরা এই পরিবর্তনবাদের উল্লেখ দেখতে পাই। হিরাক্লিটাস পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সত্তা ও সত্যের পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছিলেন।[৬] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সত্তা এবং জ্ঞানের পরিবর্তনশীলতার ক্ষেত্রে ন্যায়মতের সাথে হিরাক্লিটাসের চিন্তার সাদৃশ্য রয়েছে।

২. বৌদ্ধ দর্শনে মনে করা হয় জ্ঞানের উপাদানগুলো দেশ এবং কালে অস্তিত্বশীল রয়েছে। অন্যদিকে এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মতও এরূপ ছিল।[৭] এছাড়া আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য দর্শনে শাব্দবোধ ও বাক্যার্থবোধ নিয়ে যেসব আলোচনা আমরা দেখি তা ভারতীয় ন্যায় দর্শন এবং বৌদ্ধ দর্শনে খ্রিষ্টপূর্ব যুগেই পরিলক্ষিত হয়।

৩. পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যায় বলা হয়েছে একাধিক বচন মিলে একটি অনুমান গঠিত হয়। আরও বলা হয়েছে প্রতিটি বচন একাধিক পদ দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে ন্যায়মতে আমরা দেখতে পাই অনুমানের অঙ্গ হিসেবে এই দর্শন একাধিক অবয়ব এবং একাধিক পদের কথা বলেছে।

৪. ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষণকে আত্মার কার্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথমে এই আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ সাধিত হয়, তারপর মনের সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে। পরিশেষে এই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর সন্নিকর্ষ বা সংযোগ স্থাপিত হয়। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই আত্মার ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৮]

৫. পাশ্চাত্য দার্শনিক কান্টের দর্শনে স্বগত সত্তা এবং জ্ঞানের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা হেগেল এবং ব্রাডলির দর্শনে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়। ভারতীয় বেদান্ত দার্শনিক আচার্য শঙ্করও ব্রাডলির মতো জ্ঞানগত ভেদের সম্বন্বিত রূপ প্রদানের চেষ্টা করেন।[৯] তাই বলা যায় স্বগত সত্তা এবং জ্ঞানগত ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনে শঙ্কর ও ব্রাডলির চিন্তায় সাদৃশ্য রয়েছে।

৬. পাশ্চাত্য দর্শনে এরিস্টটলের ন্যায়ে তিনটি অবয়ব দেখা যায়। অন্যদিকে ভারতীয় দার্শনিক কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্করাচার্যও ন্যায়ের ক্ষেত্রে তিনটি অবয়বের আবশ্যিকতার কথা বলেছেন। তবে তাঁরা মনে করেন প্রথম তিনটি কিংবা শেষের তিনটি থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাঁচটি অবয়ব দরকার পড়ে না। সাধ্য, পক্ষ এবং হেতু– এই তিনটি পদ এরিস্টটলের অনুমান সংক্রান্ত আলোচনায় এবং ভারতীয় অনুমানে স্বীকার করা হয়েছে।[১০]

৭. পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে যে সকল দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁরা জ্ঞানের উৎপত্তির উপায় বা উৎস নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় জ্ঞানের

স্বরূপ, সীমা, পরিসীমা, বৈধতা, সম্ভাবনা, মানদণ্ড প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হলেও তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল জ্ঞানোৎপত্তির উপায় সংক্রান্ত। পাশ্চাত্য দর্শনের উল্লিখিত বিষয়ের সাথে ভারতীয় দর্শনের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কেননা ভারতীয় দার্শনিকরা তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রমাণতত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন।[১১]

৮. ভারতীয় দার্শনিকরা তাঁদের প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান প্রমাণ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তার সাথে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অভিজ্ঞতাবাদ এবং বুদ্ধিবাদের সাদৃশ্য রয়েছে। ভারতীয় দর্শনে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যখন কোনো বিষয় বা বস্তুর সন্নিকর্ষ বা সংযোগ ঘটে তখন তাকে প্রত্যক্ষণ বলে। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে এই প্রত্যক্ষণজাত জ্ঞানই হলো অভ্রান্ত এবং সুনিশ্চিত জ্ঞান। আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা আমরা এই জ্ঞান লাভ করতে পারি। পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞতাবাদ নিয়ে যে আলোচনা দেখা যায় তা ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রত্যক্ষণ মতবাদের সাথে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। অভিজ্ঞতাবাদ মনে করে সার্থক এবং যথার্থ জ্ঞান শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার এই মতবাদ মনে করে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদির মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে থাকি। অর্থাৎ খুব সংক্ষেপে বললে, "... empiricism maintains that we what we have found out from our senses."[১২] তাই অভিজ্ঞতাবাদীরা মনে করেন ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা কিংবা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ ছাড়া আমরা কোনো জ্ঞান লাভ করতে পারি না। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যায় এই ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের দুটি রূপ দেখা যায়। যথা: বাহ্য প্রত্যক্ষণ এবং আন্তঃপ্রত্যক্ষণ। বাহ্য প্রত্যক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বকের সাহায্যে আমরা বাহ্য জগতের জ্ঞান লাভ করে থাকি। আর আন্তঃপ্রত্যক্ষণের দ্বারা আমরা আমাদের বিভিন্ন মানসিক অবস্থার জ্ঞান পেয়ে থাকি। অভিজ্ঞতাবাদ মানুষের প্রত্যক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ শক্তিকে প্রধান্য দিয়ে থাকে। এই মতবাদ অনুযায়ী, মানুষের প্রত্যক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ থেকে সংবেদনের সমবায়ে গঠিত ধারণা থেকেই সৃষ্টি হয় জ্ঞানের। অভিজ্ঞতাবাদীরা মনে করে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সত্যতা এবং বৈধতাও অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের চার্বাক এবং পাশ্চাত্যের সোফিস্টদের থেকে শুরু হয়ে এই অভিজ্ঞতাবাদের আলোচনা সমকাল পর্যন্ত চলমান। বর্তমানকালে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ এবং প্রয়োগবাদে অভিজ্ঞতাবাদের আরো সুসংহত রূপ পরিলক্ষিত হয়।[১৩] আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে উল্লেখযোগ্য তিনজন (লক, বার্কলি এবং হিউম) দার্শনিকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা এখানে উপস্থাপন করবো। এদের মধ্যে লকের মতবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অভিজ্ঞতাবাদের প্রকৃত এবং সুসংবদ্ধরূপ আমরা লকের চিন্তায় দেখতে

পাই। লক তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *An Essay Concerning Human Understanding* (১৬৯০) গ্রন্থে অভিজ্ঞতাবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট, যুক্তিপূর্ণ এবং সুসংহত ব্যাখ্যা প্রদানে প্রয়াসী হয়েছেন। অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণকে লক জাগতিক বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভের একমাত্র উৎস হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন সকল ধারণার উৎস হলো অভিজ্ঞতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ছাড়া ধারণার আর কোনো উৎসকে তিনি স্বীকার করেননি। লক অভিজ্ঞতার দুটি পথ নির্দেশ করেছেন, তার একটি হলো সংবেদন এবং অন্যটি হলো অন্তর্দর্শন। সংবেদন থেকে আমরা বাইরের বস্তু জগতের ধারণা পাই আর অন্তর্দর্শনের সাহায্যে আমরা আমাদের মানসিক অবস্থাসমূহের ধারণা পেয়ে থাকি। জন লক তিন প্রকার জ্ঞানের কথা বলেছেন। যথা: সংবেদনমূলক, স্বজ্ঞামূলক এবং প্রমাণমূলক জ্ঞান। সংবেদনমূলক জ্ঞানে আমরা সংবেদনের সাহায্যে বর্তমান বস্তু এবং ঘটনাসমূহ জানতে পারি। এ ধরনের জ্ঞানের প্রামাণিকতা নিশ্চিত নয়। স্বজ্ঞামূলক জ্ঞানকে লক অব্যবহিত সাক্ষাৎ জ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটি ধারণার মধ্যেই সঙ্গতি বা অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। এখানে তৃতীয় কোনো ধারণার দরকার পড়ে না। লক এই জ্ঞানকে সন্দেহহীন সুনিশ্চিত জ্ঞান বলেছেন। ব্যক্তির নিজ অস্তিত্ব এ ধরনের অনুভূতিমূলক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। লক প্রমাণমূলক জ্ঞানকে পরোক্ষ জ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সরাসরি তুলনা করার জন্য দুটি ধারণা একত্রে দরকার হয়, যদি একটি ধারণা অনুপস্থিত থাকে তখন মন অনুপস্থিত অন্য ধারণার কাজটি সম্পন্ন করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ঈশ্বরের জ্ঞান হলো পরোক্ষজ্ঞান। আরোহ অনুমানের সাহায্যে আমরা এই জ্ঞান লাভ করে থাকি।[১৪] লকের সূচিত ধারণার সুসংহত রূপ দেখা যায় আরেক অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক বিশপ বার্কলির হাতে। তিনিও প্রত্যক্ষণকে জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি সংবেদন এবং ধারণাকেই শুধুমাত্র জ্ঞানের বস্তু হিসেবে স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন, জাগতিক বস্তুসামগ্রী সংবেদন এবং ধারণার সমষ্টিমাত্র। তিনি বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকারের পাশাপাশি মনেরও অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি মনে করেন মন বস্তুর ধারণা তৈরিতে সহযোগিতা করে। সবকিছুকে বার্কলি দেখেছেন মনোনির্ভর বিষয় হিসেবে। আরেক অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম তাঁর *A Treatise of Human Nature* -গ্রন্থে প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বার্কলির ন্যায় হিউমও অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, জ্ঞানের শুরু হয় প্রত্যক্ষণ থেকে। হিউম প্রত্যক্ষণের পরিভাষা হিসেবে ইন্দ্রিয়ছাপ এবং ধারণা শব্দ দুটি ব্যবহার করেছে। হিউমের মতে প্রত্যক্ষণকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ইন্দ্রিয়ছাপ এবং ধারণা। হিউমের নিজের ভাষায়, "All the perception of the human mind resolve themselves into two distinct kinds, which I

should call *impressions and ideas.*"[১৫] এই ইন্দ্রিয়ছাপ হলো অভিজ্ঞতার সরাসরি উপাত্ত। হিউম ইন্দ্রিয়ছাপ বলতে বাহ্য এবং আন্তর সংবেদনকে নির্দেশ করেছেন। হিউমের ইন্দ্রিয়ছাপের বৈশিষ্ট্য হলো তা তীব্র ও প্রচণ্ড। অর্থাৎ যেসব প্রত্যক্ষণ তীব্র এবং প্রচণ্ড হবে তাই ইন্দ্রিয়ছাপ।[১৬] ইন্দ্রিয়ছাপ সম্পর্কে হিউম নিজের মত প্রকাশ করেছেন এভাবে,

> "Those perceptions which enter with most force and violence, we may name *impressions*, and under this name I comprehend all our sensations, passions, and emotions, as they make their first appearance in the soul."[১৭]

অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষণই হলো ইন্দ্রিয়ছাপ। হিউম মনে করেন প্রত্যক্ষণ ব্যতীত আমরা বহির্জগতের জ্ঞানলাভ করতে পারি না, প্রত্যক্ষণই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। ইন্দ্রিয় অনুভব দ্বারা আমাদের মাঝে হঠাৎ এক ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি হয় যাকে ইন্দ্রিয়ছাপ বলে। আর ইন্দ্রিয়ছাপের দুর্বল, অস্পষ্ট বা ক্ষীণ প্রতিবিম্বগুলোকে ধারণা বলে। হিউমের নিজের ভাষায়, *"By ideas* I mean the faint images of these in thinking and reasoning,..."[১৮] ধারণা তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রেও ইন্দ্রিয়ছাপের ভূমিকা লক্ষ করা যায়। তবে ধারণার আরো কতগুলো সজীব প্রত্যক্ষণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ছাপ বিদ্যমান থাকে। আর ঐ সকল সজীব প্রত্যক্ষণ থেকে তৈরি হয় ধারণা। হিউমের অভিমত হচ্ছে ধারণাসমূহ সজীব প্রত্যক্ষণেরই প্রতিরূপ। তবে ইন্দ্রিয়ছাপকে আমরা সরাসরি অনুভব করলেও ধারণাকে সরাসরি অনুভব করা যায় না, ধারণাকে অনুভব করতে হয় চিন্তার মধ্য দিয়ে।

ভারতীয় দার্শনিকগণ জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রমাণ হিসেবে প্রত্যক্ষণের পরেই অনুমানকে গ্রহণ করেছেন। অনুমান মূলত মানসিক এবং বৌদ্ধিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত যা পাশ্চাত্য দর্শনের বুদ্ধিবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই এখন প্রাসঙ্গিকভাবে পাশ্চাত্য দর্শনের বুদ্ধিবাদের আলোচনা চলে আসে। এখন বুদ্ধিবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

পাশ্চাত্য দর্শনে বুদ্ধিবাদ একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসেবে পরিচিত। এই মতবাদ মনে করে বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত জ্ঞান পেতে পারি এবং বুদ্ধিই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। এই বুদ্ধিবাদ প্রসঙ্গে এমিরিটাস অধ্যাপক আব্দুল মতীনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "... আমাদের 'নিশ্চিত জ্ঞানের' একমাত্র উৎস হচ্ছে বুদ্ধি। বুদ্ধি হচ্ছে আমাদের সঠিক চিন্তার একটি সাধারণ চিত্তবৃত্তি যা ইন্দ্রিয়বোধের সঙ্গে সহযোগিতা করে স্বাধীনভাবে কাজ করে।"[১৯] অধ্যাপক মতীন অভিজ্ঞতাবাদের সহযোগী হিসেবে বুদ্ধিবাদকে বিবেচনা করেছেন। তিনি বিষয়টির সঠিক উপলব্ধি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কেননা শুধু অভিজ্ঞতা দ্বারা পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। এ বিষয়টির বিস্তারিত

আলোচনা আমরা কান্টের বিচারবাদ আলোচনায় দেখতে পাবো। বুদ্ধিবাদের আলোচনাকে প্রচার এবং প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনজন প্রখ্যাত দার্শনিক। এরা হলেন: রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০), বেনেডিক্ট স্পিনোজো (১৬৩২-১৬৭৭) এবং গটফ্রিড উইল হেলম লাইবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬)। তবে বুদ্ধিবাদ সম্পর্কিত আলোচনা আমরা প্রথমে দেখি সক্রেটিসের চিন্তায়। তিনি বুদ্ধিকে জ্ঞানের প্রধান উৎস হিসেবে অভিহিত করেছেন। সক্রেটিস মনে করেন বুদ্ধির মাধ্যমেই আমাদের সার্বিক ধারণা গঠিত হয়। আর এই সার্বিক ধারণার দ্বারা আমরা সব ধরনের জ্ঞান পেয়ে থাকি। প্লেটোও সক্রেটিসকে অনুসরণ করে অনুরূপ কথা বলেন। প্লেটো মনে করতেন প্রত্যক্ষণ কখনো নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করতে পারে না, কেননা প্রত্যক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান অনিশ্চিত এবং পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে। তাই জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে বুদ্ধিকেই স্বীকার করে নিতে হয়। বুদ্ধিবাদের একজন শক্তিশালী প্রবক্তা ছিলেন আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক হিসেবে পরিচিত রেনে দেকার্ত।

দেকার্তের দার্শনিক চিন্তার মূল লক্ষ্য ছিল তৎকালীন সময়ে সমাজে বিরাজমান ধারণা এবং বিশ্বাসগুলোকে নির্বিচারে গ্রহণ না করে এগুলোকে প্রামাণিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো।[২০] তিনি গাণিতিক পদ্ধতি এবং এর নিশ্চয়তা দেখে আকৃষ্ট হন। তাই তিনি দর্শনে গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগে প্রয়াসী হন এবং নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়ার চেষ্টা করনে। আর এ লক্ষ্যে তিনি তাঁর দর্শনে প্রথমে সংশয় পদ্ধতি প্রয়োগ করেন এবং সবকিছুকে সন্দেহ করা শুরু করলেন। তবে এই সন্দেহ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তিনি দেখলেন যে সবকিছুকে সন্দেহ করা গেলেও একটি বিষয়কে সন্দেহ করা যায় না আর তা হলো নিজের অস্তিত্ব। কেননা সন্দেহ করতে গেলে একজন সন্দেহকারী কর্তা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে দেকার্ত সংশয়বাদ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ঘোষণা করেন, "I think, therefore I am."[২১] দেকার্ত 'আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি অস্তিত্বশীল' এর দ্বারা সত্যের মানদণ্ডকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন, আগ্রহী হন বহির্জগতের বস্তুনিষ্ঠতা প্রমাণ করতে। দেকার্ত মানবমনের ধারণাগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা: সহজাত, আগন্তুক এবং কৃত্রিম ধারণা। দেকার্ত যে সহজাত ধারণার কথা বলেছেন তা আমাদের জন্মের সময় ঈশ্বর আমাদের মনে গেঁথে দেন। তিনি মনে করেন একমাত্র সহজাত ধারণাতে সত্য বিরাজমান এবং এর দ্বারা সমস্ত কিছুর জ্ঞান আমরা গাণিতিক আরোহ পদ্ধতিতে পেয়ে থাকি। তাই দেকার্তের বুদ্ধিবাদকে গাণিতিক বুদ্ধিবাদ বলা হয়। এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, "এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান বিচারবুদ্ধির দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে যখন কোনো ধারণা বা বিধানের সত্যতা যাচাই করা হয়, তখনও কিন্তু সত্যতার বোধ ইন্দ্রিয় প্রদত্ত নয়। বিচারবুদ্ধিই তার জনক।"[২২] অন্যদিকে আগন্তুক ধারণা প্রত্যক্ষণ থেকে প্রাপ্ত। এগুলো বাইরে থেকে আমাদের মনে

আসে। তাই এই ধারণাগুলো অস্পষ্ট এবং বিভ্রান্তিমূলক। আর কৃত্রিম ধারণা যেহেতু আমাদের কল্পনাজাত ধারণা তাই তা নিশ্চিতভাবে মিথ্যা।[২৩] আরেকজন খ্যাতনামা বুদ্ধিবাদী দার্শনিক স্পিনোজাও তাঁর বুদ্ধিবাদ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দেকার্তকে অনুসরণ করেছিলেন। তিনিও দেকার্তের মতো সহজাত ধারণার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করেছিলেন। স্পিনোজা *On the Improvement of the Understanding* এবং *Ethics* গ্রন্থদ্বয়ে তাঁর মতবাদ তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে এমিরিটাস অধ্যাপক আবদুল মতীনের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, "তিনি 'দ্রব্যের' স্বতঃপ্রমাণিত ধারণা নিয়ে তাঁর আলোচনা শুরু করেন এবং এর উপর ভিত্তি করেই যৌক্তিক অবরোহের মাধ্যমে তাঁর চিন্তনের সমগ্র কাঠামো গড়ে তোলেন।" [২৪] দেকার্তের মতো তিনিও মনে করেন আমরা অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণা বা বুদ্ধি দিয়েই ঈশ্বর, নিত্যতা, অসীমতা, পূর্ণতা প্রভৃতির জ্ঞান লাভ করতে পারি। কেননা এ সকল জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষণে সম্ভব নয়, আসে না। তাই তাঁর মতে সুনিশ্চিত এবং সঠিক জ্ঞানের জন্য আমাদেরকে বুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে হয়।

আরেকজন খ্যাতনামা জার্মান দার্শনিক লাইবনিজও বুদ্ধিবাদের পক্ষে জোরালো মত প্রদান করেন। লাইবনিজের মতে আমাদের সমস্ত জটিল ও কঠিন বিষয়ের জ্ঞান আসে বুদ্ধি থেকে। তবে তিনি মনে করতেন বুদ্ধির সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের একটি দূরতম সম্পর্ক রয়েছে, তাদের সম্পর্ক একেবারে শত্রুতাপূর্ণ নয়। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান সুস্পষ্ট এবং শুদ্ধ নয়, তাছাড়া ইন্দ্রিয় আমাদেরকে শাশ্বত সত্যের জ্ঞান দিতে পারে না যা বুদ্ধি পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, পাশ্চাত্য দর্শনের অভিজ্ঞতাবাদ এবং বুদ্ধিবাদ পরস্পর বিপরীত বা বিরোধী মতবাদ। উভয় মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকরা বিপরীত মতকে গ্রহণ করছেন না। ফলে তাঁরা মূলত আংশিক জ্ঞানকে উপস্থাপন করেছেন আমাদের সামনে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ উভয় প্রকার মতবাদের ত্রুটি দূর করার লক্ষ্যে প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট এগিয়ে এলেন। তিনি দুটি মতবাদের আংশিক গুরুত্বকে তুলে ধরে এদের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন যা দর্শনের ইতিহাসে বিচারবাদ নামে পরিচিত। কান্টের চিন্তা পর্যালোচনা করার পূর্বে বলে রাখা ভালো যে, ভারতীয় দর্শনের প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানের মধ্যে আমরা কিন্তু এরূপ বিরূপ মনোভাব দেখতে পাই না। ভারতীয় দার্শনিকরা জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে একই সাথে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানকে গ্রহণ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র চার্বাকসম্প্রদায় ব্যতিক্রম তাঁরা জ্ঞানের উৎস হিসেবে একমাত্র প্রত্যক্ষণকে গ্রহণ করেছেন, আর অনুমান প্রমাণের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। চার্বাকমতের সাথে

বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের এক্ষেত্রে বেশ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এখন কান্টের সমন্বয়ী চিন্তা বা বিচারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো:

প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) তিনি তাঁর দর্শনে জ্ঞান ও সত্যের অনুসন্ধান চালিয়েছেন। আর এ লক্ষ্যে তিনি সমীক্ষা চালিয়েছেন তাঁর সমসাময়িক এবং পূর্ববর্তী বুদ্ধিবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মতামতের ওপর। তিনি জ্ঞান, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, সীমা ও সম্ভাবনা, বুদ্ধির ক্ষমতা প্রভৃতি নিয়ে এক যৌক্তিক সমীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে *A Critique of Pure Reason* (১৭৮১) এ। এই গ্রন্থের প্রথমে তিনি বলেছেন, "But though all our knowledge begins with experience, it does not follow that it all arises out of experience."[২৫] অর্থাৎ কান্ট বলতে চেয়েছেন অভিজ্ঞতা কিংবা সংবেদন দিয়ে জ্ঞান শুরু হলেও এর বাইরে কিছু বিষয় আছে। অর্থাৎ কান্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রে এখানে বুদ্ধির ভূমিকার ইঙ্গিত করেছেন। কান্ট চেয়েছেন কমপ্লিট বা পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকে আবিষ্কার করতে। তিনি দেখলেন যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদীদের ব্যাখ্যা একপেশে। কেননা বুদ্ধিবাদ বুদ্ধির বাইরে জ্ঞানের কোনো উৎসকে স্বীকার করেননি। অন্যদিকে অভিজ্ঞতাবাদ মনে করে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানই আসল। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের বাইরে তাঁরা যেতে চান না। তারা অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের মৌলিক উৎস হিসেবে দাবি করেন। কান্ট মূলত বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের এ বিরোধ নিরসনে অগ্রসর হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, জ্ঞান হচ্ছে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সমষ্টিগত ফল। কান্ট মনে করেন বুদ্ধি আমাদেরকে জ্ঞানের আকার প্রদান করে, আর ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা দেয় জ্ঞানের উপাদান।[২৬] অর্থাৎ কান্টের চিন্তায় আমরা দেখি যে পরিপূর্ণ জ্ঞানের জন্য বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দুটোরই প্রয়োজন রয়েছে, কেননা এদের কোনো একটি এককভাবে জ্ঞান সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়।[২৭] এ প্রসঙ্গে বলা যায়, কান্টের চিন্তা ছিল এরূপ, "Human knowledge arises through the joint functioning of sensibility and intellect, or understanding;..."[২৮] কান্ট মনে করেন আমাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে যে সংবেদন তৈরি হয় তা দেশ ও কালের মধ্য দিয়েই হয়। আর আমাদের বোধের ওপর কাজ করে থাকে বুদ্ধির ধারণা অনুযায়ী। কান্ট মনে করেন যদি বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা একটি অন্যটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে তাহলে সেখানে ভালো ফলাফল আসবে। কেননা বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে প্রাপ্ত ফলই বস্তুর স্বরূপ বা প্রকৃতিকে নির্ধারণ করে থাকে। কান্টের চিন্তার নির্যাস প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যায়, "ইন্দ্রিয়ানুভব (Sensc Perception) আমাদের জ্ঞানের উপাদান বা রসদ জোগায়, কিন্তু এগুলোকে বুদ্ধির মাধ্যমে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ইন্দ্রিয়ানুভবের মাধ্যমে আমরা যা পাই তা জ্ঞানের একটি

পূর্ণাঙ্গরূপ ধারণ করতে পারে।"[২৯] কান্ট আরো মনে করেন, বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ বিশেষ করে দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ প্রমুখ প্রজ্ঞার ক্ষমতার উচ্চস্বিত প্রশংসা করেছেন। অন্যদিকে অভিজ্ঞতাবাদীরা মানবপ্রজ্ঞার ভূমিকাকে বেশি খাটো করে দেখেছেন।[৩০] কান্ট মনে করেন দেশ-কাল, দ্রব্য, কার্যকারণ, গুণ প্রভৃতি অভিজ্ঞতাপূর্ব অর্থাৎ মানসিক বিষয়। আর ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ হলো সরাসরি প্রাপ্ত বিষয়। তাই প্রকৃত জ্ঞানের জন্য এদুটো বিষয়ের সমন্বয় দরকার। সেজন্য তিনি তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব বা বিচারবাদে অভিজ্ঞতাবাদ বা বুদ্ধিবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজটি করেছেন। পরিশেষে কান্টের চিন্তা এবং বিশ্লেষণ সম্পর্কে বলা যায়, "কান্টের মৌলিক অবস্থান হলো, জ্ঞান শুধু বাইরে থেকে পাওয়া কোনো নিষ্ক্রিয় ব্যাপার নয় ; জ্ঞান হলো অবধারণ গঠনের এমন এক সক্রিয় প্রক্রিয়া যেখানে আমরা বাইরে যে উপাদান লাভ করি, তাকে বৌদ্ধিক ক্রিয়া দ্বারা সংগঠিত করতে হয়।"[৩১]

কান্টের চিন্তায় আমরা অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধির সমন্বিত ফল হিসেবে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান পাই। আর ভারতীয় দার্শনিকদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় একই বিষয় প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান সংক্রান্ত জ্ঞানের বিষয় বহুপূর্ব থেকেই দেখতে পাই। যেহেতু প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানকে জ্ঞানের বিষয় হিসেবে বিনা বিচারে মেনে নিয়েছিলেন তাই কান্টের মতো বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার অনুরূপ অনুমান এবং প্রত্যক্ষণের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন পড়েনি। বরং বলা চলে কান্টের চিন্তার বহুপূর্বে ভারতীয় দার্শনিকরা বুঝতে পেরেছিলেন যে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হলে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ বা অভিজ্ঞতা এবং অনুমান কিংবা মানসিক বুদ্ধি অপরিহার্য। আর এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বের অগ্রগামী। তাই যুগের বিবেচনায় ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং মর্যাদা অপরিসীম।

৯. আরেকজন প্রখ্যাত সমকালীন দার্শনিক উইলিয়াম জেমস তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় অভিজ্ঞতাবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ প্রচলিত অভিজ্ঞতাবাদ থেকে ভিন্ন। জেমসের এই অভিজ্ঞতাবাদের নাম মৌলিক অভিজ্ঞতাবাদ যা প্রচলিত অভিজ্ঞতাবাদ থেকে ভিন্ন। জেমসের অভিজ্ঞতাবাদ কোনো কিছুকে চূড়ান্ত বলে মনে করে না। কেননা তিনি মনে করেন জ্ঞান সুনিশ্চিত এবং অনড় কোনো বিষয় নয়। জ্ঞানের বিষয়টি বরং আপেক্ষিক এবং গতিশীল। প্রচলিত অভিজ্ঞতাবাদ জ্ঞানের বিষয় এবং বিষয়ীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে যে দ্বৈতবাদ সৃষ্টি করেছে জেমস তাঁর বিরোধিতা করেন।[৩২] জেমসসের অভিজ্ঞতাবাদ প্রচলিত অভিজ্ঞতাবাদ থেকে বিস্তৃত এবং ব্যাপক। তিনি তাঁর *Pragmatism* এবং *Essays in Radical Empiricism* -গ্রন্থদ্বয়ে 'অভিজ্ঞতা' শব্দটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। জেমসের সেই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ

করা যায়, "... প্রত্যক্ষণ, ধারণা, প্রত্যাশা, ভীতি, সন্দেহ এবং নীতিবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও ধর্মবোধকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ যা কিছুই আমরা সরাসরি অনুভব করতে পারি ও যার ব্যবহারিক ফল রয়েছে, তা সবই অভিজ্ঞতা।"[৩৩] জেমস তাঁর উল্লিখিত এই সর্বব্যাপক উপাদানকে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা নামে চিহ্নিত করেন এবং একে 'চরম অভিজ্ঞতাবাদ' হিসেবে অভিহিত করেন। এই চরম অভিজ্ঞতাবাদ প্রসঙ্গে জেমস বলেন, "To be radical, an empiricism must neither experienced, nor exclude from them any element that is directly experienced."[৩৪]

জেমসের চরম অভিজ্ঞতাবাদে শুধু বস্তু নয় বস্তুর সম্বন্ধগুলোও প্রতিফলিত হয়। তিনি আরো বলেন অভিজ্ঞতা কোনো খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, এটি একটি অবিচ্ছিন্ন অবিরাম প্রবাহ।[৩৫] প্রতি মুহূর্তে আমরা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা পেলেও প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সাথে একটি ধারাবাহিক সংযোগ আছে। মোট কথা জেমস যে নতুন অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তা সর্বদা পরিবর্তনশীল বিষয়।

উপরের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় জেমসের অভিজ্ঞতাবাদের সাথে ভারতীয় অভিজ্ঞতা কিংবা পাশ্চাত্যদর্শনের ব্রিটিশ অভিজ্ঞতার কোনো মিল বা সাদৃশ্য নেই। জেমস তাঁর মৌলিক অভিজ্ঞতাবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যেন অভিজ্ঞতার সংজ্ঞাই পাল্টে ফেলেছেন। কেননা প্রত্যাশা, ভীতি, সন্দেহ, নীতিবোধ, ধর্মবোধ কীভাবে অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত বিষয় তার কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আমরা জেমসের কাছে পাই না। বাস্তবতার নিরিখে সৌন্দর্যবোধ এবং নীতিবোধকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে তা অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয় নয়, এগুলো বুদ্ধির অন্তর্গত বিষয়। তবে জেমসের ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যাত অভিজ্ঞতার সংজ্ঞার মধ্যে প্রত্যক্ষণ এবং ধারণা বা অনুমানকে প্রথম দিকে সম্পৃক্ত করেছেন যা ভারতীয় দার্শনিকদের আলোচনার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। তাছাড়া জ্ঞানের ক্ষেত্রে জেমস ব্যবহারিক জীবনের উপযোগিতার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ব্যবহারিক উপযোগিতাবিহীন জ্ঞানকে জেমস স্বীকার করতে চাননি। ভারতীয় দার্শনিকদেরও দর্শন আলোচনা তথা জ্ঞান চর্চার মূলে ছিল মানুষের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন সংকট থেকে উত্তরণের পথ অন্বেষণ। অর্থাৎ তাঁরা মানবজীবনের উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তার কারণে জ্ঞান-অন্বেষণে ব্রতী হয়েছিলেন। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব এবং জেমসের জ্ঞানতত্ত্বের সংজ্ঞা, প্রকৃতি এবং পদ্ধতিগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও উভয়ের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। উভয় জ্ঞানতত্ত্ব মানবজীবনের ব্যবহারিক উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্ব এবং মর্যাদা সহকারে ভেবেছে। উভয় জ্ঞানতত্ত্বের লক্ষ্য ছিল মূলত মানবকল্যাণ এবং পৃথিবীর

বুকে সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করা। আর এখানে উভয় দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিহিত।

১০. যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ সমকালীন দর্শনের একটি শক্তিশালী দার্শনিক আন্দোলন। এটি কোনো মতবাদের সমষ্টি নয়। এই দার্শনিক আন্দোলন বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় দশকে ইউরোপে এবং চতুর্থ, পঞ্চম দশকে আমেরিকায় বিকশিত হয়। অর্থাৎ প্রথমে ইউরোপে এবং পরবর্তীতে আমেরিকায় যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদের প্রভাব এবং প্রচার লক্ষ করা যায়।[৩৬] অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী মিলে দর্শনের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তার সূত্রপাত করেন। এসব দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীরা যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী হিসেবে পরিচিত।[৩৭] তবে 'প্রত্যক্ষবাদ' প্রত্যয়টির প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসি চিন্তাবিদ সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে খ্যাত অগাস্ট কোঁতে। তিনি চেয়েছিলেন একটি প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করতে। প্রত্যক্ষবাদকে কেন্দ্র করে তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তবে অগাস্ট কোঁতের প্রত্যক্ষবাদের সাথে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের সরাসরি সংযোগ লক্ষ করা না গেলেও সাম্প্রতিক সময়ে এদের মধ্যে সংমিশ্রণগত বিশ্লেষণ দেখা যায়। এই মতবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়, "যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ এমন একটি মতবাদ যে মতবাদে দার্শনিক চিন্তাকে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাভিত্তিক এবং বিজ্ঞানের মত অধিক নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।"[৩৮] যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের চিন্তার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই আর্নেস্ট মাখের কণ্ঠে। তিনি বলেন, "বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে এমন হতে হবে যেন তাকে আমরা অভিজ্ঞতামূলক তথ্যে পর্যবসিত করতে পারি, যেন তা আধিবিদ্যক বিষয় থেকে মুক্ত হয় এবং পরিণামে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়।"[৩৯] প্রত্যক্ষ্যবাদীদের যাচাইকরণ প্রক্রিয়া ছিল মূলত অভিজ্ঞতা নির্ভর। অভিজ্ঞতার ওপর ছিল তাঁদের অবিচল আস্থা। কেননা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে তাঁরা ভুলভ্রান্তি মুক্ত বলে মনে করেছেন। অর্থাৎ সংক্ষেপে বললে তাঁদের চিন্তায় অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞান ছিল এরূপ, "... empirical knowledge which is wholly trustworthy, free of my any risk of error."[৪০] অভিজ্ঞতার বাইরে তাঁদের পর্যবেক্ষণ ছিল না। তাঁরা প্রথমদিকে অগাস্ট কোঁতের চিন্তা এবং পরবর্তীতে আধুনিক দর্শনের পরিপূর্ণ প্রত্যক্ষণবাদী হিসেবে খ্যাত ডেভিড হিউমের ধারণা দ্বারাও প্রভাবিত হন। হিউম প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যায়, "তিনি জ্ঞানালোচনায় প্রত্যক্ষণের বাইরে কোনো কিছুকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। এমনকি মানব মনের ধারণাটিও তিনি প্রত্যক্ষণ তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন।"[৪১] যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা বিমূর্ত তত্ত্বানুসন্ধানের বিপরীতে দর্শনকে বিজ্ঞানের ভিত্তির ওপর

দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তাঁরা দেখলেন যে বিজ্ঞানের বাস্তব জ্ঞান পাওয়া সম্ভব অভিজ্ঞতা নির্ভর জ্ঞান থেকে। তাই যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদীরা বিজ্ঞান যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা প্রদান করে দর্শনে তেমনি নিশ্চয়তামূলক জ্ঞানের অনুসন্ধান করেছেন। অর্থাৎ বিজ্ঞানমনস্ক এবং নিশ্চিত জ্ঞানের অনুসন্ধান করেছিলেন যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণ।

১১. চার্বাক দর্শন এবং যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, উভয় দর্শনের মূল বক্তব্যের মধ্যে তেমন কোনো বিরোধ দেখা যায় না। চার্বাক দার্শনিকগণ অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো জ্ঞানকে গুরুত্ব দেননি। তাঁরা একমাত্র অভিজ্ঞতায় অর্জিত জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যায় যে, "তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়ায় তাঁরা নির্ভর করেন যৌক্তিক যুক্তিবিন্যাস এবং অভিজ্ঞতার ওপর।"[৪২]

১২. চার্বাক এবং যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মধ্যে আরও কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। চার্বাক এবং যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা উভয়েই অনুমানলব্ধ জ্ঞানকে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা উভয়েই ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল, পাপ-পুণ্যকে স্বীকার করেননি। তাঁরা এসব আলোচনায় ছিলেন অনাগ্রহী।

১৩. যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ, হিউমের প্রত্যক্ষবাদী মতবাদ এবং চার্বাকদের মতবাদের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে কান্টের দর্শনে অর্থাৎ তাঁর বিচারবাদে এসে যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ হিউম এবং চার্বাকদের অভিজ্ঞাতবাদকে এককভাবে নয় আংশিকভাবে স্বীকার করা হয় কেননা শুধু অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষণ কখনো আমাদেরকে পরিপূর্ণ জ্ঞান প্রদান করতে পারে না। কান্ট চিহ্নিত করেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে এককভাবে অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি একটি ভুল সিদ্ধান্ত।

১৪. জ্ঞানের উৎপত্তিগত দিক থেকে চার্বাক এবং হিউমের চিন্তায় মিল দেখা যায়। যদিও তাঁদের দর্শনচিন্তার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। চার্বাকদের চিন্তায় প্রত্যক্ষণের দুটি দিক পরিলক্ষিত হয়। যথা: বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষণ। হিউমের দর্শনেও অভিজ্ঞতার একমাত্র উৎস হিসেবে প্রত্যক্ষণের দুটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। যথা: ইন্দ্রিয়ছাপ এবং ধারণা।

বৈসাদৃশ্যগত তুলনা

১. ভারতীয় ন্যায়মতের সাথে পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যবহৃত 'Knowledge' শব্দটির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নৈয়ায়িকদের মতে সকল প্রকার জ্ঞান যেমন সত্য হতে পারে তেমনি আবার মিথ্যাও হতে পারে। তবে পাশ্চাত্য দর্শন নির্দেশিত 'Knowledge' শব্দ দ্বারা কেবলমাত্র নিশ্চিত বা সঠিক জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে।

২. ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ধারাবাহিক আলোচনা বেশ জটিল। অন্যদিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা ততটা জটিল নয়। পাশ্চাত্য তথা ইউরোপে মতবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা একের পর এক অর্থাৎ পর্যায়ক্রমিকভাবে দার্শনিকের আবির্ভাব লক্ষ করি। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের সম্প্রদায়গুলোর ক্ষেত্রে এরূপ বিষয় লক্ষ করা যায় না।

৩. ভারতীয় দর্শনের একটি সম্প্রদায় যখন তাঁদের প্রত্যক্ষণ ও অনুমানপ্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তখন তাঁরা অন্য সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষণ ও অনুমান সম্পর্কিত মতকে উপেক্ষা করেননি। পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় না। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তাঁদের নিজস্ব মতবাদ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কিংবা প্রচলিত মতবাদকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেননি। পাশ্চাত্য দার্শনিক লক, বার্কলি এবং হিউমের জ্ঞানবিদ্যক আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা এরূপ বিষয় এবং মনোভাব দেখতে পাই।[৪৩]

৪. ভারতীয় দর্শনের ন্যায় অনুমানে পাঁচটি অবয়বের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে 'উদাহরণ' অবয়বটির সবিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ড. বি. এন. শীলের মতে এই গুরুত্বপূর্ণ অবয়বটির জন্য ভারতীয় ন্যায় একদিকে যেমন পাশ্চাত্য দার্শনিক এরিস্টটলের অবরোহ অনুমানের ন্যায় থেকে স্বতন্ত্র, অন্যদিকে তেমনি আরেক পাশ্চাত্য দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের আরোহ অনুমান থেকেও স্বতন্ত্র।[৪৪]

৫. ভারতীয় দর্শনের চার্বাক সম্প্রদায় এবং পাশ্চাত্য দর্শনের হিউম উভয়ই প্রত্যক্ষণকে জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করলেও সার্বিক জ্ঞানের প্রশ্নে তাঁরা বলেন, সার্বিক জ্ঞান অসম্ভব এবং এই অসম্ভাব্যতার কারণ সম্পর্কীয় ব্যাখ্যায় তাঁদের চিন্তায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।[৪৫]

৬. প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি এবং সংখ্যা নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকগণ ত্রিধারায় বিভক্ত। প্রথম দল মনে করেন ইন্দ্রিয় হলো অঙ্গ। দ্বিতীয় দল বলেন, ইন্দ্রিয় হলো অঙ্গের শক্তি এবং তৃতীয় দলের অভিমত হলো ইন্দ্রিয় হলো স্বতন্ত্র কোনো দ্রব্য যা মাটি, পানি, বায়ু, অগ্নি জড় দ্বারা গঠিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা নিয়েও ভারতীয় দর্শনে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় দর্শনে সম্প্রদায়ভেদে যথাক্রমে ছয়টি, তেরোটি এবং বাইশটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য দর্শনে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা, প্রকৃতি নিয়ে এমন কোনো বিভাজন বা বির্তক দেখা যায় না।[৪৬]

৭. আধুনিক মনোবিজ্ঞান জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষণকে 'কমপ্লিকেশন' হিসেবে অভিহিত করেছে। মনোবিজ্ঞানী স্টাউট এই ধরনের প্রত্যক্ষণকে পরোক্ষ প্রত্যক্ষণ হিসেবে দাবি করেছেন।[৪৭] ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় এমনটি দেখা যায় না।

৮. গৌতমের পরার্থন্যায়ের সাথে এরিস্টটলের ন্যায়ের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় ধরনের ন্যায়ই হলো পরোক্ষ অনুমান বিশেষ। এই ন্যায় যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় কোনো প্রতিপাদ্য তর্কের বৈধতা অন্যের নিকট গ্রহণযোগ্য করার প্রচেষ্টা চালায়। উভয় ন্যায়ই হেতুপদ এবং সাধ্যপদের সমন্বয়ে একটি সঠিক আশ্রয়বাক্য প্রতিষ্ঠা করতে যায়।[৪৮]

৯. ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রকৃত বা সঠিক জ্ঞান কীভাবে পাওয়া যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ জীবনকেন্দ্রিক সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁরা জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্য দর্শনের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখি যে বিশ্বতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধানকল্পে পাশ্চাত্য দার্শনিকরা জ্ঞানবিদ্যক আলোচনায় অগ্রবর্তী হয়েছেন।[৪৯]

এছাড়াও আলোচ্য অধ্যায়ে উল্লিখিত পাশ্চাত্য দার্শনিক এরিস্টটল, কান্ট, লক, বার্কলি, হিউম, জেমসের মতের সাথে ভারতীয় সমকালীন চিন্তাবিদ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, এম এন রায় প্রমুখের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার প্রসঙ্গ লক্ষ করা যায় যার একটি সংক্ষিপ্ত তুলনা নিচে তুলে ধরা হলো:

উনিশ শতকে বাঙালির চিন্তার রাজ্যের একজন অন্যতম দিকপাল ছিলেন সাহিত্য সম্রাট হিসেবে খ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)। ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস এবং সমাজনীতির বহু বিষয় তাঁর লেখনীতে আমরা দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলিতে আমরা একদিকে যেমন বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, সাংখ্য, ন্যায় এবং বেদান্ত দর্শনের উল্লেখ দেখতে পাই, অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা দার্শনিক কান্ট, হেগেল, কোঁতে, বেনথাম, মিল, স্পেনসার প্রমুখের আলোচনা দেখতে পাই।[৫০] বঙ্কিমের জীবনসাধনায় আমরা ভারতীয় দর্শন এবং ধর্মের অনুশীলন যেমন দেখি তেমনি অন্যদিকে তাঁর মধ্যে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানমনস্কতার সন্ধানও আমরা পাই। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. এম মতিউর রহমানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "... একদিকে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন এবং অন্যদিকে প্রচীত্যের দর্শন ও বিজ্ঞান চেতনা নামক পরস্পর দুই বিরুদ্ধ শক্তি বঙ্কিমের মনন সাধনাকে আন্দোলিত করেছে। এর প্রমাণ তাঁর ইংরেজিতে লেখা দুটি প্রবন্ধ থেকে পাই। একটি প্রবন্ধের নাম The Confession of a Young Bengal, আর অন্যটির নাম The Study of Hindu Philosophy."[৫১] বঙ্কিমের *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থেও তাঁর দর্শনচিন্তার কিছুটা পরিচয় মেলে। এছাড়া তাঁর অন্যান্য লেখাতেও দার্শনিক চিন্তার ছাপ পাওয়া যায়। তিনি পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনা দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেননা তিনি পাশ্চাত্য দর্শন ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তবে অগাস্ট

কোঁতের দর্শন তার ওপর বেশি প্রভাব বিস্তার করে। বঙ্কিম চেয়েছিলেন পাশ্চাত্যের নব উদ্ভবিত জ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় প্রাচীন জীবনধারার সমন্বয় ঘটাতে।[৫২] দর্শন বিষয় সম্পর্কে বঙ্কিমের লেখনীর সূচনা আমরা দেখতে পাই প্রথম দিকের 'বঙ্গদর্শনে'। 'সাংখ্য দর্শন' বিষয়ক প্রবন্ধে বঙ্কিমের দার্শনিক প্রজ্ঞার উত্তম পরিচয় মেলে।[৫৩] পরবর্তীতে তাঁর মৌলিক প্রবন্ধ "জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত" প্রবন্ধটি ১৮৭৪-এ প্রকাশ পায়। পরে অবশ্য *প্রচার* পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি শুধু "জ্ঞান" শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ থেকে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার প্রসঙ্গ সম্পর্কে বেশ কিছুই জানতে পারি।[৫৪] এই প্রবন্ধকে ভিত্তি করেই আমরা বঙ্কিমের দর্শনচিন্তার সাথে পাশ্চাত্যচিন্তার মিল-অমিল তুলে ধরার চেষ্টা করব।

বঙ্কিমের দর্শনচিন্তা সম্পর্কে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বলেন, "... বঙ্কিমের দর্শনচিন্তা তাঁর সময়ের যে কারও থেকেই আলাদা। যখন তিনি সাংখ্য নিয়ে লিখছেন, তখনই তিনি ইয়োরোপের প্রত্যক্ষবাদ (empiricism) ধ্রুববাদ (Positivism) ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন।"[৫৫] বঙ্কিম তাঁর "সাংখ্যদর্শন" প্রবন্ধে জ্ঞানের প্রতি আর্যজাতির অনীহা রয়েছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, প্রকৃত জ্ঞানচর্চা না থাকার ফলে বেদের ভক্তি এবং যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মানুষের স্বাধীন চিন্তা লোপ পায় বলে তিনি মনে করতেন।[৫৬] বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মূলত জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু এবং মনুষ্যত্বের পূজারী। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সময়ে খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন জ্ঞান অন্বেষণে এবং অনুশীলনে দর্শনশাস্ত্রের বিকল্প নেই। তাই তিনি নিদ্বিধায় বলেছেন,

> "ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞান বিশেষ; তদতিরিক্ত অন্য উদ্দেশ্য নাই। দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে, কিন্তু সে জ্ঞানের উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য নিঃশ্রেয়স, মুক্তি ; নির্ব্বাণ বা তদ্‌বৎ নামান্তরবিশিষ্ট পারলৌকিক অবস্থা। ইউরোপীয় ফিলসফিতে জ্ঞানই সাধনীয়; দর্শনে জ্ঞান সাধন মাত্র। ইহা ভিন্ন আর একটি গুরুত্বর প্রভেদ আছে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞানবিশেষ, কখনো আধ্যাত্মিক, কখনো ভৌতিক, কখনো নৈতিক বা সামাজিক জ্ঞান। কিন্তু সর্বত্র পদার্থ মাত্রেরই জ্ঞান দর্শনের উদ্দেশ্য। ফলত: সকল প্রকার জ্ঞানই দর্শনের অন্তর্গত।"[৫৭]

বঙ্কিমের চিন্তায় শুধু দর্শনের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়নি, তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভেদ উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি তিনি সকল জ্ঞানের উৎসমূলে দর্শনশাস্ত্রকে চিহ্নিত করেছেন। এখানেই আমরা তাঁর দার্শনিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাই। বঙ্কিম মনে করেন দর্শনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো যথার্থ জ্ঞান অন্বেষণ। ভারতীয় দর্শনে এই যথার্থ জ্ঞান বলতে প্রমাকে বোঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলেন, "সেই যথার্থ জ্ঞান কি? যাহা জানি, তাহাই জ্ঞান। যাহা জানি, তাহা কী প্রকারে জানিয়াছি।"[৫৮] জ্ঞানের উৎস প্রসঙ্গে বঙ্কিম ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণকে স্বীকার করেছেন। এদিক থেকে বঙ্কিমকে আমরা

দৃষ্টিবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। কেননা বঙ্কিম নিজেই বলেছেন, "... প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল– সকল প্রমাণের মূল।"[৫৯] প্রত্যক্ষণ জ্ঞান হয় ইন্দ্রিয় সংযোগ থেকে। তিনি 'জ্ঞান' প্রবন্ধে প্রত্যক্ষণের শ্রেণিবিভাগ দেখিয়েছেন। যথা: চাক্ষুষ প্রত্যক্ষণ, শ্রবণ প্রত্যক্ষণ, ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষণ, ত্বাচ প্রত্যক্ষণ এবং রাসন প্রত্যক্ষণ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা এই পাঁচ প্রকার প্রত্যক্ষণের সাক্ষাৎ পাই। পরবর্তীকালে অবশ্য বঙ্কিমের এই মতের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। *ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থে তিনি প্রত্যক্ষণজাত জ্ঞানের সার্বিকতাকে অস্বীকার করে বলেন, সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষণ থেকে আসে না।[৬০] প্রত্যক্ষণের বাইরেও জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র বলতে চেয়েছেন প্রত্যক্ষণ ছাড়া জ্ঞানের অন্য উৎস রয়েছে অর্থাৎ তিনি একাধিক উৎসকে স্বীকার করেছেন। কেননা পরবর্তীতে তাঁর চিন্তায় মানস প্রত্যক্ষণের উল্লেখ দেখতে পাই। এই মানস প্রত্যক্ষণ অর্থাৎ অন্তর্জ্ঞান অনুমান প্রমাণের বিষয়। বঙ্কিমের নিজের ভাষায়, "... আকাশে মেঘ ব্যতীত কখন এরূপ ধ্বনি হয় নাই।... রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে থাকিয়াও আমরা বিনা প্রত্যক্ষে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ হইয়াছে। ইহাকে অনুমিতি বলে।"[৬১] বঙ্কিম বুঝতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, অনুমানের পরিধি এবং বিস্তৃতির ব্যাপকতা। অনুমানের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বকে বঙ্কিম সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অনুমানলব্ধ জ্ঞান ছাড়া জীবনের নানাবিধ সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। শুধু তাই নয় বিজ্ঞান এবং দর্শনও অনুমানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। বঙ্কিম সেই যুগে যে উপলব্ধি করেছিলেন তা তাঁর একটি মন্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তিনি বলেন, "মনুষ্য অল্প বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অধিকাংশ জ্ঞানই অনুমিতির ওপর নির্ভর করে। অনুমিতি সংসার চালাইতেছে। আমাদিগের অনুমানশক্তি না থাকিলে আমরা প্রায় কোনো কার্য্যই করিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান, দর্শনাদি অনুমানের ওপরেই নির্মিত।"[৬২]

অনুমানের ওপর বঙ্কিমের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি প্রত্যক্ষণের চেয়ে বরং অনুমানের দিকে ঝুকেছিলেন বেশি। প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি মানবজীবনের সীমাবদ্ধতাকে সামনে এনে অনুমানের ওপর নির্ভর করে সামনে অগ্রসর হতে চান। তবে প্রত্যক্ষণকে তিনি অস্বীকার করেননি। বঙ্কিমের জ্ঞানতাত্ত্বিক মত বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি যে বঙ্কিম মূলত জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানকে স্বীকার করেছেন এবং এর বাইরে অন্য কোনো জ্ঞানের উৎসের প্রয়োজন নেই বলে তিনি মনে করেন। তিনি বরং অনুমান এবং প্রত্যক্ষণের সমন্বয়ে জীবন পরিচালনার তাগিদ দিয়েছেন। এই আলোচনায় ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত আটটি স্কুলের চিন্তার সাথে বঙ্কিমের চিন্তার সাযুজ্য আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। কেননা চার্বাক ব্যতীত অন্য আটটি স্কুল প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানকে প্রধান প্রমাণ হিসেবে মেনেছেন। তবে কোনো কোনো স্কুল প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানের বাইরে জ্ঞানের উৎসকে স্বীকার

করেছেন। বঙ্কিমের জ্ঞানতাত্ত্বিক এই আলোচনা থেকে পাশ্চাত্য দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের চিন্তার সাথে তাঁর চিন্তার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আবার আলাদা আলাদাভাবে অভিজ্ঞতাবাদ এবং বুদ্ধিবাদের সাথে সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়।

পাশ্চাত্য দর্শনের প্রখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটলের চিন্তার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের মিল পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. এম মতিউর রহমানের বক্তব্য গ্রহণ করলে বিষয়টির স্পষ্টতা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "এরিস্টটলের সুবর্ণমধ্যক (Golden Mean) তত্ত্ব, আর বঙ্কিমচন্দ্রের সামঞ্জস্য (Balance) তত্ত্ব প্রায় একই। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র যে প্লেটো ও এরিস্টটলের ভাবাদর্শ দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা বোধ করি স্পষ্ট করে বলার অপেক্ষা রাখে না।"[৬৩]

প্রখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের চিন্তার সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কান্ট বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব নিরসনে এগিয়ে আসেন। বুদ্ধিবাদ জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বুদ্ধির ভূমিকাকে স্বীকার করেছে, বুদ্ধির বাইরে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ অন্যকোনো জ্ঞানের উৎসকে স্বীকার করেননি। অন্যদিকে অভিজ্ঞতাবাদ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের বাইরে জ্ঞানের অন্যকোনো উৎসকে মেনে নেননি। প্রখ্যাত অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক, ডেভিড হিউম এবং বিশপ বার্কলি অভিজ্ঞতার বাইরে জ্ঞানলাভের অন্য কোনো প্রক্রিয়াকে স্বীকার করেননি। এমতাবস্থায় কান্ট দেখলেন বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ উভয় মতবাদই একতরফা, একপেশে এবং অপূর্ণাঙ্গ। তিনি দেখলেন যে শুধু বুদ্ধি কিংবা শুধু অভিজ্ঞতা দিয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়। জ্ঞানের জন্য বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা উভয়ের প্রয়োজন। কেননা তিনি মনে করেন, বুদ্ধি থেকে আমরা পাই জ্ঞানের আকার আর অভিজ্ঞতা থেকে পাই জ্ঞানের উপাদান, নতুনত্ব। তাই কান্ট ঘোষণা করলেন জ্ঞানের জন্য উভয়ের সমন্বয় দরকার। আর জ্ঞানের ক্ষেত্রে কান্টের এই চিন্তা জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসে বিচারবাদ নামে পরিচিত। তাহলে দেখা যাচ্ছে কান্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা উভয়কেই গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে বঙ্কিমের চিন্তায়ও আমরা দেখি তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান পাওয়ার জন্য প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান বা বুদ্ধিকে গ্রহণ করেছেন। তাই আমরা বলতে পারি, এক্ষেত্রে তাঁদের চিন্তার মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

অন্যদিকে বঙ্কিমের চিন্তার সাথে পাশ্চাত্য দার্শনিক হিউম এবং জেমসের মতের বৈসাদৃশ্য পরিরক্ষিত হয়। হিউম অভিজ্ঞতার একমাত্র উৎস প্রত্যক্ষণকে গ্রহণ করে ইন্দ্রিয়ছাপ এবং ধারণা নামে দুটি ভাগে বিভক্ত করে ব্যাখ্যাদানে প্রয়াসী হয়েছেন, তবে তিনি মানসিক বা বৌদ্ধিক অর্থাৎ বুদ্ধিবাদী প্রয়াসকে জ্ঞানের উৎসের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেননি। আমেরিকান প্রয়োগবাদী দার্শনিক উইলিয়াম জেমস

তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে প্রচলিত অভিজ্ঞতবাদ বর্জন করে এক সর্বব্যাপক অভিজ্ঞতাবাদের কথা বলেছেন এবং তিনি তাঁর নাম দিয়েছেন মৌলিক অভিজ্ঞতাবাদ। তবে তিনিও সরাসরি বুদ্ধিকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। (যদিও পরোক্ষভাবে জেমসের চিন্তায় বুদ্ধি বা অনুমানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে) ফলে দেখা যাচ্ছে হিউম এবং জেমসের সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের পার্থক্য রয়েছে। কেননা বঙ্কিম জ্ঞানের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানকে স্বীকার করলেও হিউম এবং জেমস তা করেননি।

স্বামী বিবেকানন্দ যার আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৩-১৯০২) ভারতবর্ষের সমকালীন চিন্তানায়কদের মধ্যে অন্যতম। আধুনিক ভারত নির্মাণে স্বামী বিবেকানন্দের রয়েছে বিশাল ভূমিকা। বিবেকানন্দের চিন্তাপ্রতিভা প্রসঙ্গে সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "... তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের গভীরে অবগাহন করেন; ধর্ম ও দর্শনের মতো সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানেও তাঁর সমধিক দখল ছিল।"[৬৪] বস্তুত বিবেকানন্দ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের উভয় ধারাতে বিচরণ করেছিলেন এবং এর মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য চিন্তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। তিনি পাশ্চাত্যের যা কিছু সুন্দর, ভালো তা ভারতবাসীকে অকপটে গ্রহণ করতে বলেছেন। কেননা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের মধ্যে কোনো ধরনের গোঁড়ামি ছিল না বরং সরাসরি মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতি পরিপূর্ণভাবে ত্রুটি মুক্ত নয়। তাই পশ্চিমা সংস্কৃতির যা কিছু ভালো দিক আছে তা থেকে ভারতবর্ষকে শিখতে হবে।[৬৫] তিনি বেদান্ত দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। বিশেষ করে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবেদান্তে। বিবেকানন্দ তাঁর দর্শনচিন্তায় জ্ঞান সম্পর্কে খুব কমই আলোচনা করেছেন। তাঁর দর্শনচিন্তা তাঁর সমগ্র রচনার মধ্য দিয়ে অন্বেষণ করতে হয়। জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার প্রশ্নে আমরা শঙ্করের অদ্বৈতবেদান্তের প্রভাব স্বামী বিবেকানন্দের ওপর দেখতে পাই। এদিক থেকে বলা যায় স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ছিল প্রায়োগিক। কেননা দর্শন ও সংস্কৃতির যা কিছু ভালো দিক তিনি তা জীবনে প্রয়োগ করার কথা বলেছেন। পাশ্চাত্য দুনিয়ার কর্মদক্ষতা, ব্যবহারিক কৌশলতা, জাগতিক উন্নতিকল্পে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং প্রাচ্যের মানবজীবনে তা প্রয়োগের চিন্তা করেন তবে, তা অবশ্যই নিজস্ব স্বকীয়তাকে বজায় রেখে।[৬৬] এ প্রসঙ্গে অমলেন্দু দে'র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে বলেন, "... তিনি পাশ্চাত্য থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিতে চান, আর পাশ্চাত্যকে দিতে চান বেদান্ত। পাশ্চাত্যের কর্মদক্ষতা আর প্রাচ্যের আদর্শবাদের সমন্বয়ে তিনি এক নতুন জগৎ রচনার কথা বলেন।"[৬৭] বেদান্ত প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক দর্শন সম্প্রদায়ের প্রধানতম দর্শন হিসেবে বিবেচিত। এই বেদান্ত কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়। বেদান্তে মূলত ভারতীয় মুনি-ঋষিদের উপলব্ধিজাত শাশ্বত সত্য এবং

জীবনকেন্দ্রিক নিদের্শাবাদীর যুগযুগান্তর ব্যাপী সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার। মানবজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ নিজে বলেন, "... এই দর্শনের আলোকে জীবনগঠন ও জীবনযাপন করা অবশ্যই সম্ভব,... বেদান্ত আমাদিগকে আদর্শ সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়া থাকেন,... আমাদের জীবনে দুইটি প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়– একটি আমাদের আদর্শকে জীবনের উপযোগী করা, আর অপরটি এই জীবনকে আদর্শের উপযোগী করা।"[৬৮] শঙ্কর যেমন জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্নে জ্ঞানের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেন, "যথার্থ জ্ঞান বুদ্ধির অধীন নয় বস্তুর অধীন, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান বস্তুর অধীন। যে বস্তু যেমন সেরূপ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। অনুভবই যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে।"[৬৯] জ্ঞানের উৎসের ক্ষেত্রে শঙ্কর ভাট্ট মীমাংসকদের মতো ছয়টি প্রমাণে বিশ্বাস করেন। শঙ্করের দর্শনে তাই জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়ায় এর উৎস হিসেবে প্রত্যক্ষণ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধিকে স্বীকার করা হয়েছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে স্বামী বিবেকানন্দকে জ্ঞানের স্বরূপ প্রকারভেদ এবং উৎসের ক্ষেত্রে অদ্বৈতবেদান্তের বিষয়সমূহকে স্বীকৃতি দিতে হয়। তাই আমরা স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে জ্ঞানের উৎসের বেলায় প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান বা বৌদ্ধিক দিকে স্বামী বিবেকানন্দ অগ্রসর হয়েছেন বলে ধরে নিতে পারি। অন্যান্য প্রমাণের উপস্থিতির ক্ষেত্রে শঙ্করাচার্যের উপনিষদের জ্ঞানভাগের দিকে ঝোক বেশি ছিল। বিবেকানন্দ শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে বেদান্তের সারতত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাহলে শঙ্কর কর্তৃক স্বীকৃত প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন একথা আমরা ধরে নিতে পারি। আর এদিক থেকে বিবেচনা করলে পাশ্চাত্য দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট, জেমস, হিউম প্রমুখের সাথে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার মিল পরিলক্ষিত হয়। কান্ট তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় অভিজ্ঞতাবাদ এবং বুদ্ধিবাদের সমন্বয় করেছেন। কেননা শুধু বুদ্ধি কিংবা শুধু অভিজ্ঞতা দিয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান পাওয়া যায় না। তাই তিনি বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা উভয়ের মিলনে পূর্ণ জ্ঞানের অন্বেষণ করেছেন। আমেরিকার প্রখ্যাত প্রয়োগবাদী দার্শনিক উইলিয়াম জেমস তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদে যে সর্বব্যাপক এবং বিশুদ্ধ মৌলিক অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তা ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর অভ্যন্তরে রয়েছে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান। অন্যদিকে ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউমের ইন্দ্রিয়ছাপ এবং ধারণার বিস্তারিত বিশ্লেষণে গেলে দেখা যায় এর অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান সম্পর্কিত ধারণা লুকায়িত আছে। অন্যদিকে ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্ত দার্শনিক শঙ্কর তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানকে অন্যতম প্রমাণ হিসেবে মেনেছেন। আর ভারতীয় আরেক সমকালীন দার্শনিক স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন। তাই এদিক থেকে বিবেচনা করলে আমরা বলতে পারি, স্বামী বিবেকানন্দের সাথে কান্ট, জেমস এবং হিউমের চিন্তার সাদৃশ্য রয়েছে।

জীবনের রূঢ় বাস্তবতা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা স্বামীজীর মনে জীবন-জিজ্ঞাসার উদ্রেক করেছিল– একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনি উপলব্ধি করলেন মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, শক্তি, সাহস, ধ্যান এবং কর্মপ্রয়াসকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হলে জ্ঞানচর্চার বিকল্প নেই। তাই তিনি জীবনবাস্তবতার সমস্যার সমাধানে জ্ঞান অন্বেষণে মানবজাতিকে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। স্বামীজী নিজেও মনে করতেন, "... জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বেদান্ত ভারতের সকল সম্প্রদায়ের একমাত্র উৎস।"[৭০]

বিশশতকে ভারতবর্ষের চিন্তার ও জ্ঞানালোকের ইতিহাসে মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই মহান পুরুষ এম. এন. রায় নামেও সুপরিচিত ছিলেন। এই মেধাবী ব্যক্তিত্ব দর্শনশাস্ত্র, সমাজতন্ত্র, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ প্রভৃতি বিষয়ে স্বীয় অধ্যয়ন বলে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[৭১] পাশ্চাত্য চিন্তাধারা এবং দর্শনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন এই ভারতীয় মনীষী। এ প্রসঙ্গে স্বদেশরঞ্জন দাসের উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "... একমাত্র রায়ের সঙ্গেই হবস, লক বা বেন্থামের মত চিন্তা-নায়কদের তুলনা করা চলে।"[৭২] মার্কসবাদী এই দার্শনিক জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে আলাদাভাবে কোনোকিছু রচনা করেননি। তবে তাঁর বিভিন্ন রচনায় জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। বস্তুবাদকে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা তিনি ভেবেছেন এই দর্শন স্বয়ংসম্পূর্ণ। মনোজগৎকেও তিনি বস্তুজগতের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আর মানুষকে দেখেছেন প্রকৃতি- জগতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। জৈবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে আমাদের যৌক্তিক বিন্যাসও নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় জগতের অংশ হিসেবে। মানবেন্দ্রনাথ মনে করেন মানুষের সকল ধরনের আচরণ বিশ্লেষণ করা যায় সেজন্য আমরা মানুষকে বৌদ্ধিক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করি। মানবেন্দ্রনাথ বস্তুবাদরে ক্ষেত্রে ভাব এবং বুদ্ধির সংযোগ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর দর্শনের সৌধ যৌক্তিকতা এবং নৈতিকতাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে।"[৭৩] মানুষের জ্ঞান, গবেষণাকে কেন্দ্র করে তাঁর দর্শন সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে। তাঁর চিন্তার বিশ্লেষণ থেকে আমরা দেখি তাঁর দর্শনের একদিকে রয়েছে বস্তুবাদ এবং অন্যদিকে গতিশীলতা। দর্শনের কাজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "... জগতের খণ্ড খণ্ড জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সমন্বিত জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতি ও জীবন যে একই নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে, তা প্রমাণ করা।"[৭৪] আর দর্শনের এই সত্যকে কাজে লাগাতে হলে জ্ঞানচর্চা এবং অনুশীলন অনিবার্য। তিনি মনে করেন জ্ঞান লাভ করতে হলে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, যাচাই-বাছাই ও বিভিন্ন ঘটনা এবং বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় জরুরি। এম. এন রায়ের চিন্তায় আমরা অভিজ্ঞতার ওপর বেশ গুরুত্ব প্রদান করতে দেখি। অভিজ্ঞতাকে তিনি

শুধু দর্শন নয়, দর্শনের বাইরে বিজ্ঞানেও কাজে লাগাতে চান। কেননা তিনি জোরালোভাবে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, "মানুষের অভিজ্ঞতাই বিজ্ঞানের মালমসলা। এই সব অভিজ্ঞতা ছাড়া আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান তার দুর্জ্ঞেয় গাণিতিক সূত্রসমূহ কেবল মানসিক জগতের আনুমানিক কল্পনার সাহায্যে রচনা করতে পারত না।"[৭৫] অর্থাৎ অভিজ্ঞতাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে। মানবেন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে আমরা এই জগতের মৌল উপাদানের স্বরূপ সন্ধান করি। অর্থাৎ মানববেন্দ্রনাথ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন– একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আবার অন্যদিকে তিনি জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে আবার ভিন্ন কথাও বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর কথার সুরে আমরা অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার ইঙ্গিত পাই। তাঁর নিজের ভাষায়, "যেহেতু মানুষের জ্ঞান লাভ করার এমন ক্ষমতা নেই যে, সে একেবারে সব কিছু জানতে পারে,..."[৭৬] মানবেন্দ্রনাথ এক সময় অভিজ্ঞতাকে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করলেও তিনি সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞতার ওপর যে নির্ভরশীল ছিলেন না তা তাঁর 'জ্ঞানার্জন বিদ্যার বৈজ্ঞানিক বিধিবিধান' প্রবন্ধ থেকে জানা যায়। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, "... জ্ঞানার্জন বিদ্যার সহজ সরল অভিজ্ঞতালব্ধ তত্ত্বের মধ্যে ছিল ভুল এবং দ্ব্যর্থবোধক অনিশ্চয়তা।"[৭৭] শুধু তাই নয় মানবেন্দ্রনাথ জগৎসম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতার কথাও বলেছেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনশীলতার বিষয়টির প্রথম ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয় পাশ্চাত্যের প্রাচীন যুগের দার্শনিক হিরাক্লিটাসের চিন্তায়। তিনিই প্রথম পরিবর্তনশীলতাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। মানবচিন্তার সবকিছু যে পরিবর্তনশীল সে ধারণা আমরা প্রথমে পাই হিরাক্লিটাসের কাছ থেকে।[৭৮] পরবর্তীতে প্রখ্যাত আমেরিকান প্রয়োগবাদী দার্শনিক উইলিয়াম জেমসও জ্ঞানের পরিবর্তনশীলতার কথা বলেছেন। এদিক থেকে বিবেচনা করলে হিরাক্লিটাস এবং জেমসের জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিবর্তনশীলতার সাথে মানবেন্দ্রনাথের চিন্তার সাদৃশ্য দেখতে পাই।

পরিশেষে বলা যায়, জ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের প্রভাবশালী দার্শনিক কান্টের চিন্তায় যেমন আমরা বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি দেখতে পাই, তেমনি মানবেন্দ্রনাথের চিন্তায়ও আমরা বিশেষ করে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে দ্বৈতবাদী চিন্তার উল্লেখ দেখতে পাই অর্থাৎ তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে অকপটে অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "অভিজ্ঞতাই হলো জ্ঞানের মূল ভিত্তি।"[৭৯] আবার তিনি একই প্রসঙ্গে বলছেন, "... এই জানা ক্রিয়াটি কেবলমাত্র অভিজ্ঞতাভিত্তিক নয়– তা হলো নির্বাচনমূলক, ব্যাখ্যামূলক, পদ্ধতিমূলক এবং সমন্বয়সাধক।"[৮০] অর্থাৎ মানবেন্দ্র যখন বলছেন নির্বাচনমূলক, ব্যাখ্যামূলক ইত্যাদি তখনই কিন্তু তিনি বুদ্ধি কিংবা অনুমানের বিষয়টিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি জানা ক্রিয়াটিকে মানসিক কর্ম হিসেবে অভিহিত করে বলেন, "জ্ঞান অর্জন হলো

মনের ক্রিয়া।"[৮১] অর্থাৎ মানবেন্দ্রের চিন্তায় আমরা বুদ্ধি কিংবা অনুমানের বিষয়টির স্পষ্টতা দেখতে পাচ্ছি। আবার তিনি জানা ক্রিয়াটিকে সমন্বয় সাধক হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৮২] মানবেন্দ্রনাথের এসব দিককে আমরা কান্টের চিন্তার সাথে তুলনা করতে পারি। কেননা কান্টের মতো তিনিও বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করে এদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের কথা বলেছেন। তাই এদিক থেকে বিবেচনা করলে আমরা বলতে পারি উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বা মিল রয়েছে।

সবশেষে এই অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা বলতে পারি যে, ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার মধ্যে যেমন সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি রয়েছে বৈসাদৃশ্য বা অমিল। তবে উভয় জ্ঞানতত্ত্বের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অভিন্ন। অর্থাৎ মানবকল্যাণ এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটানো। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয়ই অঞ্চলের দার্শনিকগণ এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, জ্ঞানার্জন, জ্ঞানের অনুশীলন এবং প্রয়োগ ব্যতীত মানবজীবনের সার্থকতা এবং সফলতা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তবে এ সত্য অকপটে স্বীকার করতে হয় যে, জ্ঞানতাত্ত্বিক এই আলোচনার সূচনা বা সূত্রপাত ভারতীয় দার্শনিকরাই প্রথম করেছিলেন। তাই সময়, কাল এবং কৃতিত্বের বিচারে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব যে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ইতিহাসে পাইওনিয়ার বা অগ্রদূত তা নিশ্চিত করে বলা যায়। এজন্য ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের কাছে পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব ঋণী– একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol.2, (New Delhi : Oxford University Press, 2006), p. 23

২. শ্রীতারকচন্দ্র রায়, *ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা : গুরুদাস এ্যান্ড কোং, ১৩৬৭), পৃ. ১১

৩. Robert Ackermann, *Theories of Knowledge*, (Bombay : Tata McGraw- Hill Publishing Co. Ltd., 1965), Introduction

৪. Paul Edwards (ed.) *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol.1 (New York : Macmillan Publishing Co. Inc. and Free Press, 1972), p. 9

৫. কালী প্রসন্ন দাস, *ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা : চার্বাক ও হিউম*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ১

৬. W.T. Stace, *A Critical History of Greek Philosophy*, (New York : St. Martin's Press, 1967), p. 74-75

৭. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

৮. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ. ২২১

৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৬

১০. Chandradhar Sharma, *A Critical Survey of Indian Philosophy*, (U.S.A. : Barnes & Noble, Inc., 1962) p. 186

১১. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১

১২. Harold H. Titus, *Living Issues in Philosophy*, (New Delhi : Eurasia Publishing House (p.) Ltd., 1968), p. 28

১৩. আবদুল মতীন, *দর্শনের রূপরেখা*, অনুবাদ, আবদুল মতীন ও প্রদীপ রায়, (ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৭), পৃ. ৮৩

১৪. আবদুল মতীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

১৫. David Hume, *A Treatise of Human Nature*, D.G.C. Macnabb (ed.), (London and Glasgow : Fontanan/ Collins, 1970), p .45

১৬. ডেভিড হিউম, *মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষা*, অনুবাদ, আবু তাহা হাফিজুর রহমান (ঢাকা : পলল প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ. ১৭

১৭. David Hume, *op.cit.*, p. 45

১৮. *Ibid*, p. 45

১৯. আবদুল মতীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

২০. চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৯), পৃ. ৭

২১. Frank Thilly, *A History of Philosophy*, (Allahabad : Central Book Depot, 1975), p. 305

২২. আবদুল মতীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০

২৩. চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

২৪. আবদুল মতীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

২৫. Kant, *Critique of Pure Reason*, Eng. Trans., Norman Kemp Smith, (London : Macmillan and Co. Ltd., 1953), p. 41

২৬. আবদুল মতীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

২৭. রাসবিহারী দাস, *কান্টের দর্শন*, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৩), পৃ. ৮

২৮. John Kemp, *The Philosophy of Kant*, (Oxford, London, Glasgow : Oxford University Press, 1968), p. 16

২৯. সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন, *কান্টের দর্শন*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ১৭

৩০. মো : আব্দল মুহিত, *ইমানুয়েল কান্টের জ্ঞানতত্ত্ব ও নীতিদর্শন*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০২০) পৃ. ৪২-৪৩

৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

৩২. সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন, *সমকালীন দর্শনের কয়েকটি ধারা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯), পৃ. ৭৬

৩৩. পারভেজ ইমাম, *প্রয়োগবাদের রূপরেখা*, (ঢাকা : অনন্যা, ২০০২), পৃ. ৮৪

৩৪. William James, *Essays in Radical Empiricism,* (ed.) (U.S.A. : Ralph Barton Perry, 1912), p. 42

৩৫. পারভেজ ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫

৩৬. মো : আবদুল মুহিত, *বিশ্লেষণী দর্শনের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, (ঢাকা : অবসর প্রকশনা সংস্থা, ২০১৭), পৃ. ১৬৩

৩৭. সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪

৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪

৩৯. গালিব আহসান খান, *বিজ্ঞান, পদ্ধতি ও প্রয়োগ*, (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকশনা, ২০০৯), পৃ. ২৩

৪০. John Passmore, *A Hundred Years of Philosophy*, Reprinted, (Great Britain : Penguin Books Ltd., 1984), p. 393

৪১. সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

৪২. মো : নূরুজ্জামান, *বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দর্শন*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৪), পৃ. ১০১

৪৩. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

৪৪. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৮

৪৫. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭

৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮-২৫৯

৪৭. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪

৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১

৪৯. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১

৫০. যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খন্ড, (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৪৯), পৃ. ২৭

৫১. মো : মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন : মানুষ ও সমাজ*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০০), পৃ. ৩৯৪

৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৯

৫৩. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, "বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন চিন্তা : বহুগ্রাহিতার বিপদ", শরীফ হারুন, সম্পাদিত, *বাংলাদেশে দর্শন ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, দ্বিতীয় খন্ড, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯), পৃ. ৩১৭

৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৯

৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৯

৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২১

৫৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "রচনাসমগ্র", *বিবিধ প্রবন্ধ*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা : সালমা বুক ডিপো, ২০০১), পৃ. ২০২

৫৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩

৫৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪

৬০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "রচনাসমগ্র", *ধর্মতত্ত্ব (অনুশীলন)*, (ঢাকা : সালমা বুক ডিপো, ২০০১), পৃ. ৫২২

৬১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "রচনাসমগ্র", *বিবিধ প্রবন্ধ*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা : সালমা বুক ডিপো, ২০০১), পৃ. ২০৩

৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩

৬৩. এম. মতিউর রহমান, *বাঙলার দার্শনিক মনীষা*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ২৭৫

৬৪. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা*, ২য় খন্ড, (কলকাতা : জি. এ. ই. পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্কারণ, ১৯৯১), পৃ. ১৮

৬৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, "আচার্য বিবেকানন্দ", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, (কলকাতা : রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০১২), পৃ. ২১

৬৬. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, "স্বামী বিবেকানন্দর জীবন-দর্শন", শরীফ হারুন, সম্পাদিত, *বাংলাদেশ দর্শন, ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৬

৬৭. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যান্য, *স্বামী বিবেকানন্দ : মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে*, চতুর্থ মুদ্রণ, (কলকাতা, ন্যাশলান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬), পৃ. ১৬৬

৬৮. স্বামী বিবেকানন্দ, *জ্ঞানযোগ*, (কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০২), পৃ. ১৯৯-২০০

৬৯. সাইয়েদ আবদুল হাই, *ভারতীয় দর্শন*, (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭), পৃ. ১৪১

৭০. *স্বামীজীর বাণী ও রচনা*, পঞ্চম খন্ড, চতুর্থ সংস্করণ, (কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৩), পৃ. ২২০

৭১. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন : প্রাচীনকাল থেকে সমকাল*, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২), পৃ. ১৮৩

৭২. স্বদেশরঞ্জন দাস, *মানবেন্দ্রনাথ : জীবন ও দর্শন*, ২য় সংস্করণ, (কলকাতা : র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট মুভমেন্ট, ১৯৭০), পৃ. ৪৯২

৭৩. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭

৭৪. এম. এন. রায়, *বিজ্ঞান ও দর্শন*, অনুবাদ, বদিউর রহমান, (ঢাকা : নালন্দা, ২০১৮), পৃ. ৪৭

৭৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

৭৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

৭৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

৭৮. W.T.Stace, *op.cit.*, p. 74

৭৯. এম. এন. রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭

৮০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭

৮১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫

৮২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭

সপ্তম অধ্যায়

সমকালীন প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা

সপ্তম অধ্যায়

সমকালীন প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রত্যক্ষণ ও অনুমানের প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা

পূর্বে আলোচিত অধ্যায়গুলোর বিশ্লেষণ থেকে আমরা বলতে পারি ভারতীয় দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তাদের জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনার সর্বজনীনতা ও ব্যাপকতা। প্রচলিত নয়টি সম্প্রদায়ের সবাই জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন যা পাশ্চাত্য দর্শনের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় না। এই ভারতীয় দর্শনের প্রায় সকল সম্প্রদায় জ্ঞানের উৎস, পদ্ধতি, সীমা, বৈধতা, সম্ভাব্যতা ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রশ্নের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখিয়েছেন। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে প্রত্যক্ষণ ও অনুমান সম্পর্কিত আলোচনার ব্যাপকতা এবং গভীরতা লক্ষ করা যায়।

জ্ঞানের যথার্থতা জ্ঞানের উৎপত্তি বা উৎস এবং বিষয়সমূহ বৈধ শর্তাবলির ওপর নির্ভর করে। প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান প্রমাণ এই বৈধ শর্তাবলিকে কেন্দ্র করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। তাই শুধু ভারতীয় নয় সমগ্র জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানের ভূমিকা অপরিসীম।

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় আমরা দেখি যে, প্রতিটা স্কুল তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে জ্ঞানের মৌলিকত্বকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা মীমাংসা দর্শনের কথা বলতে পারি। মীমাংসা দার্শনিকগণ যথার্থ জ্ঞানের অর্জনের ক্ষেত্রে চারটি শর্তের কথা বলা হয়েছে। যেমন: (১) যথার্থ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনোরকম কারণ দোষ থাকলে হবে না, (২) যথার্থ জ্ঞানকে অন্যকোনো জ্ঞান দ্বারা খণ্ডন করা যাবে না, (৩) যথার্থ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু নতুনত্ব থাকা চাই এবং (৪) যথার্থ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর সঠিক উপস্থাপনা থাকতে হবে।[১] মোটকথা জ্ঞানের সত্যাসত্য, এর ব্যবহার, কার্যকারিতা এবং প্রয়োগ আমাদের সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।[২]

অদ্বৈত বেদান্তে যে ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে তা মানবজীবনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অবভাসিক বস্তু কিংবা ঘটনার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জ্ঞান সম্ভব হয়ে থাকে। এই ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো যে, "জ্ঞানের বিষয়গত উদ্দিষ্টের সহিত ইন্দ্রিয়গত ও বুদ্ধিগত সম্পর্কের ওপর এই প্রকার জ্ঞানের যথার্থতা নির্ভর করে।"[৩] তবে বৈদান্তিকরা একথা বলেছেন যে এই জ্ঞান খণ্ডিত জ্ঞান এবং তাতে বিভিন্ন ত্রুটি রয়েছে। তাঁদের মতে পারমার্থিক জ্ঞানে কোনো ভেদ বা দোষ পরিলক্ষিত হয় না। এই জ্ঞান প্রসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য হলো, "ইহা অদ্বৈত সত্যের জ্ঞান। ইহা

স্বতঃপ্রমাণিত বা স্বতঃসিদ্ধ।"[৪] এই জ্ঞান বুদ্ধিগত বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে। এই জ্ঞান একমাত্র উপলব্ধি সাপেক্ষ জ্ঞান।

বাস্তবজীবনে আমরা দেখি যে অদ্বৈত বৈদান্তিকেরা যা তাঁদের জ্ঞানতত্ত্বে ব্যক্ত করেছেন তার প্রতিফলন মানবজীবনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত এই ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জ্ঞানের বৃত্তে মানবজীবন যে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বৌদ্ধ দার্শনিকরাও দৃঢ়ভাবে জ্ঞানবিদ্যা অনুশীলনের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন মানবজীবনে প্রথমে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমার যৌক্তিক অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করা জরুরি, এরপর পরাবিদ্যা-সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত।[৫]

ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় আমরা দেখি যে, জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে সক্রেটিসের চিন্তায়ও আমরা দেখি যে তিনি জ্ঞানকে কর্মে পরিণত করার কথা বলেছেন অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ী চিন্তার ওপর সক্রেটিস গুরুত্বারোপ করেছেন। বিশ্ববাস্তবতায় জ্ঞান ও কর্মের সম্মিলন ছাড়া যে কোনো কাজে সাফল্য পাওয়া যায় না সেকথাই ভারতীয় দর্শন এবং সক্রেটিসের দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে। গীতায়ও প্রধানত তিনটি যোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা: ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বৈরাগ্যবিষয়ক আলোচনা গীতার মুখ্য কোনো আলোচনা নয় বরং কর্মযোগ গীতায় প্রধান আলোচনার বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এখানে জ্ঞান এবং ভক্তি কর্মের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। তবে এখানে ফলাফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্মনীতির প্রতি অবিচল থেকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা বিবেক দ্বারা চালিত হতে পারলে মানুষের কল্যাণ করা সম্ভব।

ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান, জ্ঞানের স্বরূপ ও প্রকৃতি, জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞানের প্রমাণ্য বিষয়ক আলোচনাকে অন্যান্য দার্শনিক সমস্যাসমূহের প্রারম্ভিক আলোচনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জ্ঞানের যথার্থতা নিয়ে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যায় গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। একটি যথার্থ জ্ঞান কীভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে, এই যথার্থ জ্ঞান কখন যথার্থ বলে গৃহীত হয়– এসব বিষয়কে ভারতীয় দার্শনিকগণ তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় গুরুত্বের সঙ্গে স্থান দিয়েছেন।

ভারতীয় দার্শনিকদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় মুল লক্ষ্য ছিল মানবজীবনের অর্থকে উপলব্ধি করা এবং জীবনের বহুমুখী সমস্যার সমাধানকল্পে জ্ঞানকে ব্যবহারিকভাবে জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করা। অর্থাৎ নিছক জ্ঞানের চর্চার জন্য ভারতীয় দার্শনিকগণ জ্ঞানচর্চা করেননি। জীবনের বাস্তবসমস্যা মোকাবিলার সহায়ক হিসেবে তাঁরা জ্ঞানচর্চা করেছেন। যে তত্ত্ব নিছক বিমূর্ত, যার কোনো প্রায়োগিক

বা বাস্তব উপযোগিতা নেই তা কখনো মানবকল্যাণে আসতে পারে না; এ সত্য ভারতীয় দার্শনিকগণ ভালোভাবে বুঝেছিলেন।

মানুষের মধ্যে জ্ঞানগত বিষয়: যুক্তি, বুদ্ধি, এষণা-প্রেষণা এবং সংবেদন আছে বলে সে শাশ্বত কিংবা প্রাক-সিদ্ধ সত্যকে জানতে পারে। অন্যদিকে ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে যেটুকু জ্ঞানগত বিষয় পরিলক্ষিত হয় তা শুধু ইন্দ্রিয় সংবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং প্রাণীদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ধারণা অস্পষ্ট এবং অবিভক্ত থাকে।[৬]

ভারতীয় দার্শনিকগণ বাস্তব উপযোগিতা বিবেচনা করে তাঁরা যে জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ প্রদান করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। সময় এবং যুগের বিচার-বিবেচনায় ভারতীয় দার্শনিকদের জ্ঞানতত্ত্বে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান প্রমাণের যে বিস্তারিত বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হয় তা প্রাচ্যের অন্য কোনো দর্শন কিংবা পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ, প্রায়োগিক এবং নিরীক্ষাধর্মী। তাছাড়া আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের অনেক রসদ এবং যুক্তি প্রাচ্যের অন্যান্য দর্শন এবং পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বে দেখা যায়। তাই এই আলোচ্য অভিসন্দর্ভের সমীক্ষা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রত্যক্ষণ ও অনুমান প্রমাণের আলোচনা প্রচ্যের অন্যান্য দর্শনের কিংবা পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব থেকে উন্নত, সমৃদ্ধ এবং জীবনবাদী।

মানুষ ও মানুষের সমাজজীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জ্ঞানচর্চার বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি মানবজীবনে জ্ঞানের অন্বেষণ প্রসঙ্গে *জ্ঞানযোগ* গ্রন্থে বলেন, "জ্ঞান কখনও জড়ে ছিল না, উহা বরাবর মানুষের ভিতরেই ছিল। জ্ঞান কেহ কখনও সৃষ্টি করে নাই; মানুষ উহা আবিষ্কার করে, ভিতর হইতে উহাকে বাহির করে, উহা ভিতরেই রহিয়াছে।"[৭] ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনার পরবর্তী প্রভাব আমরা পাশ্চাত্য দর্শনের বিভিন্ন দার্শনিকদের আলোচনায় দেখতে পাই। বার্কলি, লক, প্রাইস, ম্যুর প্রমুখ এই প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। অবশ্য তাঁরা প্রত্যক্ষণ শব্দটির পরিবর্তে সংবেদোপাত্ত শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পাশ্চাত্যের প্রভাবশালী দার্শনিক জর্জ বিশপ বার্কলির চিন্তায়ও আমরা প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনা দেখতে পাই। তিনি *Three Dialogues Between Hylas and Philonous* -এ বলেন যেসব বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ে হঠাৎ করে প্রত্যক্ষিত হয় তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু।[৮] সি. ডি. ব্রডও সংবেদোপাত্ত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন সংবেদোপাত্ত হলো এমন ধরনের বস্তু যেসব সম্পর্কে প্রত্যক্ষণজাত অবস্থায় আমরা সরাসরিভাবে সচেতনতা লাভ করে থাকি। এইচ. এইচ. প্রাইসের মতে সংবেদোপাত্ত হলো তাই যা সরাসরিভাবে

আমাদের চেতনায় উপস্থিত হয়। জি. ই. ম্যুরও সংবেদোপাত্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, সংবেদোপাত্ত হলো সেসকল জিনিস যা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়।[৯]

ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) *A Triatise of Human Nature* গ্রন্থে অভিজ্ঞতাবাদের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি বলেন মানুষের সকল জ্ঞানের উৎস হলো ইন্দ্রিয়জ ও ধারণা (Impression and Idea)। ইন্দ্রিয়জকে তিনি তীব্র, সুস্পষ্ট এবং প্রাণবন্ত প্রত্যক্ষণ বলেছেন এবং ধারণাকে অস্পষ্ট, ক্ষীণ এবং দুর্বল মানস প্রতিরূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। হিউম মনে করেন মানবমনে সকল প্রকার জ্ঞান এই ইন্দ্রিয়জ থেকে আসে।

প্রত্যক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনা পাশ্চাত্যের প্রভাবশালী দার্শনিক রাসেলের জ্ঞানতত্ত্বে গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে। প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে রাসেল প্রথম আলোচনা করেন *The Problems of Philosophy* (১৯১২) গ্রন্থে। এই গ্রন্থে দেখা যায় তিনি সরল বাস্তববাদকে বর্জন করেন। রাসেলের মত ছিল অনেকটা এরূপ, "... আমাদের পরিচিতি কোনো দৈশিক-কালিক (Spatio-temporal) বস্তুর সাথে হয় না, হয় সংবেদোপাত্তের সাথে। সংবেদোপাত্ত হলো "সেই সব জিনিস যাদেরকে সংবেদনে তাৎক্ষণিকভাবে জানা হয়।"[১০]

বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক সক্রেটিসও মানবজীবনে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন, 'Know Thyself.' এই আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে সক্রেটিস মানুষকে জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে চেয়েছেন। কেননা ভালো বা উত্তম জীবনযাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন জ্ঞান বা আত্মজ্ঞানকে। এই আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে সক্রেটিসের অভিমত ছিল এরূপ যে, মানুষ নিজেকে জানার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে স্বর্গসুখী হতে পারে, আর না জানা বা অজ্ঞানতার কারণে নিজ থেকেই অনেক মন্দ কাজ করে থাকে। কেননা আত্মজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ ভালো-মন্দ নিরূপণ করতে পারে।[১১] জ্ঞানকে তিনি তাঁর দর্শন আলোচনার মূলমন্ত্র হিসেবে দেখেছেন। 'Knowledge is virtue'- অর্থাৎ জ্ঞানই পুর্ণ্য, জ্ঞানেই মুক্তি। বলা হয়ে থাকে এই বাক্যটিতে সক্রেটিস তাঁর জ্ঞান আলোচনার বহু বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই বিষয়টির আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, অধ্যাপক রাশিদা আখতার খানমের *নীতিবিদ্যা : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ* গ্রন্থে। তিনি সক্রেটিসের চিন্তাকে এভাবে তুলে ধরেছেন,

> ... জ্ঞান ব্যক্তি মানুষকে আত্ম-বিচারী করতে সাহয্য করে এবং আত্ম-বিচারী হয়ে ব্যক্তি নিয়মানুগ, সংযমী ও সুশৃঙ্খল জীবনাভ্যাস রপ্ত করতে সক্ষম হয়। জ্ঞানের অনুশীলন মানুষকে সংযমী, রুচিশীল ও পরিণতিতে অধিক মননশীল করে তুলতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞানই মানুষকে প্রচলিত অযৌক্তিক প্রথা থেকে মুক্তি দেয়। স্থবিরতা থেকে মুক্ত হওয়া, নিজেকে সুশৃঙ্খল করা, আত্ম-বিচারী হওয়া- এগুলো জ্ঞান থেকে ঘটে। "জ্ঞানই সদ্‌গুণ" বলতে সক্রেটিস এ বিষয়কে বুঝাতে চেয়েছেন।[১২]

প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল মানবজীবনে জ্ঞানের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন, ভালো জীবন হলো জ্ঞান দ্বারা চালিত এবং ভালোবাসা দ্বারা অনুপ্রাণিত।[১৩] অর্থাৎ রাসেল মনে করেন উত্তম বা আদর্শ জীবন গড়তে হলে ভালো পরিবেশে মানবজীবনকে লালিত-পালিত হওয়ার পাশাপাশি জ্ঞানচর্চাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। রাসেল ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, জ্ঞানহীন জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো মূল্য নেই। তাই তিনি ব্যক্তিজীবনে মানুষকে জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।

প্লেটোও মনে করেন রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা জ্ঞানী ব্যক্তিদের হাতে নিয়োজিত থাকবে, তাহলে মানুষের মুক্তি আসবে। আর এতে মানবজীবনের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সংকট দূরীভূত হবে। প্লেটোর ভাবনায় শাসক হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে দার্শনিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর মতে এরূপ ব্যক্তিরা নিজ জীবন গঠনে সচেতন হবে এবং সাধারণ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে কল্যাণকর দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। আর যদি জ্ঞান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণকারী ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকে তাহলে সে পদে পদে ভুল করবে এবং এই ভুলের খেসারত জনগণ এবং রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে।

সক্রেটিস আরো বলেছেন, 'The Unexamined life is not worth living' অর্থাৎ অপরীক্ষিত জীবনের কোনো মূল্য নেই। আর নিজেকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে তাগিদ বিবেক থেকে আসবে বলে তিনি মনে করতেন। তিনি মনে করতেন, মানুষ জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে তার বিবেককে শাণিত করতে পারে। আর তখনই বিবেকবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ ন্যায় এবং ভালো কাজ করবে।[১৪]

একই জাতীয় কথার তীব্র প্রতিধ্বনি আমরা জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের চিন্তায়ও দেখতে পাই। তিনিও জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ বিবেকবোধের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে কান্ট নিঃশর্ত নৈতিক কর্তব্য পালনের কথা বলেছেন।[১৫]

প্রভাবশালী আমেরিকান দার্শনিক জেমস এর মতে, কোনো ধারণা জ্ঞান হতে হলে তা ব্যবহারিক জীবনের জন্য উপযোগী ও মূল্যবান হতে হবে। কেননা জ্ঞান একটি প্রক্রিয়া যা মানুষ আবিষ্কার করে। মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং এসব সমস্যার সমাধানে জ্ঞান আবিষ্কার করে থাকে। উইলিয়াম জেমস সমকালীন যুগে এসে ঘোষণা দিলেন যে জ্ঞানকে বাস্তবজীবনের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। জ্ঞানের ব্যাবহারিক উপযোগিতা থাকতে হবে। জেমসের বহু

আগে সেই প্রাচীন যুগে ভারতীয় দার্শনিকরা তা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। সেজন্য তাঁরা জ্ঞানের আলোচনায় মনোযোগী এবং আগ্রহী ছিলেন।

মধ্যযুগের খ্যাতনামা দার্শনিক সেন্ট টমাস একুইনাস জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিকে গ্রহণ করেছেন। তিনি মনে করেন, "... যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তি হলো অভিজ্ঞতা এবং যার ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হয় তাকেই আমরা জানতে পারি। এই অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদান থেকে সারসত্তা নিয়েই বুদ্ধি জ্ঞানের উচ্চতর পর্যায় গঠন করে।"[১৬] একুইনাস জ্ঞানের উপাত্ত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি বুদ্ধির বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ ক্রিয়াকে গ্রহণ করেছেন বস্তুর সার্বিক গুণাবলিকে জানার জন্য। মোটকথা একুইনাস জ্ঞানোৎপত্তির বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধির সম্বন্বিত ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একুইনাসের বহুপূর্বে ভারতীয় দর্শনেও জ্ঞান উৎপত্তির ক্ষেত্রে ভারতীয় দার্শনিকগণ একইভাবে প্রত্যক্ষণ ও অনুমানকে সমন্বিতভাবে গ্রহণ করেছেন।[১৭]

ভারতীয় জ্ঞানচর্চার ফলে আমাদের মনন ও মনীষার উৎকর্ষ ও বিকাশের কারণে একদিকে যেমন ন্যায়-সত্য, সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং অন্যদিকে তেমনি বিবর্তন এবং পরিবর্তনকে মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারবে।

বর্তমান সময়ে মানুষ কেবলই অসংযত, অসহিষ্ণু, অনৈতিক এবং অসামাজিক জীবনযাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তাই এই বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য মানুষকে হতে হবে মননশীল। আর এর প্রধান শর্ত হিসেবে তাকে জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। ভারতীয় উপনিষদে বলা হয়েছে 'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ সর্বাগ্রে নিজেকে জানো। বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক সক্রেটিসও একই কথা বলেছেন 'Know thyself' অর্থাৎ নিজেকে জানুন।

মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন প্রজ্ঞাময় জীবন পরিচালনা করা। আর এই প্রজ্ঞাময় জীবনের মধ্য দিয়েই বিকাশিত হবে মানুষের পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বিরাজমান, হতাশা, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, পাশবিকতা, দুর্নীতি প্রভৃতি নেতিবাচক সমস্যাগুলো ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব সমস্যার মূলে রয়েছে মানুষের জ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আজকে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে জয়জয়কার এবং অগ্রগতি তার মূলে রয়েছে মানুষের বহু বছরে সাধনালব্ধ জ্ঞানের অন্বেষণ। মানবজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকের ফলাফলই হচ্ছে আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি ও অগ্রগতি। তাই বলা যায় সকল ধরনের অগ্রগতি ও প্রগতির মূলে রয়েছে মানুষের জ্ঞানগত সাধনা এবং প্রচেষ্টা। আর এক্ষেত্রে জ্ঞানতত্ত্বের ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রেক্ষাপট

পর্যালোচনা করলে নিঃসন্দেহে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের কথা সর্বাগ্রে আসে। তাই ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের কাছে বর্তমান বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতি ও প্রগতি ঋণী- একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শুধু তাই নয় মানুষকে 'প্রকৃত মানুষ' অর্থাৎ 'বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন' মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের রয়েছে বিশাল ভূমিকা। আমরা জানি, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হয়, আর পেছনে কাজ করে তার জ্ঞানগত চিন্তা। অর্থাৎ মানুষ প্রতিটি কাজ করার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তার জ্ঞানকে কাজে লাগায়। জ্ঞান ছাড়া মনুষ্যজীবন অচল। মানুষ তার অর্জিত জ্ঞান দ্বারা নিজ, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্বের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। তাই বলা যায় মানবজীবনে জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। আর ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় আমরা যে জ্ঞানের প্রতিফলন দেখি তা জীবনবাদী বা জীবনকেন্দ্রিক যা পাশ্চাত্য দর্শন থেকে পার্থক্য নির্দেশ করে। তাই ভারতীয় দর্শনের জীবনবাদী জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা মানুষের জীবনকে করেছে সমৃদ্ধ এবং উন্নত। তাই এই দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বের উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তাকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। বরং এই দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বের ওপর অধিক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা এই দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন দিকের অন্বেষণ দ্বারা মানবজীবন এবং সভ্যতা আরো বেশি সমৃদ্ধ হবে– একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. কালী প্রসন্ন দাস, *ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা : চার্বাক ও হিউম*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ২২৯

২. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিশান্স, ২০০৮), পৃ. ৩৬৩

৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৭

৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৭

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৮

৬. চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য, *পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস : আধুনিক যুগ-যুক্তিবাদ*, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯১), পৃ. ১১৬

৭. স্বামী বিবেকানন্দ, *জ্ঞানযোগ*, (কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০২), পৃ, ২৪৫

৮. মো: আব্দুল মুহিত, *বিশ্লেষণী দর্শনের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, (ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা), পৃ. ৯২

৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

১১. A.D. Lindsay, ed., *Socratic Discourses,* (London : Dent and Sons, 1954), p. 122

১২. রাশিদা আখতার খানম, *নীতিবিদ্যা : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০২), পৃ. ২১

১৩. B. Russell, *An Outline of Philosophy,* (London : Allen and Unwin, 1961), p. 243

১৪. *Encyclopedia Britannica,* (1980 ed.) Vol. Vlll, p.91

১৫. Immannuel Kant, *Fundamental Principles of the Metaphysic of Ethics,* Trans. Thomas Kingsmill Abbott, (London : Longmans, 1962), p. 16

১৬. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২

১৭. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে জ্ঞানের রূপ-স্বরূপ, জ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ, জ্ঞানের মাধ্যম বা উৎসের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেখানো হয়েছে। এছাড়া ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনাও এই অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি ভারতীয় জ্ঞানের প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানের বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা সেই সাথে এর গুরুত্ব এবং উপযোগিতাকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রমাণতত্ত্বের উল্লিখিত আলোচনায় ভারতীয় দার্শনিকদের চিন্তার ভিন্নতাও উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা বৈশেষিক এবং নৈয়ায়িকদের কথা বলতে পারি, প্রমাণতত্ত্বের আলোচনায় বৈশিষকরা ন্যায় প্রমাণতত্ত্বকে অনুরূপভাবে মেনে নেননি। আর এক্ষেত্রে বৈশেষিক দর্শনের স্বতন্ত্রতা পরিলক্ষিত হয়। কেননা প্রমাণতত্ত্বের ক্ষেত্রে ন্যায়ের চতুর্বিধ প্রমাণকে বৈশেষিক দর্শনে দ্বিবিধ প্রমাণে রূপান্তরিত হয়েছে। বৈশেষিকগণ যুক্তি এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে ন্যায়ের উপমান এবং শব্দ প্রমাণ যে অনুমানের অন্তর্গত বিষয় তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন।[১]

প্রমাণের সংখ্য নিয়েও ভারতীয় জ্ঞানের আলোচনায় মতদ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়। মীমাংসা, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন ছয়টি প্রমাণকে স্বীকার করেছেন। আমাদের পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয়– চক্ষু, কর্ণ, নাক, জিহ্বা, ত্বক এবং একটি অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মন। মন কোনো ভৌত গুণের দ্বারা গঠিত নয় বলে এর প্রত্যক্ষের সীমা নেই। এই মন বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলো তদারকি করে সবরকম জ্ঞানকে সুবিন্যস্ত করে।[২]

সাংখ্যমতে মোট একাদশ ইন্দ্রিয়কে স্বীকার করা হয়েছে। এদের মধ্যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় এবং মন। মন জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় উভয়ের সহায়ক। অবশ্য সাংখ্য দর্শনে, মন ছাড়াও বুদ্ধি ও অহং নামে আরও দুটি অন্তকরণের কথা বলা হয়েছে। এরা সকলে জ্ঞানোৎপত্তি এবং জ্ঞানকে কর্মে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকে। সুতরাং বলা যায় সাংখ্যদর্শন ১৩টি ইন্দ্রিয়কে স্বীকার করেছে। এদের মধ্যে তিনটি অভ্যন্তরীণ, ১০টি বাহ্য। এছাড়া বুদ্ধ অভিধর্ম মতাবলম্ববীরা ২২টি ইন্দ্রিয়ের কথা বলেন। কিন্তু বেদান্ত দর্শন মন বা অন্তকরণকে স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় বলে স্বীকার করেনি।

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞানের উৎস সম্পর্কিত আলোচনায় দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানই ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। বলা যায় প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাস। কেননা প্রায় সকল সম্প্রদায় এই দুটি বিষয়কে মূল উৎস হিসেবে বিবেচনা করে জ্ঞানের আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। তবে প্রত্যক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মীমাংসামতে সকল প্রকার জ্ঞান আত্মায় উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাই আত্মার দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে জ্ঞান এক প্রকার। আর তা হলো প্রত্যক্ষণ। এছাড়া প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিভাগ মীমাংসা দর্শনে পরিলক্ষিত হয় তা মূলত জ্ঞানের বিষয়বস্তুর দিক থেকে।[৩] আবার বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে সকল প্রকার জ্ঞানই অভিজ্ঞতাপূর্ব। কিন্তু ন্যায় দার্শনিকগণ অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন এবং দৃঢ় অভিজ্ঞতাবাদী সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠা করেন।[৪] ভারতীয় জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার উৎস অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই যে প্রতিটি দার্শনিক সম্প্রদায় বিনা দ্বিধায় প্রত্যক্ষণ প্রমাণকে গ্রহণ করেছেন। উৎপত্তিগত দিক বিশ্লেষণ করলে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জিত জ্ঞানই হচ্ছে প্রত্যক্ষণ। এই প্রত্যক্ষণে বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তির সরাসরি সংযোগ হয়। প্রত্যক্ষণবাদী দার্শনিকগণ বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে কর্তার সরাসরি সংযোগকৃত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই প্রত্যক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে তাঁরা সুনিশ্চিত জ্ঞান হিসেবে জেনেছেন। তাঁদের মতে এই জ্ঞান অভ্রান্ত, ত্রুটিমুক্ত। তবে বাস্তবিক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যক্ষণ জ্ঞান সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। যেমন: ঈশ্বর জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ কোনো কাজ দেয় না। তাছাড়া ইন্দ্রিয় সবসময় সঠিক তথ্য প্রদান করে না। উদাহরণ হিসেবে আমরা চক্ষু ইন্দ্রিয়ের কথা বলতে পারি। একই স্থানে দাঁড়িয়ে কাছের এবং দূরের একই ধরনের কোনো বিষয় বা বস্তু পর্যবেক্ষণ করলে তা আমাদেরকে ভিন্ন রকম তথ্য প্রদান করে। শুধু তাই নয় ইন্দ্রিয় আমাদেরকে অনেক সময় রীতিমতো প্রতারিতও করে। তাই বলা যায়, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণই শেষ কথা নয়, জ্ঞানের অন্যান্য উৎসেরও যথার্থ গুরুত্ব রয়েছে। তবে ভারতীয় দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষণের যে শ্রেণি বিভাজন বা ভাগবিন্যাস ও বিশ্লেষণের রূপরেখা প্রদান করেছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যক্ষীভূত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো মানবজীবনে কীভাবে আমাদের সাহায্যে করে তা ভারতীয় দার্শনিকরা চুলচেরা যৌক্তিক বিন্যাসের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

ভারতীয় দার্শনিকরা প্রত্যক্ষণলব্ধ জ্ঞানের পরই অনুমানলব্ধ জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ভারতীয় দর্শনের বৈদিক এবং অবৈদিক প্রায় সব দার্শনিক সম্প্রদায় তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুমানকে দ্বিতীয় প্রধান উৎসকে হিসেবে গ্রহণ করেছেন। শুধু চার্বাক সম্প্রদায় এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁরা প্রত্যক্ষণের বাইরে অন্য কোনো প্রমাণকে মেনে নেননি। জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রত্যক্ষণ, শব্দ, স্বজ্ঞা কিংবা প্রাধিকারের মাধ্যমে যখন অনেক সমস্যার সমাধান হয় না তখন সেখানে অনুমান কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়া প্রত্যক্ষণলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে সব ধরনের জ্ঞান অর্জন করা যায় না, আর প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে আমরা যেসব জ্ঞান অর্জন করতে পারি না তা আমরা অনুমানের মাধ্যমে পারি। অর্থাৎ

"Knowledge arises in experience. It emerges from reflection. It develops through inference."[৫] তাই অনুমানের ভূমিকাকে আমরা বাস্তবজীবনে কোনোভাবে অস্বীকার করতে পারি না। অনুমানলব্ধ জ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে বিশেষ করে চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মোটকথা অনুমান পদ্ধতিকে মানবজীবনের অংশ হিসেবে পরিগণিত করা যায়। এ প্রসঙ্গে এখানে অধ্যাপক আহমদ শরীফের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি অনুমানের উপযোগিতা সম্পর্কে বলেন,

> অনুমানও সত্য নির্ধারণের একটা মৌল উৎস বা ভিত্তি। জানা সত্য প্রয়োগে অজানা সিদ্ধান্তে তথা নতুন সত্যে উত্তরণ বা নতুন জ্ঞান লাভ ঘটে এ অনুমানপদ্ধতি যোগে ;.... সাদৃশ্য, সম্ভাবনা প্রভৃতি নির্ভর অনুমান আমরা প্রায় সর্বক্ষণ করে থাকি। এমনিভাবে অনুমান আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নানাভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে।[৬]

তাছাড়া অনুমানের বিষয়টি দর্শনের অন্যতম শাখা যুক্তিবিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত। যুক্তিবিদ্যার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হিসেবেও অনুমান আমাদের চিন্তা প্রণালির সাথে সম্পৃক্ত। আর সঠিকভাবে কাজ করার জন্য আমাদেরকে সঠিকভাবে চিন্তা করতে হয়, কেননা চিন্তাই আমাদের কাজের একটা রূপরেখা তৈরি করে দেয়। আর জ্ঞানতত্ত্বের অনুশীলন আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। ফলে আমাদের চিন্তার জগৎ আরো বেশি সমৃদ্ধ হয়। ভারতীয় দার্শনিকরা যে জ্ঞানের আলোচনা করেছেন সেখানে একদিকে প্রত্যক্ষণ এবং অন্যদিকে অনুমান প্রবল দাপটের সাথে নিজেদের প্রভাব বজায় রেখেছে। অন্যান্য উৎসগুলো তেমন স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করতে পারেনি, বরং প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে উপশাখার মতো আবির্ভাবের প্রচেষ্টা করেছে মাত্র। তাই বলা যায় ভারতীয় দার্শনিকদের আলোচ্য জ্ঞানরাজ্যে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানই সর্বেসর্বা। অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাস। শুধু তাই নয় পাশ্চাত্য দর্শনের সাথে তুলনা করলেও দেখা যায় ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বের চেয়ে বেশি ব্যাপক, বিস্তৃত এবং জীবনবাদী। আর এর প্রায়োগিক দিকটাও বেশি যা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়েসমূহের আলোচনায় তুলে ধরেছি।

পরিশেষে বলা যায়, দর্শনচিন্তা মূলত প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। কোনো একটি জাতি বা দেশের দর্শনচিন্তা হলো ঐ দেশ বা জাতির সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মানদণ্ড নির্ধারণ করে থাকে। তেমনি ভারতীয়দের দর্শনচিন্তাও তাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অংশ হিসেবে বিবেচিত। তাছাড়া ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যক আলোচনার বিশ্লেষণ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে এই জ্ঞানতত্ত্ব মূলত একটি আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঞ্চার করেছে, যেমনটি বলেছেন, "D. W. Hamlyn তাঁর *The Theory of*

Knowledge গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে 'A Complete Theory of Knowledge?' শীর্ষক আলোচনায়। তিনি বলেন, ''An optimistic epistemology is one that abides by the doctrine that truth is manifest ; the truth is not always immediately evident, but it can be come so.''[৭] আর এই আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মানবজীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ব্যবহারিক প্রয়োজনবোধ থেকেই সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল। ভারতীয়দের দর্শনচর্চার মূলে ছিল জীবনবোধের অর্থ অন্বেষণ করা। তাঁদের দর্শনচর্চার প্রধান লক্ষ্য ছিল শ্রেয় বা ভালত্ব অর্জন করে সর্বোৎকৃষ্টভাবে জীবন পরিচালনা করা। ভারতীয়রা আরও মনে করতেন শুধু বৌদ্ধিক জিজ্ঞাসা জীবনকে তৃপ্তি দেয় না, বরং দর্শনচর্চা আমাদেরকে প্রদান করে দূরদৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন এক প্রজ্ঞালোকিত জীবনব্যবস্থা। ভারতীয় দার্শনিকরা মূলত জ্ঞান দ্বারা চালিত জীবনকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমনটি সমকালীন দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের চিন্তায়ও আমরা দেখি। রাসেল জীবন পরিচালনায় ভারতীয় দার্শনিকদের মতো জ্ঞান দ্বারা জীবন চালিত হওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।[৮] প্রকৃত জ্ঞান অর্জন, সেই জ্ঞানের চর্চা, অনুশীল এবং প্রয়োগ ছাড়া জীবন, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির কোনো উন্নয়ন যে সম্ভব নয় তা ভারতীয় দার্শনিকরা সেই প্রাচীনকালে ভালোভাবে বুঝেছিলেন। তাই বলা যায় ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র তথা জ্ঞানতত্ত্ব জীবনবিমুখ কোনো বিষয় নয়। ভারতীয় দর্শনে তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক উভয় দিকের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে জৈনমত যেন সকল ভারতীয় দর্শনের মত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তাঁরা জীবনের জন্য জ্ঞান অন্বেষণের কথা বলেছেন। জ্ঞানের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কথা বলেননি। তবে ভারতীয় দর্শন পাশ্চাত্য দর্শনের মতো তত্ত্বগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে কার্পণ্য করেনি। সেজন্য তাঁদের জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব এবং মর্যাদা তৎকালীন সময়ের বিচারে অনবদ্য।

ভারতীয়দের জ্ঞানতত্ত্বে স্বাধীন যৌক্তিক চিন্তা সুদৃঢ়ভাবে স্থান পেয়েছে, সেজন্য ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বকে নিঃসন্দেহে বিচারমূলক বলা যায়। অজানাকে জানার নিমিত্তে জ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল। জ্ঞানের দ্বারা অভিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হতে পারে। ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানের ত্রিবিধ রূপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন: (১) নিছক বিশেষের জ্ঞান, (২) সেই বিশেষের জ্ঞান থেকে সামান্যের জ্ঞান এবং (৩) সেই সামান্যের জ্ঞান থেকে বিশেষের জ্ঞান।

ভারতীয় প্রায় সকল দার্শনিক সম্প্রদায় মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থ হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর যৌক্তিক চিন্তাই পরমাপুরুষার্থ লাভের সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করেছে। এজন্য দরকার জ্ঞানবিষয়ক আলোচনা। কেননা সত্তার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা যুক্তিসিদ্ধ চিন্তার মাধ্যমে বোধগম্য হতে পারি।

সাংখ্যদর্শনে মোক্ষের উপযুক্ত বিবেকজ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিকজ্ঞানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জ্ঞানকে ব্যবহারিক জ্ঞান বলে। সেই যুগে সাংখ্য দর্শনে জ্ঞানের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ব্যবহারিক দিকের যে গুরুত্ব আমরা দেখতে পাই তা সত্যিই অবাক করার মতো বিষয়। তাঁদের জ্ঞানতত্ত্বে বস্তুকেন্দ্রিকতার যে উদাহরণ সেই যুগে তাঁরা স্থাপন করেছেন তা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবিদার।

দর্শনচিন্তার গভীরতা ও ব্যাপকতার জন্য ভারতীয় দর্শন প্রাচ্য দর্শনে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বিশেষ করে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় দার্শনিকগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। ভারতীয় দর্শনে লক্ষ করা যায় যে, সকল দার্শনিক সম্প্রদায় সাধারণভাবে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, "... প্রায় সব ক্ষেত্রেই অধিবিদ্যার আলোচনা জ্ঞানবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।"[৯] মানবজীবনের দুঃখমুক্তির জন্য মূলত অধিবিদ্যাকে দূর করে প্রকৃত বা যথার্থ জ্ঞানলাভ আবশ্যক। আর যথার্থ জ্ঞানলাভের জন্য যথার্থ জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি জানা আবশ্যক।

ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায় জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে এর মৌলিক বিশ্লেষণ দেখানোর চেষ্টা করেছেন। গভীরভাবে দেখলে আমরা বলতে পারি ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানবিদ্যাগত আলোচনাকে সকল সম্প্রদায়ের কাছে অপরিহার্য বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কেননা, "The main test of true knowledge is that it helps us to attain our purpose."[১০] তাছাড়া জ্ঞান শুধু নিজের জন্য নয়, আমাদের ভালোর জন্য এবং মন্দবর্জনে সহায়তা করে।[১১]

জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞানের যথার্থতা ও অযার্থতা, যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায় বা প্রমাণ, প্রমাণের সংখ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয়ে ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেকটি সম্প্রদায় নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আলোচনা করেছে। তবে, "দর্শনগুলোর পদার্থতত্ত্ববিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকায় জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনাতেও ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ উদ্ভূত হয়েছে।"[১২] ভারতীয় দর্শনে এ বিষয়ে কোনো দার্শনিক বা সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিমত নেই যে– জ্ঞান সকল সময় মানবের কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত। জ্ঞান দ্বারাই চালিত হচ্ছে মানুষের কল্যাণকামী অগ্রযাত্রা। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "মানুষের জ্ঞান মানুষের কল্যাণের বিরোধী নয় বরং জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই জ্ঞান

আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে; জ্ঞানই উপাসনা। আমরা যতই জ্ঞানলাভ করিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল।"[১৩]

মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ন্যায়-অন্যায়, যুক্তি-অযুক্তি, সঙ্গতি-অসঙ্গতি প্রভৃতির পার্থক্যকরণে জ্ঞানের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ভারতীয় জ্ঞানের প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান উল্লিখিত বিষয়সমূহের স্বরূপ এবং পার্থক্যকরণে বিশেষ ভূমিকা রেখে মানবজীবনের পথকে মসৃণ এবং গতিময় করেছে। মানবজীবনে মূলত জ্ঞানের দ্বিবিধ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যথা: (১) ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং (২) মননের উৎকর্ষ সাধনের জন্য। মানবিক জীবনের এই দ্বিবিধ প্রয়োজন পূরণের জন্য ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার অভ্যন্তরেই আমাদেরকে প্রবেশ করতে হবে।

জ্ঞানের অনুপস্থিতে মানুষের মধ্যে কুসংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং যুক্তিহীনতার জন্ম নেয় যা মানবসমাজের অগ্রগতির পথে বড়ো বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই এসব বাধা দূরীকরণে জ্ঞানের অনুশীলন আবশ্যক। তাছাড়া মানবজীবনে ব্যক্তিচরিত্রের উন্নয়ন এবং নৈতিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চা ও অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। তাই জ্ঞানের অনুশীলন মানুষের জীবনযাত্রার ভিত্তি এবং জীবনযাপনের দিশারি হয়ে ওঠে। মানুষের মূল পরিচয়ের অভিজ্ঞান হলো সে মানুষ, আর তার মূল লক্ষ্য এবং গন্তব্য হলো মনুষ্যত্ব। কেননা মনুষ্যত্বের বিকাশ দ্বারা সে পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে সকল প্রকার হিংসা- দ্বেষ-ঘৃণা, জাত-জন্ম, বর্ণ-ধর্ম-দ্বেষণা প্রভৃতিকে অতিক্রম করতে পারে। সুকুমার বৌদ্ধিক বৃত্তির বিকাশ দ্বারা মানুষ সভ্যতার বিকাশমান চাকাকে ত্বরান্বিত করবে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় যেন সে কথায় বিধৃত হয়েছে। যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করে মানুষ তার পারিবারিক সামাজিক প্রাতিবেশিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করে। ফলে মানবজীবন সার্থক এবং সফলতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। আজকের বিশ্ববাস্তবতায় এবং ব্যবস্থায় যে প্রাগ্রসর মানুষ, সমাজ এবং বিভিন্ন উদ্ভাবন দেখি তা দর্শন তথা জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ফসল। আমরা যদি আদিম সমাজের (Primitive Society) দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখবো যে, আদিম মানুষের জীবন ছিল অবিকশিত এবং অপরিকল্পিত। জীবনে ছিলো না কোনো নান্দনিকতা এবং আরামদায়কতা। কালক্রমে মানুষ প্রকৃতিপূজা, যাদুবিদ্যা, বিশ্বাস, নিষিদ্ধ মূর্তিপূজা প্রভৃতিকে অতিক্রম করে সে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। আর এই উন্মেষ এবং বিকাশে মানুষকে সাহায্য করেছে দর্শনশাস্ত্র তথা জ্ঞানতত্ত্ব। আর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার প্রাথমিক এবং যৌক্তিক অনুসন্ধান লক্ষ করা যায় ভারতীয় দর্শনে। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব তথা দর্শন একদিকে তাত্ত্বিক এবং অন্যদিকে জীবনবাদী। তাই সহজেই

অনুমান করা যায় যে, মানবসভ্যতায় মানুষের ক্রমিক উন্নতিতে দর্শনশাস্ত্র যে অবদান রেখেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ভারতীয় দর্শন। আর এক্ষেত্রে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব বিশেষভাবে সহায়তা করেছে সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা মানুষ চায় জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে সংস্কারমুক্ত চিন্তা-চেতনা এবং যুক্তি-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করতে।

সার্থক ও সফল জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য জ্ঞান প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। তাই বলা যায়, মানবজীবনকে সার্থক এবং সাফল্যমণ্ডিত করে গড়ে তোলাই জ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য। জ্ঞানচর্চাকারী মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার অর্থাৎ প্রজ্ঞার প্রয়োগ ঘটানো। যার ফলে মানবকল্যাণ সাধিত হয়। জ্ঞান অনুশীলনকারী ব্যক্তি তার ভেতরকার সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, বিকাশ ঘটিয়ে জীবন পরিচালনা করে থাকে।

জ্ঞানগত সংকটের কারণে বর্তমান বিশ্ব যেমন এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি হয়নি ব্যক্তিজীবনের উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গির সম্প্রসারণ। আজ জ্ঞানের অভাবে মানুষ অন্ধকুসংস্কার, সংকীর্ণতা এবং ভোগবাদিতায় আচ্ছন্ন। বর্তমান বিশ্বে মানুষ যেন আজ অর্থের দোলাচালে ঘুরপাক খাচ্ছে। এ সকল বিষয় থেকে উত্তরণের জন্য জ্ঞানানুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানের অন্বেষণ নয়, অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। কেননা জ্ঞান যখন আমাদের জীবনে উপকারে আসে তখন তা বাস্তব জগতের এবং সমাজের নানাবিধ সমস্যার সমাধানে সহযোগিতা করে থাকে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবদুল হালিমের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর 'যৌক্তিক দৃষ্টবাদ' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন, "জ্ঞান আমাদের জীবনে তখনই উপকারে আসে যখন বাস্তব জগতের ও সমাজের সমস্যা সমাধানে তা' সাহায্য করে।"[১৪]

জ্ঞানের এই উপযোগিতার বিষয়টি ভারতীয় জ্ঞানের প্রধানতম উৎস প্রত্যক্ষণে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ ঘোষের *ভারতীয় দর্শন* গ্রন্থে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের তিনটি স্তরের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যথা:

"১. বস্তুর উপস্থাপনা;

২. আমাদের প্রতিক্রিয়া;

৩. স্মৃতির উদয় এবং প্রত্যভিজ্ঞা; বস্তুর প্রকৃত অর্থোপলব্ধি।"[১৫]

মানবজীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনে প্রত্যক্ষজ্ঞানের এই তিনটি স্তরের অহরহ ব্যবহার দেখা যায়। তাই আমরা প্রত্যক্ষণের দৈনন্দিন উপযোগিতাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। অনুমানলব্ধ জ্ঞানের বেলায়ও আমরা একই কথা বলতে পারি। কেননা প্রত্যক্ষণের সীমাবদ্ধতায় অনুমান

আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ অর্থাৎ বাকি জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। প্রত্যক্ষণ যেখানে থেমে যায়, আর সামনে অগ্রসর হতে পারে না, সেখানে অনুমানই আমাদের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে সহযোগিতা করে থাকে। তাই জীবনযাপন প্রণালিতে একান্ত আবশ্যক হিসেবে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান উভয়রেই প্রয়োজন রয়েছে। এ দ্বিবিধ জ্ঞানের ভিত্তিতে চালিত হয় মানবজীবন। এছাড়া ভারতীয় জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে মানুষ মুক্ত মন, মুক্ত চিন্তা, মুক্ত পথ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রত্যেক সচেতন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি জ্ঞান, যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেককে প্রয়োগ করে যৌক্তিক এবং বৌদ্ধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। আর এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান। মানবজ্ঞানের বা প্রজ্ঞার পরিণতির জন্য ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে। কেননা সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই প্রত্যক্ষণ ও অনুমানকে যেভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন সেদিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের থেকে বেশি বিচারপ্রসূত।

ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায় জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা করলেও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সকল পাশ্চাত্য দার্শনিক ভারতীয় দার্শনিকদের মতো জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেননি। পাশ্চাত্য দর্শনের যাত্রা থেলিসের হাতে শুরু হলেও সোফিস্টদের চিন্তায় প্রথম জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা দেখা যায়। অর্থাৎ পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার জন্য প্রায় দেড়শত বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবে ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে তেমনটি লক্ষ করা যায় না।[১৬]

ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার ধারাবাহিক আলোচনা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার ধারাবাহিক আলোচনার চেয়ে জটিল। প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিক প্রত্যক্ষণ ও অনুমান নিয়ে আলোচনা করলেও পাশ্চাত্য দর্শনের সকল দার্শনিকের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ সংক্রান্ত আলোচনা করতে দেখা যায় না।[১৭] ভারতীয় জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় স্বাধীন বিচার, বিবেচনা, যৌক্তিক ও মুক্তচিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ভারতীয় দার্শনিকদের চিন্তায় পরিলক্ষিত হয় যা ভারতীয় দর্শনকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করেছে। মানবজীবনকে সঠিক, সুন্দর এবং আদর্শিকভাবে পরিচালনার জন্য জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বে যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির কারণে মানুষের মধ্যে যে বস্তুবাদী আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি ঘটেছে তা নিরসন এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জ্ঞানের অনুশীলন এবং প্রয়োগ জরুরী। আর এক্ষেত্রে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

মানুষ অবিনাশী সত্তা। মানবজীবনের মূল্য নিহিত তার বিচার এবং যৌক্তিক ক্ষমতার মধ্যে। সে তার বৌদ্ধিক সত্তা দ্বারা প্রবৃত্তি সত্তাকে মোকাবিলা করে থাকে। তাই বলা হয়ে থাকে পৃথিবীতে মানুষ শ্রেষ্ঠ তার দৈহিক আকৃতির কারণে নয় বরং তার জ্ঞান এবং বৌদ্ধিক গুণাবলির জন্য।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে পরিশেষে আমরা বলতে পারি মহান আদর্শিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জ্ঞানের পথ অনুসরণের কোনো বিকল্প মানুষের সামনে নেই। তাই মানুষকে বিশ্বে বিরাজিত প্রাণিকুলর মধ্যে নেতৃত্ব প্রদান করতে হলে তাকে অবশ্যই জ্ঞানচর্চা এবং সে জ্ঞানের অনুশীলন করতে হবে। কেননা "... জ্ঞানই হচ্ছে একাধারে শক্তি, স্বাধীনতা আর বোধের আনন্দ। আর জ্ঞানের সন্ধানই হচ্ছে স্থায়ী আনন্দ।"[১৮] আর এক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব বিশেষ করে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমান আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিশেষভাবে যে ভূমিকা রাখছে তা কোনোভাবে অস্বীকার করার উপায় নেই। আর সেজন্য ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বের গবেষণার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। এর পাশাপাশি ভারতীয় জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রত্যক্ষণ এবং অনুমানের বিষয়ভিত্তিক গবেষণা হওয়াও জরুরি।

তথ্যনির্দেশ

১. কালী প্রসন্ন দাস, *ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা : চার্বাক ও হিউম*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ.৩৬

২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

৩. S.N. Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, Vol.1, (London : Cambridge University Press, 1922), pp. 382-383

৪. C.D. Bijlwan, *Indian Theory of Knowledge*, (New Delhi : Heritage Publishers,1977), p. Forwarded

৫. Robert Audi, *Epistemology : A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge*, Second Edition, (New York and London : Routledge, 2003), p. 220

৬. আহমদ শরীফ, *দর্শন চিন্তা*, (ঢাকা : উত্তরণ, ২০০২), পৃ. ১৮৭

৭. D.W. Hamlya, *The Theory of Knowledge*, (London : Macmillan, 1970), p. 283

৮. B. Russell, *An Outline of Philosophy*, (London : Allen and Unwin, 1961), p. 243

৯. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১

১০. S.N. Dasgupta, *op.cit.*, p. 181

১১. S. N. Dasgupta, *op.cit.*, p. 182

১২. দেবমিত্রা দে, *প্রমাণতত্ত্ব*, (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৬), পৃ. ৩

১৩. স্বামী বিবেকানন্দ, *জ্ঞানযোগ*, (কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০২), পৃ. ২৫৮-২৫৯

১৪. মো : আবদুল হালিম, *দার্শনিক প্রবন্ধাবলি : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ১৬০

১৫. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮), পৃ. ১০৯

১৬. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১

১৭. কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০

১৮. উইল ডুরান্ট, *দর্শনের ইতিকাহিনী*, অনুবাদ, আবুল ফজল, (ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

অন্নম্ভট্ট, *তর্কসংগ্রহ দীপিকাসহ*, অনুবাদ, শ্রী কানাইলাল পোদ্দার, কলকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৮৮

অন্নম্ভট্ট, *তর্কসংগ্রহ*, (অনুমান খন্ড, শ্লোক- ৪) শ্রীনারায়ন চন্দ্র গোস্বামী অনূদিত, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ

ইসলাম, আমিনুল, *বাঙালির দর্শন : প্রাচীনকাল থেকে সমকাল*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২

_____, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন*, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা : শিখা প্রকাশনী, ২০০৫

_____, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন*, চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫

_____, *জগৎ জীবন দর্শন*, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১

ইমাম, পারভেজ, *প্রয়োগবাদের রূপরেখা*, ঢাকা : অনন্যা, ২০০২

করিম, সরদার ফজলুল, *দর্শনকোষ*, পঞ্চম সংস্করণ, ঢাকা : প্যাপিরাস, ২০০৬

কান্ট, ইমানুয়েল, *নৈতিকতার দার্শনিকতত্ত্বের মূলনীতি*, আনুবাদ, সাইয়েদ আবদুল হাই, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮২

কর, মিনতি, *অদ্বৈতবেদান্তে জ্ঞান*, কলকাতা : আদিত্যময়, ১৯৮৮

খান, গালিব আহসান, *বিজ্ঞান, পদ্ধতি ও প্রগতি*, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকশনা, ২০০৯

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন, *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : জি. এ.ই. পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্কারণ, ১৯৯১

ঘোষ, রমেন্দ্রনাথ, *ভারতীয় দর্শন*, পু.মু., ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৮

চক্রবর্তী, নীরদবরণ, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদ, ১৯৮৮

চিজম, আর. এম., *জ্ঞানবিদ্যা*, অনুবাদ, মো: আবদুর রশীদ, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯

চট্টোপাধ্যায়, লতিকা, *চার্বাক দর্শন*, কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৮

চক্রবর্তী, ধ্যানেশনারায়ণ, *ভারতীয় সংস্কৃতি উত্তরাধিকার*, কলকাতা : প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, ১৯৮৯

_____, *রামায়ণম*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : নিউ লাইট, ১৯৯৬

_____, *বালগঙ্গাধর তিলক : গীত রহস্য*, কলকাতা : প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, ১৪০১

_____ (সম্পা), *হিন্দুশাস্ত্র*, অখণ্ড সংস্কৃরণ, কলকাতা : নিউ লাইট, ১৪০১

চক্রবর্তী, নীরদবরণ, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (প্লেটো. অ্যারিস্টটল)*, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০১

চক্রবর্তী, নির্মাল্যনারায়ণ, *দর্শনের পথে : পুবে ও পশ্চিমে*, কলকাতা : গাঙচিল, ২০২০

ডুরান্ট, উইল, *দর্শনের ইতিকাহিনী*, অনুবাদ, আবুল ফজল, ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০০৮

তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায় দর্শন*, ১ম খন্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮

_____, *ন্যায় পরিচয়*, কলকাতা : বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা- পরিষৎ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ

দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য, *স্বামী বিবেকানন্দ : মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে*, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা : ন্যাশলান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬

দেব, গোবিন্দ চন্দ্র, *তত্ত্ববিদ্যা- সার*, ঢাকা : অধুনা প্রকাশন, ২০০৪

দাস, রমা প্রসাদ, *হিউমের ইন্‌ক্যয়ারি: একটি উপস্থাপনা*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১

দাস, রমাপ্রসাদ ও শিবপদ চক্রবর্ত্তী, *পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা*, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯২

দাস, কালী প্রসন্ন, *ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা: চার্বাক ও হিউম*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪

দাস, রাসবিহারী, *কান্টের দর্শন*, তৃতীয় পর্ষৎ মুদ্রণ, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৩

_____, *ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ খণ্ডণ*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯

দাস, স্বদেশ রঞ্জন, *মানবেন্দ্রনাথ : জীবন ও দর্শন*, ২য় সংস্করণ, কলকাতা ১৯৭০

দে, দেবমিত্রা, *প্রমাণতত্ত্ব*, কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৬

নূরুজ্জামান, মো :, *বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দর্শন*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৪

বারী, মুহাম্মদ আবদুল, *দর্শনের কথা*, ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ২০১৫

ভট্টাচার্য, চন্দ্রোদয়, *পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৯
ভট্টচার্য্য, সুখময়, *পূর্বমীমাংসা দর্শন*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৬
মতীন, আবদুল, *দর্শনের রূপরেখা*, অনুবাদ, আবদুল মতীন ও প্রদীপ রায়, ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৭
মুহিত, মো: আব্দুল, *ইমানুয়েল কান্টের জ্ঞানতত্ত্ব ও নীতিদর্শন*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০২০
_____, *বিশ্লেষণী দর্শনের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, ঢাকা : অবসর প্রকশনা সংস্থা, ২০১৭
রহমান, আবু তাহা হাফিজুর, অনুবাদ, *মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮১
রশীদ, মো: আবদুর, অনুদিত, *জ্ঞানতত্ত্ব*, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬
রায়, শ্রীতারকচন্দ্র, *পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস: প্রথম খন্ড*, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫
রহমান, এম. মতিউর, *সাবেকী ও প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা*, ঢাকা : পুথিঘর লি:, ১৯৮৮
_____, *বাঙালির দর্শন : মানুষ ও সমাজ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০০
_____, *বাঙলার দার্শনিক মনীষা*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮
_____, *ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮
_____, *বাঙালির দর্শন : ব্রাহ্ম ভাবধারা*, ১ম খণ্ড, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০১২
_____, *বাঙালির দর্শন : ব্রাহ্ম ভাবধারা*, ২য় খণ্ড, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০১২
_____, *বাঙালির দর্শন : ব্রাহ্ম ভাবধারা*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০১২
_____, (সম্পা), *বৌদ্ধ দর্শন : তত্ত্ব ও যুক্তি*, ১ম খণ্ড ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৩
_____, (সম্পা), *বৌদ্ধ দর্শন : তত্ত্ব ও যুক্তি*, ২য় খণ্ড ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৩
_____, (সম্পা), *বাঙালির দর্শন : প্রাচীনযুগ*, ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৫
_____, (সম্পা), *ডক্টর রমা চৌধুরী-র বেদান্ত দর্শন*, ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৬
রায়, এম. এন., *বিজ্ঞান ও দর্শন*, অনুবাদ, বদিউর রহমান, ঢাকা : নালন্দা, ২০১৮
রায়, শ্রীতারকচন্দ্র, *ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : গুরুদাস এ্যান্ড কোং, ১৩৬৭
লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, কলকাতা : রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০১২
শাস্ত্রী, অনন্তকৃষ্ণ, *পরিভাষা-প্রকাশিকা*, কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৭
শরীফ, আহমদ, *দর্শন চিন্তা*, ঢাকা : উত্তরণ, ২০০২
সরখেল, রনজিৎ, *ভারতীয় দর্শনে অনীশ্বরবাদ*, কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,২০১৩
সেন, দেবব্রত, *ভারতীয় দর্শন*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯২
সাংকৃত্যায়ন, রাহুল, *বৌদ্ধ দর্শন*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশনালয়, ২০০৭
স্বামীজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খন্ড, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৩
হক, হাসান আজিজুল, *সক্রেটিস*, ঢাকা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৩
হাই, সাইয়েদ আবদুল, *ভারতীয় দর্শন*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭
হারুন, শরীফ, *ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে দর্শন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭
হালিম, মো: আবদুল, *দার্শনিক প্রবন্ধাবলী : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৩
হিউম, ডেভিড, *মানব প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষা*, অনুবাদ, রহমান আবু তাহা হাফিজুর ঢাকা : পলল প্রকাশনী, ২০০৭
হোসেইন, সৈয়দ কমরুদ্দীন, *সমকালীন দর্শনের কয়েকটি ধারা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯
Afanasyev, V., *Marxist Philosophy*, Third Revised Edition, Moscow : Progress Publishers, 1968
Ackermann, Robert, *Theories of Knowledge*, Bombay : Tata McGraw- Hill Publishing Co. Ltd., 1965
Bogomolov, A. S., *History of Ancient Philosophy*, Moscow : Progress Publishers, 1985
Bonjour, Laurence, *The Structure of Empirical Knowledge*, USA : Harvard University Press, 1985

Black, Max, *Critical Thinking*, New York : Prentice-Hall, 1952

Bijalwan, C.D., *Indian Theory of Knowledge*, New Delhi : Heritage Publishers, 1977

Bary, W.M. Theodore de (ed.), *Source of Indian Tradition*, Vol.1, New York : Columbia U.P., 1966

Chakraborty, Nirmalya Narayan, *Perspectives on Radhakrishnan*, Kolkata : Rabindra Bharati University, 2007

Chatterjee, S.C., *The Nyaya Theory of Knoweledge*, Reprinted, Calcutta : University of Calcutta 1978

_____, *The Nyaya Theory of Knowledge : A Critical Study of Some Problems of Logic and Metaphysics*, Calcutta : University of Calcutta, 1978

Chattopadhyaya, Debiprasad, *Indian Philosophy*, Delhi : Peoples Publishing House, 2007

Datta, D. M., *Six Ways of Knowing : A Critical Study of the Advaita Theory of Knowledge*, Calcutta : University of Calcutta, 1972

Dasgupta, S.N., *A History of Indian Philosophy*, Vol.1, London : Cambridge at the University Press, 1922

Edwards, Poul (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*, New York : Macmillan Publishing Co. Inc. and Free Press, 1972, Vol.1

Encyclopedia Britannica, (1980 ed.) Vol. Viii

Ewing, A.C., *The Fundamental Questions of Philosophy*, New Delhi : Allied Publishers Ltd., 1994

Feibleman, James K., *Understanding Philosophy*, Bombay : Jaico Publishing House, 1990

Hume, David, *A Treatise of Human Nature*, ed., by L. A. Selby- Bigge, Oxford : At the Clarendon Press, 1987

_____, *A Treatise of Human Nature (Book One)*, Third Impression, Ed., D.G.C. Macnabb, London and Glasgow : Fontana/ Collins, 1970

_____, *An Enquiry Concerning Human Understanding*, New York : Coller Books, 1962

Hiriyanna, M., *The Essentials of Indian Philosophy*, London : George Allen & Unwin Ltd., 1949

_____, *Outlines of Indian Philosophy*, Reprinted, Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2000

_____, *Indian Philosophy*, London : George Allen and Unwin Ltd., 1958

Joseph, H.W.B., *An Introduction to Logic*, Second Edition, London : Oxford, At the Clarendon Press, 1967

Jha, Ganganath, *Indian Thought*, Allahabad : University of Allahabad, 1911

Kant, Immannuel, *Critique of Pure Reason*, Eng. Trans., Norman Kemp Smith, (London : Macmillan and Co. Ltd., 1953)

_____, *Fundamental Principles of the Metaphysic of Ethics*, Longman, 1962

Kemp, John, *The Philosophy of Kant*, Reprinted, London: Oxford University Press, 1979

Locke, John, *Essay Concerning Human Understanding*, ed., by A. Seth, Oxford : Pringle Pattison, 1924, Book IV, Chap. 1

Lindsay, A.D., ed., *Socratic Discoures*, London : Dent and Sons, 1954

Patrick, George Thomas White, *Introduction to Philosophy*, Revised Edition, Delhi : Surjeet Publications, 1978

Passmore, John, *A Hundred Years of Philosophy*, Great Britain : Penguin Books Ltd., 1984

Russell, B., *An Outline of Philosophy*, London : Allen and Unwin, 1961

_____, *What I Believe*, 2nd Edition, London : Routledge, 2004

_____, *History of Western Philosophy*, Reprinted, London : Routledge, 1995

_____, *An Inquiry into Meaning and Truth*, Reprinted, Australia: Penguin Books Pvt. Ltd., 1963

Radhakrisnan, S., *Indian Philosophy*, Vol.1, London : Cambridge University Press, 1922

_____, (ed.), *History of Philosophy : Eastern and Western*, Vol.1, London : George Allen and Unwin Ltd., 1952

_____, *Indian Philosophy*, Vol.2, Fifteen Impression, New Delhi : Oxford University Press, 2006

Sinha, J.N., *History of Indian Philosophy*, Vol.1, Calcutta : Sinha Publishing House, 1956

_____, *Introduction to Philosophy*, Revised Sixth Edition, Calcutta : Sinha Publishing House, 1971

Stace, W.T., *A Critical History of Greek Philosophy*, New York : Macmillan, St. Martin's Press, 1972

Stumpf, S. E., Fieser J., *Socrates to Sartre and Beyond*, New York : McGraw Hill, 2008

Scruton, Roger, *A Short History of Modern Philosophy*, Second Edition, London and New York : Routledge, 1995

Smith, Norman Kemp (ed.), *Immanuel Kant's Critique of Pure Reason*, London : Macmillan and Co., Limited, 1934

Sharma, R.N., *Indian Philosophy Problems & Theories*, Delhi: Surjeet Publications, 2005

Seal, B.N., *The Positive Sciences of the Ancient Hindus*, London : Longmans, Green and Co., 1915

Sharma, Chandradhar, *A Critical Survey of Indian Philosophy*, U.S.A.: Barnes & Noble Inc., 1962

Titus, Harold H., *Living Issues in Philosophy*, Fourth Edition, New Delhi : Eurasia Publishing House (p.), Ltd, India, 1968

Thilly, Frank, *A History of Philosophy*, Allahabad : Central Book Depot, 1975

Teichman, Jenny and Evans Katherine C., *Philosophy: A Beginner's Guide*, Second Edition, U.K : Blackwell Publishers Ltd., 1998

জার্নাল/ সাময়িকী

১. *প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা*, চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল, ২০১৪, সংস্কৃত বিভাগ, (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

২. *কার্যবিবরণী; বাংলাদেশ দর্শন সমিতি*, অষ্টম সাধারণ সম্মেলন, ১৯৯০, (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

৩. *দর্শন ও প্রগতি*, ১ম ও ২য় সংখ্যা, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯৭)

৪. *প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা*, চতুর্থ সংখ্যা, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : সংস্কৃত বিভাগ এপ্রিল, ২০১৪), ঢাকা

৫. ***বৈশেষিক সূত্র***, ৯/২/১, উপস্কার, পৃ. ৩২৬, প. ১১ মহাদেব গদাধর বাক্রে সম্পাদিত, (বোম্বে : গুজরাটী প্রিন্ট্রিং প্রেস সং, ১৯১৩)

৬. ***প্রশস্তপাদভাষ্য***, পৃ. ৫০৮-৫০৯, গঙ্গানাথ ঝা গ্রন্থমালা নং- ১, বারানসী, ১৯৬৩

৭. *ভাষা পরিচ্ছেদ*, কারিকা ৬৬, নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রক্ষ্মচারী সম্পাদিত, (কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার)

৮. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, "বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন চিন্তা : বহুগ্রাহিতার বিপদ", শরীফ হারুন, সম্পাদিত, *বাংলাদেশে দর্শন ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, দ্বিতীয় খন্ড, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯), পৃ, ৩১৭

৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "রচনাসমগ্র", *বিবিধ প্রবন্ধ*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা : সালমা বুক ডিপো, ২০০১), পৃ. ২০২

১০. Joshi, K.S., *On the Meaning of Yoga : Philosophy East And West,* Journal of Oriental and Comparative Thought, Vol. XV, No. 1, January, 1965